



মাসুদ রানা

বাউন্টি হান্টার্স

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

বাউন্টি হান্টার্স

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

গম্ভীরদর্শন, ওই প্রকাণ্ড ফ্রেঞ্চ দুর্গ থেকে তিশাকে নিয়ে
লেজ তুলে পালাচ্ছে রানা। কিন্তু ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা।
শেষে উঠতে হলো এক এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে।
ওখানেই জানল, ম্যাজেস্টিক-১২ কাউন্সিলের মাস্টার প্ল্যান।
ওরা দখল করবে গোটা দুনিয়া। একের পর এক
নিউক্লিয়ার মিসাইল দিয়ে উড়িয়ে দেবে মস্ত সব শহর।
রানার এখনই চাই টাচলক-৯ ইউনিট।

...ওদিকে কী চলছে আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে?
রানার পথে বাধা হয়ে উঠল শত শত যুদ্ধ-বিমান।
মক্কা শহরে পড়বে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল।
কখনও লাভ হয় মিসাইলের পিছু নিয়ে?
তবু শেষ চেষ্টা করল রানা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে
দিল কুয়াশা। কী করে বাঁচাবে ওরা লাখ লাখ নিরীহ
মানুষকে? নিশ্চিত মৃত্যুকে পরোয়া করল না ওরা।
এবারই বুঝি চিরবিদায় নিতে চলেছে আমাদের
মাসুদ রানা ও মহৎহৃদয় কুয়াশা।



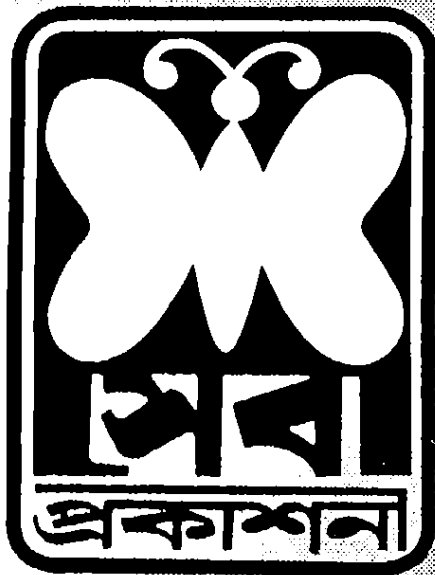
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



আশি টাকা

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে

রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমস্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দুরাঙ্গাপন: ৮৩১ ৪১৮৪

সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-434

BOUNTY HUNTERS

Part-II

A Thriller Novel

By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিনু প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন
ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত
অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলাগা
কাগজ (চিপ্পি) সাটানো হয় না।



এক নজরে

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু
ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিশ্ময়জনক*রক্তদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর
*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা
*ক্ষাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ
*অদৃশ্য শত্রু*গির্শাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ
সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল
পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হৃৎকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস
*স্বর্ণতরী*পপি*জিপি*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই
লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টাগেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রোতায়া
*বন্দী গগল*জিমি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ধ্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার
*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*আমবুশ*আরেক
বারমুড়া*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ
*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ
*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই
সম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যাবা
*যাত্রীরা হাঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *স্থাপনসংকুল*দংশন
*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ
*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরগির্শাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী
*দুই নম্বর*কক্ষপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা
*অপছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাইদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি
*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া
*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টাগেট
বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা
*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূর্ভাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা
*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরূপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রক্তঝড়
*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ
*কুহেলি রাত*বিষাক্ত ধাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সাবিয়া
চক্রান্ত*দূরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা
*বাঘের খাচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ
চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ
প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড
মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য
*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন
তেলআবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেকা*কালো নকশা*কালনাগিনী
*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন
*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমাতো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের
গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুইন কন্যা*অরক্ষিত
জলসীমা*দূরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্বাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান
*জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোজ*বুশ
পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে
সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্রাইমার*আগুন
নিয়ে খেলা*মরুস্বর্ণ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক
*ট্রেজার হাণ্ডার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক
*পার্শিয়ান ট্রেজার*বাউন্টি হাণ্ডার্স।

এক

যে সরু, সর্পিল, পাহাড়ি সড়ক জন্ম নিয়েছে ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়ন থেকে, তার নাম ঐ খুয়ে দে লা মেখ— বা দ্য গ্রেট ওশান রোড। উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ওই উপকূলীয় সড়কে প্রচণ্ড গতি তুলে ছুটে চলেছে পলায়নরত মাসুদ রানার র্যালি কার।

একের পর এক পাথুরে ক্লিফের মাথা ছুঁয়ে গেছে পথ। অনেক নীচে প্রকাণ্ড, সুনীল আটলান্টিক; দৃশ্যটা সত্যিই শ্বাসরুদ্ধকর। চুলের কাঁটার মত অসংখ্য বাঁক নিয়েছে রাস্তা, চট করে দেখা যায় না সামনে বা পিছনে কী আছে। দু'পাশে কংক্রিটের নিচু গার্ড-ফেন্স, দু'দিকে খাড়াভাবে নেমেছে চার শ' ফুট পাহাড়। কোথাও কোথাও পাহাড়ের বুকে দীর্ঘ টানেল।

ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়নের আশপাশের চোদ্দ মাইল এলাকার মালিক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ডেমিয়েন ডগলাস। এখন যে পথে ছুটছে রানা ও তিশার গাড়ি, তাও ডগলাসের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রাইভেট রোড। তার দু'জায়গায় মিশেছে দুই শাখা রাস্তা। একটা উঠেছে পাহাড় বেয়ে ডগলাসের ব্যক্তিগত এয়ারস্ট্রিপে। অন্যটা বারবার বাঁক নিয়ে নেমেছে বহু নীচের সাগর-তীরে। ওখানে ডগলাসের মস্ত বোটশেড।

এ মুহূর্তে অপূর্ব সুন্দর সাগর উপকূলীয় সড়কে ঘণ্টায় এক শ' আশি কিলোমিটার বেগে ছুটছে রানার ইলেকট্রিক ব্লু ডাব্লিউআর-এক্স র্যালি কার। ইঞ্জিনের গর্জন বলতে সামান্য

হুইস্‌স্‌ আওয়াজ। এনগেজ করা হয়েছে টার্বো চার্জার। শক্তিশালী অল-হুইল-ড্রাইভ সিস্টেমের ফলে উপকূলীয় সড়কের তীক্ষ্ণ সব বাঁক পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি অনায়াসে।

কিন্তু পিছনে আসছে ড্রাগন কর্পোরেশনের একই গতির পাঁচ-পাঁচটা সুপার কার। প্রথমে পোর্শ, এরপর ফেরারি, পিছনে তিন পিউজো।

‘আপনি কোথায়, কুয়াশা,’ থোট-মাইকে বলল রানা। ‘দুর্গ থেকে বেরিয়েছেন? ...আমরা সমস্যার ভেতর আছি।’

‘আসছি, বেশিক্ষণ লাগবে না,’ জবাবে শান্ত স্বরে জানিয়ে দিল কুয়াশা।

রানা বা তিশা জানে না, কিন্তু ওদের গাড়ির একমাইল পিছনে দুর্গ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে আরেকটি গাড়ি— এইমাত্র বিদ্যুৎদেগে ড্র-ব্রিজ পেরিয়ে এল ওটা।

ল্যামবোরঘিনি ডায়াব্লো। ভি-১২। রিয়ার স্পয়লার। নিচু ছাত। অন্য গাড়ির চেয়ে গতি বেশি। কুচকুচে কালো।

স্যাটালাইট রেডিয়ো সিস্টেমে যোগাযোগ করল রানা, ‘আপা! ...শুনছেন?’

তখনই নিশাতের সাড়া পাওয়া গেল। ‘আমি কাছেই, স্যর!’

‘আমরা এখন দুর্গে নেই,’ বলল রানা। ‘চলেছি উত্তর দিকের রাস্তা দরে।’

‘ওখানে কী ঘটল, স্যর?’

‘শুরুতে সবই ঠিক ছিল, কিন্তু একটু পর টের পেলাম উদয় হয়েছে একদল বাউন্টি হান্টার।’

‘ওই দুর্গ উড়িয়ে দেননি কেন?’ জিজ্ঞেস করল নিশাত, কণ্ঠে কৌতুক।

‘খুশি হতেন?’ মৃদু হাসল রানা। ‘সময় পেলাম কই, তা ছাড়া আমরা তো তখন ভেতরেই ছিলাম। ...আপনারা কতটা

দূরে?’

‘প্রায় পৌঁছে গেছি,’ বলল নিশাত। ‘সঙ্গে রঘুপতি। কালো শকুনে চেপে আসছি। খবির লগুনে, বাউন্টি হাণ্টের বিষয়ে তথ্য জোগাড় করবে। ...আধঘণ্টার ভেতর আপনার সঙ্গে দেখা হবে।’

‘তিরিশ মিনিট...’ বিড়বিড় করল রানা। ‘আমরা কি অতক্ষণ টিকব?’

শুনতে পেয়েছে নিশাত, বলল, ‘যেভাবে হোক টিকে থাকুন, স্যর। অনেক কথা বলার আছে।’

‘কম-বেশি পঁচিশটা শব্দে যা বলার বলুন,’ বলল রানা।

‘বাউন্টি হাণ্টের ব্যাপারে সবই জেনে গেছে আমেরিকান সরকার। প্রেসিডেন্ট আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আপনাকে জীবিত রাখার জন্যে যা লাগবে, তা-ই করতে চেয়েছেন। আপনি বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণী হয়ে উঠেছেন, স্যর। দুনিয়ার যে-কোনও আমেরিকান এম্বেসি বা কনসুলেটে গেলেই নিরাপত্তা পাবেন।’

চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ বাঁক নিল রানার ডাব্লিউআরএক্স। সামনে বহু দূর দেখা গেল। উঠে এসেছে ওরা পাহাড়ের কাঁধে।

আঁকাবাঁকা, একের পর এক বাঁক নিয়ে সেই দিগন্ত পর্যন্ত গেছে উপকূলীয় সড়ক। কালো ফিতার মত। মাইলের পর মাইল পাহাড়ের কোলে-কাঁখে চড়ে বা মাথার উপর দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

‘ইউএস সরকার আমাকে বাঁচাতে চাইছে?’ মৃদু হাসল রানা, ‘নিশ্চয়ই নিজ স্বার্থেই? ইউএস সরকার অন্য সবার মস্ত ক্ষতি করে দিয়ে নিজেদের ভালর দিকে সবসময় খেয়াল রাখে।’

‘রানা...’ নিচু স্বরে বলল তিশা। ‘সামনে দেখো।’

তিশাকে দেখে নিয়ে পরক্ষণে দূরে চাইল রানা। বিড়বিড়

করে বলল, ‘মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভাগ্যদেবী। ড্রাগন কর্পোরেশন বোধহয় ওদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছে!’

আধমাইল দূরে ওশান রোডে মিলেছে শাখা রাস্তা। ডানদিকের ওই পথ গেছে পাহাড়ের কাঁধে। ওদিকে রয়েছে এয়ারস্ট্রিপ। এবং ওদিক থেকেই রওয়ানা হয়েছে দুটো প্রকাণ্ড সেমি-ট্রেইলার রিগ। অবশ্য পিছনে ট্রেইলার নেই। খাড়া ঢাল বেয়ে প্রচণ্ড গতি নিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজে নেমে আসছে রানা ও তিশার গাড়ির দিকে!

ওই দুই রিগের পিছন আকাশে ভাসছে ‘ড্রাগন কর্পো:’ লেখা আধুনিক বেল জেট রেঞ্জার কপ্টার। এসেছে এয়ারফিল্ডের দিক থেকেই।

ড্রাগন কর্পোরেশনের কেউ রেডিয়ো করেছে, ভাবছে রানা। এয়ারফিল্ডে যা ছিল, সব পাঠিয়ে দিয়েছে ওদেরকে ঠেকাবার জন্য।

‘মুখোমুখি ধাক্কা দিতে চায় বোধহয়,’ বলল তিশা।

‘না,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘ওরা অ্যাক্সিডেন্ট চাইছে না। পথ ব্লক করবে।’

এয়ারস্ট্রিপ ও গ্রেট ওশান রোডের সঙ্গমে পৌঁছে গেছে দুই ট্রাক। গতি কমিয়ে বাঁক নিল, থেমে গেল স্কিড করে। গোটা পথ জুড়ে ব্লকেড তৈরি করেছে।

এখন আর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

‘আপা,’ রেডিয়ো করল রানা, ‘আলাপের সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি পারেন পৌঁছে যান।’

পাহাড়ি, আঁকাবাঁকা পথে ছুটছে ডাব্লিউআরএক্স, ক্রমেই কাছে চলে আসছে সেমি-ট্রেইলার রিগদুটো।

কিন্তু রোড ব্লকেডের দুই শ’ গজ দূরে ক্রিচ-ক্রিচ আওয়াজে ব্রেক কষল রানা। রাস্তার মাঝে থেমে গেল ডাব্লিউআরএক্স।

মুখোমুখি হয়েছে দুই পক্ষ ।

দুটো রিগ । একটি র্যালি কার ।

চট করে রিয়ার ভিউ মিররে পিছনদিক দেখল রানা ।

তুমুল গতি তুলে আসছে পাঁচ সুপার কার ।

ওগুলোর পিছনে যেন এদিকে ঝুঁকে এসেছে কালো, গম্ভীর,
প্রকাণ্ড পাথুরে দুর্গ । হঠাৎ করেই ওই দুর্গের উঠান থেকে লাফিয়ে
আকাশে উঠল দুটো হেলিকপ্টার । চেজ শুরু করল তারাও ।

পেদরোনভের দুই এমআই-৩৪ চপার ।

‘বিপদেই পড়া গেল!’ বলল তিশা ।

জবাবে কিছুই বলল না রানা, ওর চোখ চলে গেল সামনের
রাস্তার উপর ।

দুই শ’ গজ দূরে দুই রিগ, ওগুলোর মাথার উপর ড্রাগন
কর্পোরেশন লেখা কপ্টার । বামদিকে পাথুরে জমিন নেমেছে চার
শ’ ফুট নীচে । রাস্তা থেকে পড়ে যাওয়া ঠেকাতে রয়েছে বড়
জোর দুই ফুট উঁচু এক কংক্রিট দেয়াল ।

ওই দেয়াল, ভাবল রানা ।

‘পিছনের গাড়ি প্রায় পৌঁছে গেছে,’ চাপা স্বরে বলল তিশা ।

‘আসুক,’ রানার চোখ কংক্রিটের গার্ড রেইল ফেন্সের উপর ।
দেয়ালের ওপাশে ঝুলছে ড্রাগন কর্পোরেশনের হেলিকপ্টার । ওটা
আছে রাস্তা সমতলে ।

‘কাজটা সম্ভব,’ বিড়বিড় করল রানা, সরু হয়ে গেছে দুই
চোখ ।

‘কী সম্ভব?’ রানার দিকে ঘুরে চাইল তিশা ।

‘এখনই দেখবে ।’

অ্যাক্সেলারেটর পেডাল টিপে ধরল রানা । দুই রিগের দিকে
ছিটকে রওনা হলো ডাব্লিউআরএক্স র্যালি গাড়ি ।

কয়েক সেকেন্ডে তুমুল গতি তুলল । টার্বো-চার্জার থেকে

প্রচণ্ড শক্তি পাচ্ছে চার চাকা। স্‌স্‌স্‌স্‌! আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিন।

প্রতি ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার... আশি...

এক শ'...

এক শ' বিশ...

রাস্তার মাঝের দুই বাধার দিকে ছুটছে ডাব্লিউআরএক্স।

ড্রাগন কর্পোরেশনের দুই রিগের ড্রাইভার বিস্মিত হয়ে দেখছে, উন্মাদটা করে কী!

পরের সেকেন্ডে হঠাৎ করেই বামে সরল রানার গাড়ি, চলে গেল কংক্রিটের গার্ড-রেইল ফেন্সের পাশে।

ক্রিঁচ-ক্রিঁচ-ক্রিঁচ-ক্রিঁচ! আওয়াজে কংক্রিটের গায়ে ঘষা খেল গাড়ি।

বামপাশের দুই চাকা ঘেঁষে চলেছে কংক্রিটের ব্যারিয়ারে। পরক্ষণে ধূপ আওয়াজে কংক্রিটের উপর চেপে বসল দুই চাকা।

অ্যাসফল্ট ছেঁড়েছে গাড়ির বামদিক। দেয়ালের উপর দিয়ে ছুটছে দুই চাকা। কাত হয়ে গেছে গাড়ি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি।

বাঁকা হয়ে সামনের দিক দেখছে রানা ও তিশা।

‘যথেষ্ট জায়গা কিন্তু নেই, রানা,’ চেষ্টা করে উঠল তিশা। আঙুল তুলে দেখাল দেয়ালের খুব কাছে রিগ।

ঠিকই বলেছে তিশা।

‘আমার কাজ শেষ হয়নি,’ পাল্টা বলল রানা।

ঝটকা দিয়ে ডানদিকে ঘোরালো স্টিয়ারিং হুইল।

ফলাফল হলো তাৎক্ষণিক।

হোঁচট খেল ডাব্লিউআরএক্স, সামনের টায়ার ডানদিকে সরতে শুরু করেছে। ফলে গাড়ির পিছন অংশ সরছে বামে— দেয়ালের ওপাশে বেরিয়ে গেল পিছন দিক— অনেক নীচে সাগর ও পাথুরে সৈকত...

কংক্রিটের গার্ড-রেইলের উপর দিয়ে জোরালো ছ্যার-ছ্যার-
ছ্যার আওয়াজে সরছে গাড়ি। পিছনের দুই চাকা ঝুলছে সাগরের
চার শ' ফুট উপরে।

গতি প্রচণ্ড, পিছলে চলেছে গাড়ি গার্ড রেইল ফেন্সের উপর
ভর করে। সামনের দুই চাকা দেয়ালের এপাশে, পিছনের দুই
চাকা সাগরের দিকে। চার চাকার একটাও স্পর্শ করছে না রাস্তা।

দুই হাতে চোখ ঢাকল তিশা।

দেয়ালে আড়াআড়িভাবে পেট রেখে ছুটছে ডার্লিউআরএক্স।
জোরালো খস-খস-খস! আওয়াজ তুলছে নীচের অংশ।
নানাদিকে ছিটকাচ্ছে লাল-হলুদ আগুনের ফুলকি।

দুই রিগের ড্রাইভার হতবাক হয়ে দেখল, ওদেরকে পাশ
কাটাতে শুরু করেছে পাগল লোকটা!

ওদিকে সামান্য জায়গা, বেরুতে পারবে না কোনও গাড়ি।

অথচ অকল্পনীয় দৃশ্য দেখল তারা।

সাগরের দিকে নামছে গাড়ির পিছনের দুই চাকা।

‘পড়ে যাচ্ছি, রানা!’ আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল তিশা।

‘না,’ চাপা স্বরে বলল রানা।

ঠিকই বলেছে ও।

তখনই গাড়ির পিছনদিক দড়াম করে লাগল ড্রাগন
কর্পোরেশনের কপ্টারের নাকে।

নিচু দেয়ালের পাশেই ঝুলছিল যান্ত্রিক ফড়িং। ওটার নাকে
বেদম গুঁতো দিয়ে আবারও রাস্তায় ফিরল ডার্লিউআরএক্স।
কুচকুচে কালো অ্যাসফল্টের সমতল জমিতে ধুপ করে নামল চার
চাকা।

আগেই পিছনে পড়েছে দুই ট্রাক, সামনের রাস্তা ফাঁকা।

পরের কয়েক সেকেন্ডে এক শ' কিলোমিটার গতি পেল
র্যালি কার।

পিছনে বাঁক নিচ্ছে দুই ট্রেইলার, শত্রুকে অনুসরণ করবে।

এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র মার্সেনারিরা ডেমিয়েন ডগলাসের কাছ থেকে ‘ধার’ নিয়েছে দুই ইউরোপিয়ান স্পোর্টস কার— লাল ফেরারি ও রূপালি পোর্শ, দুটোরই বিদ্যুৎগতি।

দুই ট্রেইলারের মাঝ দিয়ে সাঁই করে বুলেটের মত বেরিয়ে এল ফেরারি ও পোর্শ। কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছে গেল রানা ও তিশার ঘাড়ের কাছে।

পোর্শের দুই মার্সেনারি কাজে লাগাল ওপেন-এয়ার টারগা ছাতের সুবিধা, একজন উঠে দাঁড়িয়েছে অস্ত্র হাতে, পরক্ষণে গুলিবর্ষণ শুরু করল রানার গাড়ির উপর।

ওদিকে ফেরারির প্যাসেঞ্জার উইণ্ডো দিয়ে কোমর বের করেছে আরেক গানম্যান, সে-ও গুলি করছে রানাদের উদ্দেশে।

একরাশ গুলির আঘাতে বানঝন করে ভেঙে পড়ল রানাদের গাড়ির পিছনের কাঁচ। চট করে পিছনে চাইল রানা।

‘একটা কথা বলবে, রানা?’ প্রশ্ন করল তিশা।

‘নিশ্চয়ই— সেটা কী?’

‘কোথায় শিখেছ এই ড্রাইভিং? বিশেষ কোনও স্কুলে?’

‘আমার আপন চাচার কাছে প্রথম সবক নিয়েছিলাম।’ কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল রানা। ‘উনি যৌবনে “অফেন্সিভ ড্রাইভিং স্কুল” নামে একটা প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন ব্রিটেনে। একেবারেই চলেনি স্কুল। কিছুদিন হলিউডের স্টান্ট ড্রাইভারও ছিলেন। কিশোর বয়সে আমাকে শেখান গাড়ি-চালনার নানা কৌশল।’

জোরালো টাশ-টাশ-টাশ-টাশ! আওয়াজ শুরু হয়েছে।

রাস্তার বিটুমেন চিবিয়ে তুলছে একসারি বুলেট, এসে লাগছে ড্রাইভিং দরজার পাশে। পরের সেকেন্ডে মাথার উপর দিয়ে গেল দ্রুতগতি এমআই-৩৪ কপ্টার।

ওটাতে করে এসেছে কোবরা বাউন্টি হান্টাররা ।

দু' সেকেণ্ড পর ক্লিফের পাশ দিয়ে ডানে বাঁক নিল রাস্তা ।
পিছু নিয়েছে কপ্টার, ওটার বুলেট বর্ষণ এড়াতে আরেকদিকে
সরে গেল রানা ।

তখনই বিকট আওয়াজ শুনল ।

রাস্তার ডানদিকে লাফিয়ে উঠেছে ক্লিফের পাথুরে দেয়াল ।
নানাদিকে ছিটকে গেল ছোট-বড় পাথর ও কাঁকড় । এক সেকেণ্ড
আগে ওই জায়গা পেরিয়ে এসেছে রানার র্যালি কার ।

চট করে ওদিকে চাইল রানা, পরক্ষণে খুঁজতে চাইল ওই
প্রবল বিস্ফোরণের উৎস ।

এবার দেখতে পেল । 'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল ।

উপকূলের দিকে আসছে এক রণতরী । সরে এসেছে দিগন্তের
কাছে জড় হওয়া নেভাল ভেসেলগুলো থেকে ।

ওই রণতরী ফ্রান্সের তুরভিল-ক্লাস ডেস্ট্রয়ার । নাকের কাছে
শক্তিশালী ৩.৯ ইঞ্চির কামান । প্রতিটা গোলা উগরে দেয়ার সঙ্গে
সঙ্গে ভলকে উঠছে কামানের মুখ থেকে ধূসর ধোঁয়া । কয়েক
সেকেণ্ড পর পর থরথর করে বুক কাঁপিয়ে দেয়া বিকট বুম! বুম!
বুম! আওয়াজ আসছে ।

মাত্র এক সেকেণ্ড পর ভয়ঙ্কর আওয়াজ আবারও শুনল
রানা ।

বুম!

বুম!

বুম!

পাশের ক্লিফে এবং রাস্তার উপর নামছে একের পর এক
শেল । ঝরঝর করে গাড়ির উপর পড়ছে ছোট পাথর ও কাঁকর ।
তীরগতি তুলে ছুটছে রানা । লাফিয়ে আকাশে উঠল সামনের
অ্যাসফল্ট ও কাঁকর । ওই জায়গায় দেখা গেল গভীর গর্ত ।

গোলা বর্ষণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে পথের অর্ধেক।

রাস্তায় গোলা নামতেই তৈরি হয়েছে মস্ত গর্ত। তীব্রগতি গাড়ি সরিয়ে নিয়ে সামনের বিপদ এড়িয়ে গেল রানা। আকাশ থেকে ঝরঝর করে পড়ছে নুড়ি পাথর, ধুলো ও কাঁকর। তারই ভিতর দিয়ে ওপাশে ছিটকে বেরিয়ে গেল গাড়ি। চট করে একবার পিছনে চাইল রানা। রাস্তায় তৈরি হয়েছে প্রায় গোলাকার গর্ত। অনেক নীচের সাগরের দিকে নেমেছে একপাশ।

থ্রোট ওশান রোডের ডানে ও বাঁয়ে নামছে একের পর এক শেল। আঁকাবাঁকা পথে এগুতে শুরু করেছে রানা। সামনে জন্ম নিচ্ছে মস্ত সব গর্ত, আর সেগুলোর কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওর গাড়ি।

রানার পিছনের আকাশে ঝুলছে ড্রাগন কর্পোরেশনের কপ্টার। ওটাও ডেস্ট্রয়ারের গোলা এড়াতে ব্যস্ত।

কিন্তু কোবরা কমাণ্ডোদের দুই এমআই-৩৪ কপ্টার কোনও কিছুকেই পাত্তা দিচ্ছে না। রানার পিছু নেয়া বন্ধ না করে ব্যবহার করছে পাশের কামান। একের পর এক গোলা পড়ছে রাস্তার বুকে।

ঠিক তখনই আরেকটি বাঁক পেরোল রানা। সামনে পড়ল পাহাড়ের বুকে টানেল। দেরি না করে উচ্চতা বাড়াতে লাগল দুই রাশান কপ্টার, পেরিয়ে গেল পাহাড়। ওগুলোকে আর দেখা গেল না।

টানেলে ঢুকেই রানা ও তিশা টের পেল, হঠাৎ করেই নেমেছে নীরবতা।

কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

ওদের পিছনে পৌঁছে গেছে ড্রাগন কর্পোরেশনের দুই স্পোর্টস্ কার— ফেরারি ও পোর্শ— বিকট গর্জন ছাড়ছে দুই

ইঞ্জিন। দুই গাড়ির গানাররা গুলি করছে ওদের গাড়ি লক্ষ্য করে।

টানেলের বামে সাগরের দিকে সরে গেল রানা। তখনই টের পেল, এটা আসলে টানেল নয়। বামদিকে পাথরের দেয়ালের মাঝে ফাঁকা সব জায়গা। সামান্য দূরে দূরে সরু কিছু কলাম ধরে রেখেছে দেয়ালকে। ঝড়ের গতিতে কলামগুলো পিছনে পড়ছে। ড্রাইভিং সিট থেকে ঝাপসা দেখা গেল ওদিকে অনেক নীচে সাগর।

তথ্যটা মাত্র মগজে ঢুকেছে রানার, এমন সময় দেখল দ্রুতগতি কলামগুলোর ওদিকে হাজির হয়েছে কোবরা কমাণ্ডোদের কপ্টার। খোলা টানেলের ভিতর গুলি করছে।

রাস্তার বিটুমেন খুবলে তুলছে বুলেট, খটাখট বিঁধছে রানার গাড়ির গায়ে, লাগছে গিয়ে টানেলের ওদিকের দেয়ালে।

দেরি না করে সরতে লাগল রানা, গাড়ি চলে গেল ডানদিকের দেয়ালের পাশে। কমে গেছে গতি।

তখনই এল পিছনের দুই স্পোর্টস্ কার। পিছন থেকে বেদম গুঁতো দিল পোশ। বাম থেকে চেপে আসতে চাইল ফেরারি। খুশি মনে গুলি করছে দুই গাড়ির দুই কমাণ্ডো।

ডার্লিউআরএক্সের ভিতর ভ্রমরের আওয়াজ তুলল একরাশ গুলি। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল রানার পাশের কাঁচ।

এবং টানেলের শেষে দেখা দিল ভয়ঙ্কর এক আকৃতি।

রাস্তা থেকে সামান্য উপরে ভাসছে কোবরা ইউনিটের দ্বিতীয় এমআই-৩৪ কপ্টার। পুরো তৈরি, বাগিয়ে রেখেছে পাশের মিসাইল পড। এবার আসবে মৃত্যুবাহী মিসাইল!

হতাশ ভঙ্গিতে সিটে হেলান দিল তিশা।

কোনও আশার বাণী শোনাতে পারল না রানা।

কপ্টারের মিসাইল পডগুলো থেকে হঠাৎ করেই ছিটকে

বেরোল মিসাইল। পিছনে ছিটিয়ে দিল হলদে আগুন। কিন্তু তখনই বিস্ফোরিত হলো ওই কপ্টার। ফরাসিদের ডেস্ট্রয়ার থেকে এসে পড়েছে শেল। ওই একই সময়ে বিস্ফোরিত হলো এমআই-৩৪-এর মিসাইল। পড থেকে মাত্র বেরুতে শুরু করেছিল।

ভয়ঙ্কর শক্তিশালী নেভাল শেল উড়িয়ে দিয়েছে কোবরা কপ্টার, ছিটকে চলে গেল ওটা রাস্তার আরেক পাশে। ওখানেই থামল, পরক্ষণে অ্যালিউমিনিয়ামের ক্যানের মত খসে পড়ল সরাসরি চার শ' ফুট নীচে। জেনেশুনে টার্গেট করা হয়নি কপ্টারকে, বুঝে গেছে রানা। ওটা চলে এসেছিল আসলে গোলায় গতিপথের উপর।

‘যাক, একটা গেল...’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তিশা।

একবার ওকে দেখে নিয়ে ড্রাইভিঙে মনোযোগ দিল রানা।

টানেল থেকে ছিটকে বেরোল ডাব্লিউআরএক্স, ঝড়ের গতিতে পেরিয়ে গেল এমআই-৩৪ কপ্টারের পতনের জায়গাটা। এখনও ওকে কোণঠাসা করে রেখেছে ড্রাগন কর্পোরেশনের দুই গাড়ি।

পাথুরে দেয়ালের পাশ দিয়ে তুমুল গতি তুলে ছুটছে রানা।

দেখতে না দেখতে কয়েক শ' ফুট পেরিয়ে গেল তিন গাড়ি, তারপর রানা দেখল সামনে হাঁ করা আরেকটা টানেল। ওটা আছে বড়জোর দুই শ' গজ দূরে।

দড়াম!

রানার গাড়ির বামপাশে চেপে এল ফেরারি, পাথুরে দেয়ালের দিকে ঠেলছে।

দুই হাতে খপ্পু করে স্টিয়ারিং ধরল রানা।

পিছন থেকে গুঁতো দিচ্ছে পোশ।

রানা প্রথমে বুঝল না কী কারণে ওকে ঠেলছে এরা।

পরক্ষণে টের পেল ।

টানেলের আর্চওয়ের ডানদিকে রয়েছে পাথুরে দেয়াল ।

ওদিকে ঠেলছে ফেরারি ও পোর্শের খুনিগুলো ।

রানা যে গতিতে ছুটছে, সোজা গিয়ে বিধ্বস্ত হবে আর্চওয়ের পাশে ।

হিসাব কষে ফেলল রানা ।

হাতে আছে বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড!

‘এবার? রানা?’ ভয় পেয়েছে তিশা ।

‘দেখো না!’ ড্রাইভিঙের ফাঁকে বলল রানা ।

আর চার সেকেন্ড...

সবু রাস্তা ধরে ছুটছে তিন রেসিং কার ।

তিন সেকেন্ড...

ডানদিকের পাথুরে দেয়ালের দিকে ঠেলছে ফেরারি ।

জেদি, একগুঁয়ে বাচ্চার মত জায়গা ছাড়তে চাইছে না রানা ।

শক্ত হাতে ধরে আছে স্টিয়ারিং হুইল ।

আর্চওয়ের একটু আগে পৌঁছেই প্রবল ঘষা খেয়ে উপরে উঠল ডাব্লিউআরএক্সের ডানদিকের দুই চাকা ।

পিছন থেকে ভয়ঙ্কর গুঁতো দিল পোর্শে ।

‘এবার?’ আশা ছেড়ে দিয়েছে তিশা ।

আর এক সেকেন্ড, তারপর...

যেন উল্টো ওদের দিকে বিদ্যুৎবেগে আসছে আর্চওয়ে ।

‘ঠিক আছে, এইবার!’ নিচু স্বরে বলল রানা ।

তখনই কাজে নামল ।

এবার আর্চওয়ের মুখে বিধ্বস্ত হবে গাড়ি ।

কিন্তু ফেরারিকে ডানদিকের দেয়ালে ওকে চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ করে দিল রানা ।

পরক্ষণে দেয়ালে ষাট ডিগ্রি কাত হলো ডাব্লিউআরএক্স,

দেয়াল বেয়ে উঠছে ডানদিকের দুই চাকা ।

সময় যেন ধীর হয়ে গেল ।

তখনই অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় ঘটনাটা ঘটল...

আর্চওয়ের পাঁচ গজ আগে ছিটকে দেয়ালে উঠেছে রানার ইলেকট্রিক ব্লু র্যালি কার...

পর সেকেণ্ডে শূন্যে গড়ান দিল ওটা...

ছাত নীচে, মেঝে আকাশে । পাশেই ছুটছে নিচু ছাতের ফেরারি । ওটার উপর নামল রানার গাড়ি ।

মুহূর্তের জন্য ফেরারির পিঠে পিঠ রেখে স্থির থাকল ডাব্লিউআরএস্স । আকাশের দিকে তাক করেছে ঘুরন্ত চাকা ।

পরক্ষণে গড়ান দিয়ে নিরাপদে ধপ্ করে নামল টানেলে । চলে এসেছে সাগরের দিকে । লাল রঙের সুপার কারের পাশেই ছিটকে বেরোল টানেল থেকে । এখন ডানদিকে ফেরারি ।

কিন্তু পোর্শের ড্রাইভার বা গানম্যানের কপাল মন্দ ।

রানার লেজেই ছিল ওরা, ভেবেছিল একেবারে শেষসময়ে সরে যাবে । কিন্তু পোর্শের ড্রাইভার ভাবতেও পারেনি রানার গাড়ি শূন্যে পাক খেয়ে আবারও রাস্তায় নামবে সিধে হয়ে । মাত্র এক সেকেণ্ডে ওদিকে চেয়েছে সে, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে ।

আর্চওয়ের দেয়ালে ভয়ঙ্কর গতি নিয়ে আছড়ে পড়েছে পোর্শ । ফলে তৈরি হয়েছে মস্ত আগুনের গোলা ।

কপাল নিয়ে এসেছে ফেরারির ড্রাইভার ও গানম্যান ।

কিন্তু ফুরিয়ে গেল ওই সামান্য ভাগ্য ।

এখন বামদিকে রানা, উল্টো ডানদিকের দেয়ালের দিকে ঠেলছে ফেরারিকে ।

পাশের গাড়ির ড্রাইভারের চেয়ে ঢের দক্ষ ও । গুঁতো দিল ফেরারির সামনের দিকে । ফলে হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ বাঁক নিল

ওটা, প্রচণ্ড বেগে লাগল টানেলের ডান দেয়ালে। বিধ্বস্ত হয়েই উল্টে ছিটকে পড়ল খেলনার মত। থামল না, স্থির হলো গিয়ে বামদিকের দেয়ালে লেগে। ভোঁতা ধূপ আওয়াজ তুলে স্থির হলো পিঠের উপর ভর করে। তার আগেই লাশ হয়ে গেছে যাত্রীরা।

টানেল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা ও তিশার গাড়ি, আর তখনই পাশে পৌঁছে গেল কোবরা বাউন্টি হান্টারদের এমআই-৩৪।

প্রচণ্ড গতি তুলে পাহাড়ের কাঁধে ছুটছে গাড়ি, পাশেই কন্টার। ডানদিকের ডোরণে খুলে যেতেই দেখা গেল এক স্নাইপারকে। এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল সে।

টের পেল রানা, যতই দ্রুত চলুক গাড়ি, ওই সামরিক কন্টার দ্বিগুণ গতি তুলতে পারবে। পাশে থাকছে অনায়াসে।

‘তিশা!’ তাড়া দেয়ার সুরে বলল রানা, ‘ওই কন্টার সরতে হবে! স্নাইপারকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করো!’

‘খুশি মনে!’ বলল তিশা, ‘গতি কমাও!’

অ্যাক্সেলারেটরের উপর চাপ সরতেই গতি কমল ডাব্লিউআরএক্সের, আর সেই সুযোগে বাইরের দিকে ডেয়াট ঈগল পিস্তল তাক করল তিশা।

পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল ও।

দুটোই লক্ষ্যভেদ করেছে।

কন্টারের দরজায় হোঁচট খেয়ে নীচে পড়তে লাগল স্নাইপার।

কিছু কোমরে পুরু নাইলনের দড়ি।

চল্লিশ ফুট পড়বার পর ঝটকা খেয়ে থামল লাশ।

‘দুর্দান্ত লক্ষ্যভেদ,’ প্রশংসা করল রানা।

পাল্টা চোঁচিয়ে উঠল তিশা, ‘রানা! সামনে দেখো! আরেকটা শাখা রাস্তা!’

সত্যিই, দু'ভাগে ভাগ হয়েছে সামনের পথ। একটা গেছে
নীচের দিকে। ডানদিকেরটা মূল গ্রেট ওশান রোড।

বামে যাব, না ডানে, ভাবল রানা।

সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হলো ওর জন্য।

ডানদিকের রাস্তার উপর বিস্ফোরিত হয়েছে ডেস্ট্রয়ারের
গোলা।

বামে যাওয়াই উচিত।

ক্রিঁচ-ক্রিঁচ আওয়াজ তুলে বাঁক নিল রানার ডার্লিউআরএক্স।
আপত্তি তুলছে চাকাগুলো। রওনা হয়ে গেল ওরা নীচের দিকে
যাওয়া রাস্তা ধরে।

পিছু নিল এমআই-৩৪।

দুই

রানা ও তিশার গাড়ির কয়েক শ' গজ পিছনে গ্রেট ওশান রোডে
তুমুল গতি তুলে ছুটছে কুয়াশার কুচকুচে কালো ল্যামবোরঘিনি
ডায়াব্লো।

রানার গাড়ি ঠেকাতে যে ব্লকেড তৈরি করেছিল দুই সেমি-
ট্রেইলার, সে-দুটো এখন সামনে। আরও দূরে দুর্গ থেকে
ছিনতাই করা ড্রাগন কর্পোরেশনের অন্য তিন পিউজো র্যালি
কার।

খুব দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব।

পিউজো র্যালি কারগুলোর পঞ্চাশ গজ সামনে রাস্তার বাঁকে

পৌছে গেছে রানার নীল ডাব্লিউআরএক্স ।

কিন্তু ওটার উপর হামলে পড়েছে অবশিষ্ট কোবরা এমআই-৩৪ কপ্টার ।

বামে সাগরের দিকে চাইল কুয়াশা, তেড়ে আসছে ডেস্ট্রয়ার । মুহূর্তের জন্য দেখা গেল পাখির মত দুই আকৃতি, সোজা আসছে উপকূলীয় রোড লক্ষ্য করে ।

চট করে বুঝে গেল কুয়াশা, ওই দুই ফাইটার জেট এসেছে দিগন্তের কাছে বসে থাকা ফ্রেঞ্চ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে ।

‘সর্বনাশ,’ বিড়বিড় করল কুয়াশা । গোটা ফ্রেঞ্চ সরকারকে যেন কিনে নিয়েছে ওই ডেমিয়েন লোকটা !

আবারও ঘুরে চাইল সামনে । মোড়ের বামদিকের রাস্তা ধরে নেমে চলেছে রানার গাড়ি, পাহাড়ের কোলে হারিয়ে গেল ।

তখনই রানার শত্রুদেরকে অদ্ভুত একটি কাজ করতে দেখল কুয়াশা ।

দু’ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা ।

শাখা রাস্তায় রানার পিছু নিল ড্রাগন কর্পোরেশনের একটিমাত্র পিউজো । অন্যদুটো বিস্ফোরণে তৈরি মস্ত এক গর্ত পাশ কাটিয়ে চলে গেল ডানদিকের রাস্তা ধরে ।

কয়েক মুহূর্ত পর মোড়ে পৌছে গেল দুই ট্রেইলার, ওগুলোও বাঁক নিল বামদিকে । পাহাড় বেয়ে নামছে ঝড়ের গতিতে ।

হিসাব কষেই এ কাজ করা হয়েছে, ভাবল কুয়াশা ।

কোনও পরিকল্পনা আছে তাদের ।

কুয়াশা নিজেও পৌছে গেল মোড়ে, এবং দ্বিধা না করেই রওনা হয়ে গেল বামের রাস্তায় ।

প্রচণ্ড গতি তুলছে ল্যামবোরঘিনি ডায়াব্লো ।

নীচের বোটহাউসের দিকে স্‌স্‌স্‌স্‌ আওয়াজ তুলে ছুটছে রানা ও

তিশার ডাব্লিউআরএক্স গাড়ি। ঝড়ের বেগে পেরিয়ে যাচ্ছে অন্ধ সব তীক্ষ্ণ বাঁক।

গতি আরও তুলছে রানা, এমনসময় পিছন থেকে এল বৃষ্টির ফোঁটার মত অসংখ্য বুলেট। খটাখট লাগছে গাড়ির পিছনে ও আশপাশের পাথরের দেয়ালে। এসব গুলি আসছে উড়ে আসা এমআই-৩৪ কন্সটার থেকে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সাইড মাউন্টেড মেশিনগানদুটো।

এখনও শিথিলভাবে ঝুলছে কন্সটারের মৃত স্লাইপার, একবার এদিক আবার ওদিক সরছে লাশ। কখনও কখনও ধুপ করে নামছে রাস্তার উপর। রক্তের দাগ রয়ে যাচ্ছে কালো অ্যাসফল্টে।

পিছন থেকে গুলি করছে হলদে পিউজোর প্যাসেঞ্জার। জানালা দিয়ে কোমর বের করে দিয়েছে, হাতে শটায়ার।

সামনে গুলি চলছে, এবং মাত্র দু'শ' গজ পিছনে পৌঁছে গেছে কুয়াশা— তুমুল গতি তুলছে ল্যামবোরঘিনি ডায়াব্লো।

‘এস’এর মত বাঁকে সহজেই দুই সেমি-ট্রেইলারকে পাশ কাটাল কুয়াশা। দুই ড্রাইভার দেখল, ল্যামবোরঘিনির পিছনে পড়েছে ওরা।

পরের মুহূর্তে হলদে পিউজোর পিছনে পৌঁছল কুয়াশা। ডানদিক দিয়ে পাশ কাটাতে চাইল। কিন্তু ঐক্যেবঁকে এগুতে শুরু করেছে পিউজো, পথ ছাড়বে না। বামপাশ দিয়ে বেরোতে চাইল কুয়াশা, মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর। ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছে। অনেক নীচে সাগর। রাস্তার ওদিকে সরেই বিদ্যুৎবেগে ওভারটেক করল পিউজোকে।

ড্রাইভার শুধু দেখল, বামপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কালো এক রকেট— আর তখনই ড্রাইভারের জানালা দিয়ে ভিতরে পড়ল

এম-৬৭ থ্রেনেড। ঠক-ঠক আওয়াজ তুলে মেঝের উপর স্থির হলো বোমা।

এইমাত্র তীরের মত ছিটকে চলে গেছে ল্যামবোরঘিনি, আর পরের সেকেণ্ডে বিস্ফোরিত হলো হলদে পিউজো। চারপাশে ছিটিয়ে গেল লাল-হলুদ আগুন। সামনের বাঁকে পৌঁছে গেল জ্বলন্ত পিউজো, গার্ড রেইল ফেন্স ভেঙে ছিটকে পড়ল অনেক নীচের সাগরে।

রানার ডার্লিউআরএক্সের বিশগজ পিছনে পৌঁছেছে কুয়াশা। মাথার উপর ভাসছে এমআই-৩৪ কপ্টার।

রানার সামনে দীর্ঘ রাস্তা, শেষমাথায় অন্ধকার টানেল। ওটার মাধ্যমে পৌঁছুবে প্রকাণ্ড বোটশেডে।

‘রানা,’ রেডিয়ো করল কুয়াশা। ‘পিছনে গুলি কোরো না। আমি ল্যামবোরঘিনির ভিতর!’

‘কালো ল্যামবোরঘিনি? অবাক হইনি,’ বলল রানা। ‘খুশি হলাম পৌঁছে গেছেন। কিছু ভেবেছেন হেলিকপ্টারের ব্যাপারে?’

চারপাশ দেখতে শুরু করেছে কুয়াশা।

রানা ডার্লিউআরএক্স নিয়ে সামনে, দ্রুত আসছে টানেল। গাড়ির উপর আকাশে ছুটছে এমআই-৩৪ কপ্টার। মৃত স্নাইপার বুলছে দড়ি থেকে। মাঝে মাঝে ধূপধাপ পড়ছে অ্যাসফল্ট রাস্তার উপর। ওই লাশ ডায়াবলোর ঠিক সামনে।

কপ্টার... স্নাইপার... টানেল... ভাবতে শুরু করেছে কুয়াশা।

এখন শুধু দরকার এক্সেপ ভেহিকেল।

রিয়ার ভিউ মিররে চাইল কুয়াশা। চোখ পড়ল ট্রাকের গ্রিলের উপর। ওটা ম্যাক রিগ— লম্বা নাক— ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে নেমে আসছে পিছনের রাস্তায়।

‘অনেক ধন্যবাদ,’ মনে মনে বলল কুয়াশা।

‘কপ্টার নিয়ে ভাবতে হবে না তোমার, রানা,’ জানিয়ে দিল।

ঝড়ের গতিতে সামনে বাড়ল ল্যামবোরঘিনি, পৌছে গেল এমআই-৩৪ কন্টারের পেটের নীচে। এখন আর ওকে দেখতে পাবে না যান্ত্রিক ফড়িং থেকে। ধূপ আওয়াজ তুলে ঝুলন্ত স্নাইপারের লাশে গুঁতো দিল ল্যামবোরঘিনি। জোর ধাক্কা খেয়ে বনেটের উপর উঠে এল লাশ। পরের মুহূর্তে এসে ঢুকল ডায়াবলোর খোলা টারগা ছাতের কারণে গাড়ির ভিতর।

দেরি না করে আলখেল্লার পকেট থেকে হ্যাণ্ডকাফ নিল কুয়াশা। একদিকের কড়া আটকে দিল মৃত স্নাইপারের সেফটি হার্নেসে, অন্যটা আটকা পড়ল ল্যামবোরঘিনির সিয়ারিং হুইলে।

ক্রুজ কন্ট্রোল বাটন টিপল কুয়াশা, ছিটকে উঠে দাঁড়াল সিটে, পরক্ষণে বেরিয়ে এল টারগা ছাতে।

একইসময়ে ল্যামবোরঘিনির পিছনে পৌছে গেল প্রকাণ্ড ম্যাক রিগ, ভয়ঙ্কর গুঁতো দিল গাড়ির পিছনে।

কিন্তু ওই ধাক্কার জন্য তৈরি ছিল কুয়াশা, দুই গাড়ি ছোঁয়া-ছুঁই করতেই মহাব্যস্ত হয়ে উঠল ও। মুহূর্তে পেরোল ল্যামবোরঘিনির পিছনের চ্যাপ্টা অংশ। হাতে উঠে এসেছে পিস্তল, গুলি শুরু করল ম্যাক রিগের উইণ্ডশিল্ড লক্ষ্য করে।

কপালে গুলি খেয়ে অক্কা পেল ড্রাইভার। ততক্ষণে ল্যামবোরঘিনি পেরিয়ে এসেছে কুয়াশা। লাফ দিয়ে উঠল ম্যাক রিগের দীর্ঘ নাকে।

পরের সেকেন্ডে ট্রাকের ভাঙা উইণ্ডশিল্ড গলে বসে পড়ল কুয়াশা ড্রাইভিং সিটে। সামনের দৃশ্য পরিষ্কার দেখল। বুঝে গেছে কী ঘটতে চলেছে।

পাহাড়ি টানেলে তীর বেগে ঢুকল রানার ডাব্লিউআরএক্স।

কোবরা কন্টারের পাইলট ভালই জানে তাকে টানেল এড়িয়ে যেতে হবে। পাহাড় পেরিয়ে আবারও শত্রুকে ধরতে হবে সামনে গিয়ে। উচ্চতা বাড়াতে চাইল পাইলট, কিন্তু সম্ভব হলো না।

আবারও চেষ্টা করল, ফলাফল আগের মতই হতাশাজনক।

উঠতে পারছে না হালকা এমআই-৩৪।

নোঙর হিসেবে কাজ করছে ছোটলত ল্যামবোরঘিনি।

দু'সেকেণ্ড পর পাইলট বুঝল, কী হতে চলেছে।

ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

ড্রাইভারহীন ল্যামবোরঘিনি তুমুল বেগে গিয়ে ঢুকল টানেলের ভিতর। আর টানেলের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল এমআই-৩৪ কপ্টার। আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো পাইলটের দুই চোখ। কপ্টারের সঙ্গে রয়ে গেছে স্নাইপারের দড়ি!

ওটা হ্যাঁচকা টানে হিড়হিড় করে নিয়ে চলেছে ওর কপ্টারকে!

তখনই ঘুরে গেল ল্যামবোরঘিনির স্টিয়ারিং হুইল। প্রচণ্ড গতি নিয়ে একপাশের দেয়ালে বিধ্বস্ত হলো গাড়ি। তার আগেই জোর টান খেয়ে পাহাড়ের বুকে আছড়ে পড়েছে এমআই-৩৪। বিস্ফোরিত হলো কপ্টার, বলের মত মস্ত আগুনের গোলা উঠে গেল আকাশে। ঝরঝর করে পাহাড় থেকে পড়তে লাগল আগুন ও আবর্জনা।

এসব পাত্তা না দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে ম্যাক রিগ নিয়ে টানেলে ঢুকে পড়ল বাঙালি বৈজ্ঞানিক, পাশ কাটিয়ে গেল পরিত্যক্ত, জ্বলন্ত ল্যামবোরঘিনি।

টানেলের শেষমাথা পেরিয়ে ঝড়ের মত বেরোলো রানার গাড়ি। আবারও উঠতে শুরু করেছে পাহাড়ি পথে।

তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েই দেখল খাড়াভাবে উঠে গেছে রাস্তা। একটু পর পর একের পর এক বাঁক। সামনে কী আছে দেখা যায় না। জানে না, রাস্তার অনেক উপরে দ্য গ্রেট ওশান রোডে খাপ পেতে আছে দুই হলদে পিউজো।

রানার পিছু না নিয়েও সংক্ষিপ্ত পথে ওখানে পৌঁছেছে তারা ।
এখন তীর গতি তুলে ফিরতি পথে আসছে ।

গতিহ্রাস না করলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে দু' পক্ষের ।

স্পিড বাড়িয়ে চলেছে রানা নিজেও, পাহাড় বেয়ে উঠছে ।
পিছনে দুই যান্ত্রিক দানব— একটা কুয়াশার দীর্ঘ নাকওয়ালা
ম্যাক রিগ, অন্যটা নাক থ্যাভড়ানো কেনওঅর্থ ।

বিদ্যুদ্বিগ্নে অন্ধ এক বাঁক পেরোল রানার ডাব্লিউআরএক্স,
আর তখনই অচিন্ত্যনীয় প্রতিরোধের মুখে পড়ল ।

বাঁকের সামনে ভ্রমরের মত ভাসছে ফাইটার জেট বিমান!

ওটার নাক তাক করা নীচের দিকে । ডানা থেকে চেয়ে আছে
অনেক ক'টা মিসাইল!

ওই বিমান চট করে চিনল রানা ।

ড্যাসল্ট মিরাজ ২০০০এনটিআই । হ্যারিয়ার জাম্প জেটের
মতই । সাধারণ মিরাজ ২০০০এন থেকে বদলে নেয়া হয়েছে ।
এ জিনিস থাকে শুধু ফরাসিদের সবচেয়ে বড় এবং নতুন সব
এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে । বিমানটা দেখতেও প্রায় হ্যারিয়ারের
মতই, পেট মোটা, কুঁজো, আর দু'জনের ককপিটের দু'পাশে
সেমি সারকুলার এয়ার ইনটেক ।

লেসারের মত ট্রেসার বুলেট উগলে দিল মিরাজ ।

রানার গাড়ির চারপাশে এসে বিঁধছে গুলি ।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল রানা, তীব্র গতিতে
পেরিয়ে গেল ভাসমান বিমানকে ।

কিন্তু ভারী ওজন নিয়ে আকাশে ঘুরে গেল মিরাজ, এবং
বুলেটের ঝড় পিছু নিল রানাদের ।

আরেকটা বাঁক পেরিয়ে গেল ডাব্লিউআরএক্স । বেশ কয়েকটা
ট্রেসার বুলেট লাগল পিছনের বাম্পারে ।

‘তিশা!’ চাপা স্বরে বলল রানা, ‘স্টিয়ারিং হুইল নাও!’

পাশ থেকে ড্রাইভিং সিটে চলে এল তিশা।
এদিকে রানা খুঁজে নিল কমব্যাট ওয়েবিং থেকে বিশেষ কিছু
বুলেট। ওগুলোর চিবুকে কমলা রঙের ব্যাণ্ড।

ষাঁড়ও বলে ওগুলোর আঘাতে থামে?

ফাইটার বিমান ঠেকাতে পারে?

ডেয়ার্ট ঈগল পিস্তলের ম্যাগাযিনে বুলেট ভরতে শুরু করেছে
রানা। কাজটা শেষ করেছে, এমনসময় সামনের রাস্তায় দেখা
দিল দ্বিতীয় মিরাজ বিমান। ওটার মেশিনগান ছুঁড়ে গুলি।
নলের মুখ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে লাল আগুন।

কিন্তু রানা এখন তৈরি।

সরে গেছে প্যাসেঞ্জার সিটে, জানালা দিয়ে বের করে দিল
কোমর, বিমানের দিকে তাক করল ডেয়ার্ট ঈগল পিস্তল।

গাড়ির সামনের রাস্তা কামড়ে তুলছে মিরাজের বুলেট।

ওই একইসময়ে গুলি করল রানা ভাসমান বিমানের দিকে।

বুম্! বুম্! বুম্! আওয়াজ তুলছে ডেয়ার্ট ঈগল।

প্রতিটা গুলি বিঁধল বিমানের দু'পাশের এয়ার ইনটেকের
ভিতর। একইসময়ে ঝাঁঝরা হলো ডার্লিউআরএক্সের উইণ্ডশিল্ড।

একমুহূর্ত পর বোঝা গেল বাঙালি বৈজ্ঞানিকের গ্যাস
এক্সপ্লোজিং বুলেট আসলে কী দুর্দান্ত জিনিস।

মিরাজের ইনটেক ফ্যানে প্রথম বুলেট বিঁধতেই চারপাশে
ছিটকে গেছে গ্যাস, চুরচুর করে দিয়েছে ফ্যানের ব্লেডগুলো।
ফলে জ্যাম হয়েছে বিমানের ইঞ্জিন। আর তখনই অনায়াসে জেট
ইঞ্জিনের ভিতর ঢুকেছে অন্য সব গুলি। ফলাফল খুবই খারাপ:
বিমানের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হাইলি ভলাটাইল ফিউয়েল
ইনজেকশন সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মাত্র দুটো বুলেট লাগল ছয় শ' মিলিয়ন ডলারের ফ্রেঞ্চ
বিমানের বারোটা বাজাতে।

খেপে উঠল ইঞ্জিনগুলো, উন্মাদের মত বনবন করে- পাক খেল বিমান, চারপাশে ছিটিয়ে দিল ট্রেসার বুলেট— পরক্ষণে বিকট বুম! আওয়াজ হলো। অসংখ্য টুকরো হলো ফ্রেঞ্চ ফাইটার। ঝরঝর করে নেমে এল তরল জ্বলন্ত তেল। বিমানের ভাঙাচোরা কাঠামো ধূপ করে নামল রানার পঞ্চাশ গজ দূরের রাস্তায়।

জানালা থেকে পিছিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে বসল রানা, আর তখনই...

দেখল ড্রাইভিং সিট থেকে ছিটকে গেছে তিশা।

কাঁধে ভয়ঙ্কর ক্ষত, বেরুতে শুরু করেছে রক্তের স্রোত। ড্রাইভিং সিটের দুই ইঞ্চি জায়গা উড়ে গেছে বুলেটের আঘাতে, ওখানে ছিল তিশার কাঁধ।

ঝট করে পা বাড়িয়ে ব্রেক পেডাল টিপে ধরল রানা, প্রায় তখনই থামল গাড়ি বিধ্বস্ত মিরাজের সামান্য আগে।

‘তিশা,’ অসহায় শোনাৎ রানার কণ্ঠ, ‘খুব ব্যথা?’

চোখের ভারী পাতা খুলল তিশা। গুণ্ডিয়ে উঠল, ‘ব্যথা... রানা... খুব...’

গাড়ি থেকে বেরিয়ে তিশার দরজার পাশে চলে এল রানা। খুলে ফেলল দরজা। দু’হাতে তুলে নিল তিশাকে। রেডিয়ো করল, ‘কুয়াশা! আপনি কোথায়?’

‘প্রথম রিগে। পিছনে আসছে আরেকটা। তুমি কোথায়... না, দেখতে পেয়েছি।’

‘তিশা আহত। ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে।’

‘বেশ, আমি থামলেই চট করে তুলে দেবে ট্রাকে,’ বলল কুয়াশা। ‘ঠিক পিছনেই থাকবে অন্য ট্রাক।’

এবার কুয়াশাকে দেখল রানা, পাহাড়ি পথে উঠে আসছে ম্যাক রিগ নিয়ে। ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিন। গতি দ্রুত।

ব্রেকের বিশী কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলে ডার্লিউআরএক্সের
পাশে থামল ট্রাক।

ঝট্ করে দরজা খুলে দিল কুয়াশা।

তিশাকে ক্যাবে তুলে দিল রানা। দড়াম করে দরজা বন্ধ
করতে না করতেই রওনা হলো কুয়াশা ট্রাক নিয়ে। পিছনের
বাঁকে দেখা দিয়েছে নাক বোঁচা কেনওঅর্থ রিগ। পূর্ণ গতি।
বিকট গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন।

মিরাজ বিমানের ধ্বংসস্থপ মাড়িয়ে রওনা হলো কুয়াশার
ম্যাক রিগ। গতি মাত্র তুলছে। দ্বিতীয় রিগ এল সব এলোমেলো
করে দিয়ে, নানাদিকে ছিটিয়ে পড়ল অবশিষ্ট মিরাজ বিমান।
প্রচণ্ড গতি কেনওঅর্থের, ভয়ঙ্করভাবে গুঁতো দিল কুয়াশার ম্যাক
রিগের পিছনে।

বিশ মাইল বেগে চলেছে ম্যাক রিগ, ধাক্কা খেয়ে চমকে গেল
রানা, কুয়াশা এবং তিশা।

ফুট বোর্ডে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

একইসময়ে বলল কুয়াশা এবং ও, ‘সামনে থেকে আসছে
আরও দুই র্যালি কার!’

পরস্পরের দিকে চাইল ওরা।

যেন নিজেকে দেখছে আয়নায়।

‘ওর কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

‘ফাইটার বিমানের মেশিনগান থেকে গুলি লেগেছে,’ বলল
রানা।

‘ও,’ চুপ হয়ে গেল কুয়াশা।

পাহাড় বেয়ে উঠছে দুই ট্রাক। একযস্ট স্ট্যাগ থেকে ভলকে
ভলকে বেরুচ্ছে কালো ধোঁয়া।

তখনই দেখা দিল দুই হলদে পিউজো র্যালি কার।

চওড়া বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসেছে।

তীরের মত নেমে আসছে পাহাড়ি পথে ।

ওই একই পথে সগর্জনে উঠছে রানা ও কুয়াশার ট্রাক ।

দুই গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটের দুই গানম্যান পাশের জানালা দিয়ে বের করে দিয়েছে কোমর । হাতে একে-৪৭ রাইফেল ।

ডালে বসা পাখির মত খতম হবে রানা-কুয়াশা-তিশা!

গুলি শুরু করল দুই গানম্যান, আর তখনই ডানদিকের গাড়ি উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল কুয়াশার ট্রাক । ড্রাগন কর্পোরেশনের দ্বিতীয় পিউজো তীরের মত সরে গেল আরেকদিকে । চেপে বসল পাহাড়ে । হোঁচট খেয়ে থামল কয়েক মুহূর্ত পর । ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে হলদে পিউজোকে পেরিয়ে গেল দ্রুতগামী দুই ট্রাক ।

পাহাড়ের মাথায় উঠে এল ম্যাক রিগ, সামনে আবারও সমতল মেইন রোড । দুই রাস্তার সঙ্গমে পৌঁছে গেছে ট্রাক ।

কিন্তু পিছনে লেগে আছে নাক-থ্যাবড়া কেনওঅর্থ ট্রাক । ওটার পিছু নিয়েছে অবশিষ্ট হলদে পিউজো । নতুন উদ্যমে শুরু হলো ধাওয়া । অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা পেয়ে ছিটকে সামনে বাড়ল র্যালি কার, কিন্তু তখনই বিস্ফোরিত হলো রাস্তার সঙ্গমস্থল । বিকট আওয়াজে কানে ঝাঁঝি লাগল । চারপাশে ছিটকে উঠেছে ধুলোর মেঘ । ফ্রেঞ্চ ডেস্ট্রয়ার থেকে এসে পড়েছে গোলা ।

একটা বাঁক পেরিয়ে এল দুই প্রকাণ্ড রিগ । বামে অনেক নীচে সুনীল সাগর । সামনে পাহাড়ের কোলে আরেকটা টানেল । সুড়ঙ্গ গেঁথে আছে পাহাড়ের বুকে, ডানদিকে বাঁক নিয়েছে । আগের টানেলগুলোর চেয়ে দীর্ঘ ।

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে নব্বুই মাইল বেগে টানেলে ঢুকে পড়ল কুয়াশার ট্রাক । আর তখনই কেনওঅর্থের পাশে পৌঁছে গেল হলদে পিউজো । প্যাসেঞ্জার জানালা দিয়ে শরীর বের করে গুলি

ছুঁড়ছে গানম্যান। একরাশ গুলি এল ম্যাক রিগের পিছনের চাকা
লক্ষ্য করে।

বিস্ফোরিত হলো ম্যাকের পিছনের চাকাগুলো।

ধাপ্-ধাপ্ আওয়াজে রাস্তা চাপড়াতে শুরু করেছে ফাটা
রাবার। পিছন দিকটা মাছের লেজের মত এপাশ-ওপাশ ঝাপটে
চলেছে।

মস্ত রিগের পিছন দিক পিছলে সরে যেতে লাগল একপাশে।

এদিকে সুযোগ পেয়ে এগুতে শুরু করেছে কেনওঅর্থ রিগ।

‘আমাদের পাশে পৌঁছে যাচ্ছে!’ সতর্ক করল রানা।

বন্ধ টানেলের ভিতর ম্যাক রিগের ডানদিকে হাজির হলো
নাক বোঁচা কেনওঅর্থ রিগ।

‘ব্যবস্থা নিচ্ছি,’ বলল কুয়াশা। ‘তুমি হইল ধরো!’

ড্রাইভারের সিট ছেড়ে উঠে পড়েছে বিজ্ঞানী, ছুটে ঢুকে
পড়ল ম্যাকের স্লিপিং কম্পার্টমেন্টে। রিগের পিছনের সমতল
ট্রেইলার কানেকশন সেকশনের জানালা দিয়ে পর পর দুবার গুলি
করল। পরের মুহূর্তে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল ঝোড়ো
হাওয়ার ভিতর।

বাঁকা টানেলে পাশাপাশি ছুটছে দুই প্রকাণ্ড রিগ।

সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে চলেছে সাগরের দিকের
কলামগুলো।

ড্রাইভিঙের মাঝে আহত তিশার দিকে চাইল রানা।

ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছে বেচারি।

কাছেই কোথাও জোরালো বুম-বুম আওয়াজ শোনা গেল।

ঝট্ করে বামে চাইল রানা। অস্পষ্ট সব কলামের ওপাশে
হাজির হয়েছে দ্বিতীয় মিরাজ ফাইটার। গুলি করছে ওদের ট্রাক
লক্ষ্য করেই।

পরিস্থিতি খুবই খারাপ, মনে মনে বলল রানা।

কয়েক সেকেন্ড পর ডানদিকে পাশাপাশি চলল কেনওঅর্থ
রিগ। ক্যাবের ভিতর ড্রাগন কর্পোরেশনের দুই লোক। ম্যাক রিগ
পাশে পেয়েই নিজেদের ট্রাকের বামের দরজা খুলল গানম্যান।

এবার উঠে আসবে শত্রুর ট্রাকে।

লোকটার দিকে ডেয়ার্ট ঈগল পিস্তল তুলল রানা, টিপে দিল
ট্রিগার।

ক্লিক!

চেম্বারে গুলি নেই।

দুই ট্রাকের মাঝের সামান্য জায়গাটা লাফিয়ে পেরিয়ে এল
ড্রাগন কর্পোরেশনের গানম্যান, ধুপ্ করে নামল প্যাসেঞ্জার
নামবার সিঁড়ির ধাপে। জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল রাইফেলের
নল, এবার গুলি করবে...

ওই একইসময়ে উরুর খাপ থেকে ম্যাগলুক নিয়েছে রানা,
যন্ত্রটা তাক করেই টিপে দিল ট্রিগার।

ফুযযয... আওয়াজ তুলল ম্যাগলুক।

ফায়ার করেনি ম্যাগনেটিক বাল্ব। দুর্বল ফিসফিস
আওয়াজ, শেষ হয়ে গেছে প্রপালশন গ্যাস।

একে-৪৭-এর মাযলের দিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে গেল
রানার।

বুঝে গেছে, এবার লাশ হবে তিশা আর ও।

সবই বুঝতে পেরেছে ড্রাগন কর্পোরেশনের গানম্যান, মুখে
ফুটে উঠল টিটকারির হাসি। তর্জনী দিয়ে আস্তে করে দাবিয়ে
দিল ট্রিগার।

ওই একইসময়ে কেনওঅর্থ ট্রাক বামে চেপে আসতেই
সত্যিকারের প্যানকেক হলো লোকটা। দুই ট্রাকে এত জোরে
গুঁতো লেগেছে, মুহূর্তের জন্য রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠল
চাকাগুলো।

চেপ্টে যাওয়া মশার মত হয়ে গেল গানম্যানের দেহ, বিস্ফোরিত হয়েছে সারাশরীর থেকে রক্ত। পিরিচের মত হয়ে গেল লোকটার দুই চোখ, খসে পড়ল ট্রাক থেকে নীচের রাস্তায়। চাপা পড়ল ট্রাকের পিছনের চাকার তলে।

আর লোকটা সরে যেতেই রানা দেখল, এখন কেনওঅর্থ ড্রাইভ করছে নতুন এক লোক— কুয়াশা!

ড্রাগন কর্পোরেশনের গানম্যান কেনওঅর্থ থেকে ম্যাক রিগের দরজার ফুটবোর্ডে নেমে আসতেই, তার ট্রাকের উল্টো দিকে পৌঁছে গেছে কুয়াশা— ম্যাক রিগের পিছনের সেকশন পেরিয়ে হাজির হয়েছে কেনওঅর্থ রিগের ডানদিকের দরজায়।

বাঁকা টানেলে পাশাপাশি ছুটছে দুই প্রকাণ্ড দানব। পিছনে আসছে শেষ হলুদ পিউজো।

রানার ম্যাক রিগ ভীষণ দুলছে এদিক-ওদিক, নানাদিকে পিছলে চলেছে পিছনের চাকা।

রেডিয়ো করল রানা, ‘কুয়াশা, ট্রাক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না। তৈরি থাকুন, আমরা আপনারটায় উঠছি।’

‘ঠিক আছে, সরে আসছি,’ বলল কুয়াশা। ‘আগে তিশাকে পাঠাও।’

ম্যাক রিগের একেবারে পাশে চলে এল কেনওঅর্থ।

সিটবেল্ট ব্যবহার করে সিঁয়ারিং হুইল স্থির রাখল রানা, লাথি দিয়ে খুলল প্যাসেঞ্জার দরজা— দু’হাতে তুলে সাবধানে সরাতে শুরু করেছে তিশাকে।

ওই একইসময়ে ড্রাইভারের দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে দিল কুয়াশা।

কিন্তু তখনই এল একরাশ গুলি।

খটাখট লাগছে দুই ট্রাকের বডিতে।

পিছনের পিউজোর লোকগুলো লক্ষ্যস্থির করতে পারেনি।

নিরাপদেই তিশাকে কুয়াশার ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে তুলে দিল রানা।

তিশা নিরাপদ বুঝে যেতেই নিজেও মাঝের দূরত্ব পেরুতে চাইল রানা। কিন্তু দিগন্ত থেকে এল কমপক্ষে কয়েক শ' গুলি। কুয়াশার ট্রাকে উঠবার সুযোগ নেই, আসছে অসংখ্য বুলেট।

ঝট করে সামনে চাইল রানা। বুঝতে দেরি হলো না কোথা থেকে এল এত গুলি।

বাঁকা টানেলের শেষে বাতাসে ভাসছে দ্বিতীয় মিরাজ ২০০০এম-১১ ফাইটার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ছয় ব্যারেলের মিনি-গান। নলগুলো থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে কমলা আগুন।

চোখের সামনে স্‌স্‌স্‌স্‌ আওয়াজ তোলা ট্রেসার রাউণ্ডগুলো দেখল রানা। এবার সব গুলি আসছে ওর দিকেই। ম্যাক রিগের ধাতব গ্রিলে লেগে ঠন-ঠন-ঠন আওয়াজ তুলছে উত্তপ্ত বুলেট সারি।

মুহূর্তে আগুন ধরল ম্যাকের ইঞ্জিনে। চারপাশে ছিটকে গেল হাইড্রলিক ফ্লুইড। এক সেকেন্ড পর উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে কিছুই দেখা গেল না। দুই পায়ে ব্রেক পেডাল চেপে ধরল রানা। কিন্তু তখনই বুঝল, ওই ব্রেক এখন অতীতের জিনিস। স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে চাইল। সামান্য নড়ল ওটা। চাপা শ্বাস ফেলল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'দাঁড়া, ফাইটার বিমান, আমি যদি শেষ হই, তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

পাশে কেনওঅর্থ রিগ রেখে নিতম্ব নাচাতে নাচাতে চলেছে রানার ম্যাক রিগ।

ওটার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে মিরাজের পাইলট।

—থামছে না শত শত বুলেটের বৃষ্টি।

টানেলের শেষে পৌঁছে গেছে দুই ট্রাক। বাধ্য হয়ে তার ট্রাক নিয়ে সরে গেল কুয়াশা। বাঁকের শেষে এসে ডানদিকে সরছে

সে, কিন্তু রানার ম্যাক রিগ একই পথে চলেছে। বনেটের উপর
দাউ দাউ আগুন। ছিন্নভিন্ন হয়েছে পিছনের চাকা। এখন আর
বাঁক নেবে না ওই ট্রাক। সোজা চলেছে তুমুল গতি তুলে।

বুঝে গেল রানা, এবার কী ঘটতে চলেছে।

এবং সেটা ঠেকাতে কিছুই করতে পারবে না ও।

আস্তু করে শ্বাস নিল রানা। মেনে নিয়েছে পরাজয়।

বাঁক নিল না ওর ট্রাক, সোজা উড়িয়ে দিল গার্ড রেইল
ফেন্স, ছিটকে বেরিয়ে গেল বিকেলের রোদে। শূন্যে ভাসতে শুরু
করেছে ট্রাক। সরাসরি চলেছে ভাসমান মিরাজ ফাইটার বিমানের
দিকে।

ছুঁড়ে মারলে যেভাবে আকাশে ওঠে ঢিল, ঠিক সেভাবে নাক
আকাশে তুলেছে ম্যাক রিগ, বনবন করে ঘুরছে চাকা, পিছনে
রেখে যাচ্ছে জ্বলন্ত বনেটের কালো ধোঁয়া। কিন্তু নীচের দিকে
নাক তাক করবার আগেই সজোরে গুঁতো দিল মিরাজ বিমানের
নাকে। ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেয়ে মস্ত হোঁচট খেল বিমান, আর ওটার
উপর চেপে বসল মস্ত ট্রাক।

ভীষণভাবে দুলতে লাগল লাথি খাওয়া মিরাজ— পরক্ষণে
বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া আগুনের
গোলা ভেসে উঠল নীল আকাশে।

পরক্ষণে নীচে রওনা হলো আগুনের গোলক, নামছে সোজা
চার শ' ফুট নীচের সাগরে। নাকে করে নিয়ে চলেছে আহত
ম্যাক রিগকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বিপুল আওয়াজ তুলে সাগরের ঢেউয়ের
ভিতর ঝপাস্ করে নামল সবই।

রানার কাছে সামান্যতম দড়িও ছিল না, আর বিকল ছিল
ম্যাগনাক, আটকা পড়েছিল বিধ্বস্ত দুই যন্ত্র দানবের মাঝে।

সবই দেখেছে কুয়াশা ও তিশা। পাহাড়ের কাঁধে তীরের মত

ছুটছে ওদের কেনও অর্থ ।

ডুকরে কেঁদে উঠল তিশা: ‘রানা... রানা...’

নিজ চোখে দেখেছে, রানাকে নিয়ে দেয়াল ভেঙে ছিটকে পড়েছে ম্যাক রিগ । গুঁতো দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে মিরাজ বিমানকে । তখনই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো । ভাঙাচোরা বিমান ও ট্রাক নেমে গেল চার শ’ ফুট নীচে । কয়েক সেকেন্ড পর ঝপাস করে সাগরে পড়ল সবই ।

না, ওই বিস্ফোরণ এবং পতনের পর বাঁচবার উপায় থাকে না কারও ।

আয়ত দুই চোখ অশ্রুতে ভরে গেছে তিশার । ‘না... না... আল্লা... না...’ মুখ নিচু করে নিল ও, নীরবে কাঁদছে ।

‘ওর সাহস ছিল মস্ত পুরুষ সিংহের মত,’ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুয়াশা । দ্রুত ভাবতে শুরু করেছে । এখন প্রথম কাজ হওয়া উচিত এই ভয়ানক বিপদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া ।

তখনই শাঁ করে ওর ট্রাক পেরিয়ে গেল শেষ পিউজো ।

চমকে গিয়ে সামনের রাস্তা দেখল কুয়াশা ।

ওদিকে রয়েছে অস্বাভাবিক একটি স্থাপনা ।

দেখতে ছোট কোনও দুর্গের মতই ।

ওটার ভিতর দিয়ে গেছে রাস্তা ।

পাথুরে কোনও খুদে দুর্গ, ছাতে হাঙরের দাঁতের মত খোঁচা-খোঁচা ব্যাটলমেন্ট ।

জিনিসটা আসলে দোতলা গেটহাউস ।

বোধহয় ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়নের সমানই বয়স ওটার ।

স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, ডেমিয়েনের সম্পত্তির শেষ সীমানা ওটাই ।

গেটওয়ের শেষে শক্তপোক্ত ড্র-ব্রিজ । দৈর্ঘ্য হবে বিশ ফুট । ওটা সরিয়ে নিলে ওদিকের রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ পুরোপুরি

বন্ধ হবে। আপাতত পেতে রাখা আছে ড্র-ব্রিজ।

কিন্তু গেটহাউসে পৌঁছে গেল পিউজো।

ওটা থেকে ছিটকে নামল এক লোক, ঝেড়ে দৌড় দিল দালানের ভিতর। কয়েক সেকেণ্ড পর কুয়াশা লক্ষ্য করল, ধীরে ধীরে উপরে উঠছে ড্র-ব্রিজ।

‘না...’ চাপা স্বরে বলল কুয়াশা। টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর।

বিকট গর্জন ছাড়ল কেনও অর্থ রিগ, গতি বাড়ছে।

ঝেড়ের গতিতে কাছে চলে আসছে মেডিইভেল গেটহাউস।

লোহার পুরু দুই শিকলে ভর করে উঠে আসছে ড্র-ব্রিজ।

খুবই কঠিন হবে সঠিক সময়ে ওটা পেরিয়ে যাওয়া।

বিদ্যুৎদেগে ছুটছে প্রকাণ্ড ট্রাক।

ধীরে ধীরে এক ফুট এক ফুট করে উঠছে ড্র-ব্রিজ।

এরই ভিতর উঠে এসেছে তিন ফুট।

পিউজোর অন্য লোকটা গুলি শুরু করেছে ট্রাক লক্ষ্য করে।

আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে ট্রাক।

মাথা নিচু করে নিল কুয়াশা।

তখনই ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল উইণ্ডশিল্ড।

তীরের মত আসছে ড্র-ব্রিজ...

সগর্জনে গেটহাউসে পৌঁছে গেল ট্রাক, ছিটকে পিছিয়ে গেল এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র লোক...

তুমুল গতি নিয়ে র‍্যাম্পের মত সেতুর উপর উঠল ট্রাক...

গতি ঘণ্টায় কমপক্ষে এক শ’ মাইল।

সেতুর শেষমাথায় পৌঁছে আকাশে ছিটকে ভেসে উঠল ট্রাক, মুহূর্তে পেরিয়ে গেল মাঝের শূন্যতা, তারপর আবারও জোরালো ধপ্ আওয়াজ তুলে নামল চাকা।

আবারও ফিরেছে ট্রাক শক্ত জমির উপর।

পর পর তিনবার লাফিয়ে উঠল রিগ, তারপর ওটাকে
নিয়ন্ত্রণে আনতে পারল কুয়াশা।

ফোঁস করে আটকে রাখা শ্বাস ছাড়ল। তখনই বিস্ফোরিত
হলো ট্রাকের সামনের রাস্তা। যেন তৈরি হয়েছে মাশরুমের
মেঘ।

এইমাত্র ওখানে নেমেছে ডেস্ট্রয়ারের গোলা।

কষে ব্রেক করল কুয়াশা। পিছলে যেতে শুরু করেছে ট্রাক।
তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পর থামল গহ্বরের মত এক
নতুন গর্তের পারে।

চট করে তিশার দিকে চাইল কুয়াশা, পুরোপুরি হতাশ।

বাস্পায়িত হয়েছে ওদের সামনের পথ। ওখানে মস্ত গভীর
গর্ত। তিরিশ ফুট দূরে আবারও শুরু হয়েছে রাস্তা।

ফাঁদে পড়েছে ওরা।

দু'পাশে খাড়া পাহাড়।

পিছনে এবং সামনে খাড়া গহ্বর।

এমনসময় হাজির হলো ড্রাগন কর্পোরেশন কপ্টার। এতক্ষণ
নিরাপদ দূরত্ব থেকে সবই দেখছিল তারা।

ট্রাকের পাশে এসে ভাসতে লাগল কপ্টার। হেলমেট
রেডিয়ো ব্যবহার করে হুমকি দিল পাইলট:

‘খবরদার! নেমে এসো ট্রাক থেকে!’

তিন

ইংল্যাণ্ড।

অক্টোবর ১৪।

ইউনাইটেড স্টেটস্‌ এম্বেসি, লণ্ডন।

বিকেল সাড়ে চারটা।

‘...তাদের মতে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে, তার মাধ্যমে বেশিদূর এগুতে পারবে না আমেরিকা বা পশ্চিমা বিশ্ব। ম্যাজেস্টিক-১২ সেন্টেম্বর এগারোতে হামলা করেনি বা করায়নি, কিন্তু এর ফলে যে সুবিধা পাওয়া গেছে, তা পূর্ণভাবেই ভোগ করছে তারা...’

টিভির পর্দায় যে লোক বলে চলেছে, সে মোসাদের মৃত এজেন্ট ডেনিস ই. ম্যাকিন। আজ খুন হয়েছে কুইন্স টাওয়ারের ছাতে।

গভীর মনোযোগে টিভি দেখছে খবির। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টেটস ডিপার্টমেন্টের চার্লস ডেলাক্রুস।

ডেস্কের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য ডকুমেন্ট।

সবই ম্যাজেস্টিক-১২ এবং বাউন্টি হান্ট সম্পর্কে জোগাড় করেছিল ডেনিস ই. ম্যাকিন।

ডকুমেন্টগুলো আবারও পড়তে শুরু করেছে খবির।

বেশ কিছু ছবিও আছে।

একটায় দেখা যাচ্ছে, এক ইকোনোমিক সামিটে লিমাথিন

থেকে নামছে একদল লোক ।

গোপনে কান পাতা হয়েছে ফোনে, পাতা ভরা তার বর্ণনা ।

চুরি করা হয়েছে ইউএসএ-র নিরাপত্তা বিভাগের ফাইল ।

দুটো ডকুমেন্ট হাপিস হয়েছে ভয়ঙ্কর কুখ্যাত ফ্রেঞ্চ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা ডিজিএসই থেকে । প্রথম ডোশিয়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, ছয়মাস আগে বিশ্ব-সেরা ক'জন ব্যবসায়ীকে একটি ডিনারে আমন্ত্রণ জানান ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট ।

দ্বিতীয় ডকুমেন্ট নিউক্লিয়ার বোমার মতই । কয়েক দিন আগে ডিজিএসই বন্দি করেছে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন গ্লোবাল জিহাদের চব্বিশজন জঙ্গীকে, তারা একটা ট্যাঙ্কার বিমান ব্যবহার করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল আইফেল টাওয়ার । গ্লোবাল জিহাদ আল-কায়দার মতই, গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইছে ইসলামি জঙ্গীবাদ ।

ডকুমেন্টটা পড়তে শুরু করে নিচু সুরে শিস বাজাল খবির । গ্লোবাল জিহাদের টেরোরিস্টদের সঙ্গে বন্দি হয়েছিল দলের অন্যতম নেতা শাহেদ করিম । সাধারণত বড় কোনও ইসলামি জঙ্গী-নেতা ধরা পড়লে দুনিয়া জুড়ে হই-হই শুরু হয় । কিন্তু শাহেদ করিমকে গোপনে আটকে রাখে ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষ ।

মার্জিনে মন্তব্য লিখেছে ডেনিস ই. ম্যাকিন: 'এদের সবাইকে ডিজিএসই-র ব্রেস্ট হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কোনও বিচারের ব্যবস্থা করা হয়নি । খবরের কাগজে কিছুই উল্লেখ ছিল না । ওই চব্বিশজনকে আর কখনও দেখাও যায়নি । লিয়ার্ড/নোয়া'য় প্রজেক্টের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে । ...ফরাসিরা কি এম-১২ কাউন্সিলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে? এ বিষয়ে বিশদ খোঁজ নেওয়া উচিত ।'

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসাবে কাজ করছে মোসাদের ডিভিডি ডিস্ক । দু'জন বয়স্ক এজেন্ট ইন্টারোগেট করছে ম্যাকিনকে,

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

ম্যাকিন লোকটা যেন ডিনামাইটের উপর বসে ছিল।

প্রথমেই সে ব্যাখ্যা দিয়েছে, আসলে ম্যাজেস্টিক-১২ কী।

ম্যাকিনের তৈরি ফাইলের তালিকা অনুযায়ী ওই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ফ্রান্সিস ওলিফ্যান্ট। মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বয়স সত্তর। ওলিফ্যান্ট-রোজ ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রধান। ডিফেন্স কন্ট্রাক্টর। হিউ এবং ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের মত মিলিটারি এয়ারক্রাফটের জন্য স্পেয়ার পার্টস তৈরি করে ও-আর ইণ্ডাস্ট্রিজ। ভিয়েতনাম বা ডেয়ার্ট স্টর্ম যুদ্ধে হাজার হাজার কোটি ডলার মুনাফা করেছে তার কর্পোরেশন।

ভাইস-চেয়ারম্যান মস্ত ব্যবসায়ী ওয়েগেল রোচ, দুনিয়া-খ্যাত গ্রিক কন্টেইনার শিপিং ম্যাগনেট।

রয়ানডল্ফ কিলিয়ান, পৃথিবীর সবচেয়ে সফল বিনিয়োগকারী।

ডিন ম্যাকেনকোর্ট, বিশ্বের সেরা এবং বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সেভেন সি-র হর্তাকর্তা।

ডেমিয়েন ডগলাস এম-১২ কাউন্সিলের সদস্য। চেয়ারম্যান এবং সিইও ড্রাগন কর্পোরেশন। এসব কোম্পানি প্রচুর মিসাইল ও রণতরী তৈরি করে।

আরও ক'জন বিপুল ক্ষমতামণ্ডলী লোকের নাম আছে ম্যাকিনের ওই তালিকায়।

খুচরা জিনিস বিক্রি করে মস্ত বড়লোক হয়েছে, এমন কয়েকজনের নাম ওই তালিকায় নেই। হলিডে ইন রিসোর্টের পরিবারের কেউ, জাপানি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হোণ্ডা বা ফ্রেঞ্চ কসমেটিক্স কোম্পানির লিলি মাখসাখের নাম অনুপস্থিত।

অথচ সুন্দরী মহিলা লিলি মাখসাখের নাম সবাই জানে, সে আছে বিশ্বের প্রথম দশজন ধনীর তালিকায়।

মেজর ডেনিস ই. ম্যাকিন টিভির পর্দায় জানিয়ে চলেছে: এম-১২ কাউন্সিলের বারোজনের ওই তালিকার সবাই বিপুল সম্পত্তি করেছে একটিমাত্র বিষয়কে পুঁজি করে।

নিচু স্বরে কথা বলছে ম্যাকিন:

‘এরা হাজার হাজার কোটি ডলার মুনাফা করেছে একটিমাত্র বিষয়কে সম্বল করে। তা হচ্ছে যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে র্যান্ডল্ফ কিলিয়ান প্রতিষ্ঠা করেন একটি লৌহ রাজ্য। ভিয়েতনাম যুদ্ধ কতটা অপরিহার্য তা নিয়ে প্রচুর বক্তৃতা দেন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ফ্রান্সিস ওলিফ্যান্ট ষাট দশকে। যুদ্ধ করতে চাইলে দরকার বিপুল তেল এবং লোহা। তৈরি করা হয়েছে হাজার হাজার রণতরী, হেলিকপ্টার, অস্ত্র, বোমা, ফার্মাসিটিক্যালস্ ইত্যাদি দরকারী জিনিস। মস্ত ব্যবসা আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে হলে চাই দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ। আসলে যুদ্ধই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা।’

বলে চলেছে ম্যাকিন:

‘খেয়াল করুন, কীভাবে ঠেকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে ইসলামি জঙ্গীবাদ। গত দশ বছরে আফগানিস্তানের পাহাড়ে কমপক্ষে বিশ হাজার বোমা ফেলেছে ইউএসএ। ফলে কী হয়েছে? কোনও সেতু, সাপ্লাই রুট, বা মিলিটারি নার্ভ সেন্টার বিনষ্ট হয়নি। কিন্তু যখনই ফেলা হয়েছে বিশ হাজার বোমা, তখনই নতুন বোমার চাহিদা তৈরি হয়েছে। তার মানেই, আমেরিকার সরকার কিনতে বাধ্য হয়েছে নতুন বোমা। আফগানিস্তানের পর কী হলো? অবাক কাণ্ড, খুঁজে পাওয়া গেল নতুন যুদ্ধক্ষেত্র। এবার আবারও ইরাক।’

পর্দায় ভেসে উঠেছে আরেকটা কাট:

‘এসব ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ক্ষমতা বা প্রভাবকে ছোট করে দেখবেন না। তারাই জন্ম দেয় প্রেসিডেন্টদেরকে। আবার

তারাই ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেয় পছন্দ না হলে। বিল ক্লিণ্টনের ইমপিচমেন্ট থেকে শুরু করে প্রাক্তন কেজিবি এজেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনকে রাশার ক্ষমতায় পৌঁছে দেয়া— এসবই করেছে ম্যাজেস্টিক-১২। তারাই ঠিক করেছে এরপর ক্ষমতায় কে বসবে, এবং কতক্ষণ থাকবে। এরা সরাসরি প্রেসিডেন্টদের ক্যাম্পেইনে টাকা লগ্নি করেনি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিতে পারে।

‘ম্যাজেস্টিক-১২ যোগাযোগ রেখেছে দুনিয়ার সেরা সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কর্তাদের সঙ্গে। প্রাক্তন সিআইএ-র ডিরেক্টর ছিলেন ফ্রান্সিস ওলিফ্যান্টের ব্যবসায়ীক পার্টনার। এমআই-৬-এর প্রধান ওয়েঙ্কেল রোচের শালা। ডেমিয়েন ডগলাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে ডিজিএসই-র ডিরেক্টর।

‘আসলে,’ হাসল মৃত ডেনিস ই. ম্যাকিন, ‘কোনও দেশের বড় নেতাদের নাড়ির খবর বেশি জানবে কারা? সন্দেহ কী ওই দেশেরই ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস!’

টিভির পর্দায় গম্ভীর হয়ে গেল ম্যাকিন।

‘ম্যাজেস্টিক-১২ বিশ্বের সবকিছুর চেয়ে ঢের বেশি ভালবাসে বড় ধরনের যুদ্ধকে। আসলে এসব যুদ্ধই অকল্পনীয় বড়লোক করে তুলেছে তাদেরকে। আর যে যুদ্ধ বাধেইনি, সেই না-লড়াই করা যুদ্ধে, অর্থাৎ ইউএস ও সোভিয়েতদের কোন্ড ওঅরের ফলে অন্যসব বড়লোকের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে এরা।

‘পরবর্তীতে ডেয়ার্ট স্টর্ম, বসনিয়া, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক যুদ্ধ... কিন্তু এরা সোনার খনি পেয়েছিল কোন্ড ওঅরের সময়। তখনই আর্মস্ রেস শুরু করে আমেরিকা ও রাশা, ফলে প্রচলনভাবে লড়াই বাধে দুই দেশের। লাখ লাখ মানুষ মরতে থাকে কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধে। আর ওই কোন্ড ওঅরের

সুবিধা নিয়ে হাজার হাজার কোটি ডলার মুনাফা করে
ম্যাজেস্টিক-১২।

‘কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে। উনিশ শ’ একানব্বুই সালে
সর্বনাশ হলো তাদের। পতন হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের।

‘ফাটল-ধরা বাঁধের মত ভেঙে পড়ল বার্লিন প্রাচীর। সাধারণ
আমেরিকান ভোক্তাদের মনে হলো, উপভোগ করা উচিত
জীবনটা। তাদের মত করেই নানা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে
লাগল দুনিয়ার আর সব দেশের মানুষ। এতে খুবই উপকৃত হলো
সাধারণ ব্যবসায়ীরা। তারা মস্ত বড়লোকদের তালিকায় জায়গা
করে নিতে লাগল। বিশ্বের নানাদিকে ছড়িয়ে গেল তাদের পণ্য।
এর ফলে দুনিয়া-সেরা ধনীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আমেরিকার
মিলিটারি ম্যানুফ্যাকচাররা বুঝল, তারা হারাতে শুরু করেছে
ব্যবসা। তাদের চেয়ে অনেক বেশি মুনাফা করতে লাগল খুচরা
পণ্যের ব্যবসায়ীরা। নাইকি, কোকা-কোলা, মাইক্রোসফট... বা
ইউরোপিয়ান কোম্পানি বিএমডাব্লিউ বা লরেল... তারাই বাজার
দখল করতে লাগল।

‘কাজেই মহাচিন্তিত হয়ে উঠল ম্যাজেস্টিক-১২-র সদস্যরা।
বুঝে গেল, যেভাবে হোক নতুন করে ফিরে পেতে হবে নিজেদের
সাম্রাজ্য।’

সামনের ফাইল থেকে আরেকটা ডকুমেন্ট নিল ম্যাকিন। ওটা
তুলে ধরল ক্যামেরার দিকে।

‘...এটা নতুন এক কোল্ড ওয়ারের খসড়া।’

হাতের উপর চোখ নামিয়ে আর্নল খবির, ওই ডকুমেন্ট এখন
ওর হাতেই।

দ্রুত পড়তে শুরু করল খবির।

ওখানে লেখা:

সোর্স শিপ ডেলিভারি সিস্টেম ডাব্লিউএইচ অরিজিন টার্গেট টাইম

লোটাস

শাহাব-এস টিএনএবি

৫৬০১.০১ ০০০০১.৬৪

৫০০০২.০০ ৫২৩১.০০

১১.৪৫

সেইম

৩৫৭০১.২০ ০৪২১-০১

৫০০২.০০ ৪৯০০.২৪

১১.৪৫

সেইম

৩৫৭০১-২০ ১২৩১৩-১৫

৫০০০২ ৫৩৫৮.৭৪

১১.৪৫

কর্পোরেশন

সেইম

২৮৭৪৪-০৫ ২৬৭৪৩-১৭

৪১০৫-৫৪ ৪১০৩.৬৪

১২.০০

সেইম

২৭৭৪৩-০৪ ২৬২৪১-০৪

৪১০৫-৫এস ৩৬৩৬-৬০

১২.০০

বাউন্টি হান্টার্স-২

৪৫

রুবল

টোপ'ও-ডং-২ এন-৮ এনএফএল

৩২২২২-বিও ২৩২২২-৬৯

৩৭৪৪-৭৬ ৩৭৪৫-৬৫

১২.১৫

সেইম

২৩২২২-৬৩ ২৪২৩০-৫০

৩৭৩৪-৭৫ ৩৪৩৩-০২

১২.১৫

সেইম

২৩১৫৭-০৬ ২৩১৫৬.৫০

৩৭৪৫-৭৪ ৪১৩১-৫১

১২.১৫

হোপ

সেইম

১১১০০-০১ ১১৬২২১.৬০

২৩২৭-০১ ৪০০১-০০

১২.১৫

সেইম

১১১০০-০১ ১১৪৪৫-৭০

২৩২৮-০০ ২২৪৩-২৮

১২.৩০

ডলফিন

শাহাব-এস টিএনএবি

০৭৭২৫-০৫ ২৩২৭-০১

২৩২৭.০১ ২৯৫৮.০৬

১২.৪৫

সেইম

০৭০৪০.৪৪ ০৭৩৩২-৬১

২৩২৭-০০ ৩২৩০-৫১

১২.৪৫

.....
একের পর এক নাম ও সংখ্যা দেখছে খবির। প্রথমে আগামাথা
কিছুই বুঝল না। কিন্তু ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠল। চিনে
ফেলল দুটো নাম:

শাহাব-৫ এবং টেপ'ও-ডং-২।

দুই দেশের বিখ্যাত দুই লং-রেঞ্জ ইন্টারকন্টিনেন্টাল
ব্যালিস্টিক মিসাইল।

শাহাব-৫ তৈরি করেছে ইরান। এবং উত্তর কোরিয়া তৈরি
করেছে টেপ'ও-ডং-২।

একবার আল-কায়েদা বা গ্লোবাল জিহাদের মত সন্ত্রাসী
সংগঠন নিউক্লিয়ার বোমাবাহী মিসাইল পেলে প্রথমেই
পশ্চিমাদের বড় সব শহরে ফেলবে। ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর।
পাল্টা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পশ্চিমারা তাদের আণবিক
বোমাবাহী মিসাইল ফেলবে এশিয়ার ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর
রাজধানীর উপর।

সন্ত্রাসীরা এসব মিসাইলে নিউক্লিয়ার বোমা রেখেছে।

টিএন-এবি বা এনএফএল।

বাউন্টি হান্টার্স-২

৪৭

নোটেশনের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, টিএন-৭বি ও এন-৮ নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড।

টিএন-৭বি ফরাসীদের আণবিক ওয়ারহেড।

উত্তর কোরিয়ার আণবিক ওয়ারহেড এন-৮।

বাংলাদেশ আর্মির কমিশনও অফিসার পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য কিছুদিন পর পরীক্ষা দেবে খবির, কাজেই নানা অস্ত্র ও বোমা বিষয়ে লেখাপড়া করছে, নইলে ওর মাথার উপর দিয়ে যেত এসব।

অন্য চিন্তা এল ওর মনে।

এই তালিকা কোনও সন্ত্রাসী সংগঠনের নয়।

এটা তৈরি করেছে ম্যাজেস্টিক-১২।

তখনই চক্রর দিয়ে উঠল খবিরের মাথা।

এমন কী হতে পারে, গোপনে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের নাম ভাঙিয়ে দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে চাইছে ম্যাজেস্টিক-১২?

চট করে পয় বাটন টিপে আগের চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল ম্যাকিনের কথা।

বলে চলেছে ইজরায়েলি এজেন্ট:

‘নতুন এক শীতল লড়াই শুরু হয়েছে টেরোরিয়মের বিরুদ্ধে।

‘আর ইউএস-এর দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ তৈরি করতে চাইছে ম্যাজেস্টিক-১২। ওই দুই প্রজেক্ট: “লিয়ার্ড” এবং “নোয়া’য শিপ”। নোয়া’য শিপগুলো আসলে লঞ্চ ভেসেল। কেউ বুঝবে না ওগুলো কন্টেইনার শিপ বা সুপারট্যাঙ্কার নয়। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি ছদ্মবেশী মিসাইল লঞ্চিং রণতরী। সুপারট্যাঙ্কারগুলো তৈরি করেছে ওয়েগেল রোচের শিপিং গ্রুপ। এদিকে এসব জাহাজের মিসাইল লঞ্চ

সিস্টেম তৈরি করেছে ভার্জিনিয়ার নরফোক ও গুয়ামের ড্রাগন কর্পোরেশনের প্লান্টগুলো। স্বাভাবিক চেহারার সুপারট্যাঙ্কার ও কন্টেইনার শিপ— দুনিয়ার যে-কোনও সাধারণ বন্দরে অপেক্ষা করবে। কারও নজর পড়বে না ওগুলোর উপর। ইউএস সরকার এই প্রজেক্টের নাম দিয়েছে: নোয়া'য শিপ।

‘এদিকে লিয়ার্ড প্রজেক্ট আরও ভয়ঙ্কর। আগে কখনও ইউনাইটেড স্টেটস এত বিপজ্জনক প্রজেক্ট হাতে নেয়নি। কাজ করা হয়েছে ‘মিসাইলগুলোর ভিতর। আপনারা আগেই জেনেছেন, ডকুমেন্টের ওই মিসাইলগুলো আসলে সম্পূর্ণ শাহাব বা টেপ’ও-ডং নয়।

‘ওগুলো আসলে ইউএস-এর তৈরি ক্রোন মিসাইল। নিশ্চয়ই জানেন, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি মিসাইলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রতিটির ব্যক্তিগত চলনবলন আলাদা। ফ্লাইট সিগনেচার, কন্ট্রোল ওয়েক ইত্যাদি। এমন কী আঘাত হানবার পরেও সেসব বৈশিষ্ট্য রয়ে যায়। আর এটাই এক্সপ্লয়েট করবে লিয়ার্ড প্রজেক্ট। ইউএস-এর সবচেয়ে কালো প্রজেক্ট ওটি। সরকার নিজেই তৈরি করেছে নকল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল। এবং এসব মিসাইলের বৈশিষ্ট্য হবে অন্য কোনও দেশের মিসাইলের মত।

‘ক্রোন মিসাইল।

‘কিন্তু লিয়ার্ড প্রজেক্ট শুধু ইরানিয়ান শাহাব বা উত্তর কোরিয়ার টেপ’ও-ডং-এ সীমাবদ্ধ নেই। ভারতীয় অগ্নি-২, পাকিস্তানী ঘোরি-২, তাইওয়ানিজ স্কাই হর্স, ইউকের ট্রাইডেন্ট-১১ ডি-৫, ফ্রেঞ্চ এম-৫, ইজরায়েলি জেরিকো ২বি এবং রাশান এসএস-১৮ মিসাইলকে অনুকরণ করে তৈরি করা হয়েছে ইউএস-এর এসব মিসাইল।

‘এগুলো নানামুখী যুদ্ধ সৃষ্টির জন্যে। আক্রান্ত দেশ ভাববে

অমুক দেশ হামলা করেছে তাদের উপর। অর্থাৎ ইউএসএ কোনও দেশের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চাইলে নকল কোনও মিসাইল ফেলবে। দোষ হবে অন্য দেশের।

‘লিয়ার্ড প্রজেক্টের পুরো দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল ড্রাগন কর্পোরেশনকে। আর নকল সুপারট্যাঙ্কার ও কন্টেইনার শিপগুলো তৈরি করেছে ওয়েওল রোচের কর্পোরেশন। এবং সেকারণেই দুনিয়া জুড়ে ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটতে পারে। দুই প্রজেক্টের দুই কন্ট্রোলার কোম্পানিরই মালিক এম-১২-র সদস্যরা।

‘এবং অক্টোবরের পনেরো তারিখে সকাল পৌনে বারোটার সময় বৃষ্টির মত পড়বে নিউক্লিয়ার মিসাইল। আগে কখনও এমন দেখেনি মানুষ। সব কোঅর্ডিনেট করা। নিখুঁত। পনেরো মিনিটের ব্যবধানে একের পর এক মিসাইল পড়বে। গোটা দুনিয়ার মিডিয়া একটা খবর জানাতে না জানাতেই নতুন মিসাইল হিটের খবর আসতে থাকবে। দুনিয়ার মস্ত সব শহর ধ্বংসস্তুপ হবে। লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন... ভয়ঙ্কর গোলমাল বাধবে। আতঙ্কিত হয়ে উঠবে সবাই। ভাবতে থাকবে: এর পর না জানি কোন্ শহর ধ্বংস হবে!

‘আর মিসাইলের বৃষ্টি শেষ হলে, তদন্তকারী অফিসাররা বুঝতে শুরু করবে মিসাইলগুলোর ক্যারেকটারিস্টিক ও ব্লাস্ট সিগনেচার। সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখে বোঝা যাবে, এসব মিসাইল ছিল ইরান ও উত্তর কোরিয়ার।

‘টেরোরিস্ট দেশের মিসাইল।

‘ঘৃণা ভরে ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে পরিত্যাগ করবে বেশিরভাগ দেশ। আর স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জনগণ আতঙ্ক কাটিয়ে খেপে উঠবে। ফলাফল: জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে তুমুলভাবে নামবে শক্তিশালী দেশগুলো। গত কয়েক বছর ধরেই

ওই লড়াই চলছে। এবং কমপক্ষে আগামী পঞ্চাশ বছর চলবে
ভয়ঙ্কর লড়াই। শুরু হবে নতুন কোন্ড ওঅর। ব্যস্ত হয়ে উঠবে
মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সগুলো। আগে কখনও এত অস্ত্র
লাগেনি কোনও দেশের। এবং নানাধরনের অস্ত্র তৈরির মাধ্যমে
ম্যাজেস্টিক-১২ শত-সহস্র বিলিয়ন ডলার মুনাফা করবে।’

খবিরের মনে হলো, ঘুরছে ওর মাথা।

এসব কী শুনছে ও?

ছদ্মবেশী সুপারট্যাঙ্কার। ক্রোন মিসাইল।

সবই তৈরি করেছে আমেরিকান সরকার।

প্রয়োজনে সর্বনাশ করে দেবে যে-কোনও দেশের।

নকল মিসাইল ফেলে দুই দেশের ভিতর যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।

আপাতত এসব হয়তো করবে না আমেরিকান সরকার, কিন্তু
ক্রোন মিসাইল প্রস্তুতকারীরা বা ম্যাজেস্টিক-১২-র সদস্যরা
তাদের প্রয়োজনে এখনই নতুন কোনও যুদ্ধ বাধাতে চাইছে।

নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন...

ক্ষতিগ্রস্ত এসব দেশের সেনাবাহিনী ছাড়বে কেন, তারাও
পাল্টা হামলা করবে শত্রুদেশে। মরবে কোটি কোটি মানুষ।

আবারও তালিকায় মনোযোগ দিল খবির।

সংখ্যাগুলো কো-অর্ডিনেটস্।

দু’ধরনের কো-অর্ডিনেটস্। লক্ষ করা হবে জাহাজ থেকে।
আর পড়বে গিয়ে নির্দেশিত শহরে।

এবার নোয়া’য শিপ প্রজেক্টের সুপারট্যাঙ্কারগুলোর নাম
পড়ল খবির। লোটারাস, কর্পোরেশন, রুবল, হোপ এবং ডলফিন।
এসব জাহাজ ব্যবহার করে নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করতে চাইছে
ম্যাজেস্টিক-১২।

খবির ভাবল, এসবের সঙ্গে মাসুদ স্যর বা অন্য কয়েকজনের
সম্পর্ক কী?

তাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে কেন?
কীসের জন্য বাউন্টি হান্ট?
আগামীকাল দুপুরের আগেই কেন তাদেরকে শেষ করতে হবে?

ম্যাকিনের একটা কথা মনে পড়ল ওর।

কুইন্স টাওয়ারের ছাতে বৃষ্টির ভিতর লোকটা বলেছিল:

‘সবই রিফ্লেক্সের ব্যাপার। বলতে পারেন সুপারফাস্ট রিফ্লেক্স। ওই তালিকার নয়জন দুনিয়া সেরা। অনায়াসে পাশ করবে সি স্নেক টেস্ট। এরা ডিসআর্ম করতে পারবে টাচলক-৯। আর ওটাই হচ্ছে ম্যাজেস্টিক-১২-র পরিকল্পনা। ওই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হলে আগে ওই লোকগুলোকে শেষ করতে হবে...’

টাচলক-৯ মিসাইল সিকিউরিটি সিস্টেম।

হ্যাঁ, ওটাই ম্যাজেস্টিক-১২-র মূল পরিকল্পনা।

টাচলক-৯... ভাবছে খবির।

সামনে পড়ে থাকা ফোন্ডারগুলো ঘাঁটতে শুরু করেছে।

খুঁজছে টাচলক-৯ বিষয়ে তথ্য।

বেশিক্ষণ লাগল না ফাইলটা পেতে।

বড় করে মলাটে লেখা:

ড্রাগন কর্পোরেশন— পেটেণ্টেড টাচলক
সিকিউরিটি সিস্টেম

ডকুমেন্টগুলো ড্রাগন কর্পোরেশন এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অভ
ডিফেন্সের। প্রথম ডকুমেন্টের মলাটে লেখা:

টপ সিক্রেট

খবির মলাট সরিয়ে প্রথম পাতার প্যারাগ্রাফে চোখ বোলাল।

ডিসআর্ম সিস্টেম—টাচলক-৯

এ ধরনের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অস্ত্রের বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। লিয়ার্ড সিরিজের মিসাইলে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ড্রাগন কর্পোরেশনের পেটেন্টেড টাচলক-৯ ডিসআর্ম সিস্টেম। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে নিরাপদ অ্যান্টি-ট্যামপার মেকানিয়ম এটি। অভিনব তিনটি নিরাপত্তামূলক প্রোটোকল ব্যবহার করবে টাচলক-৯। একইসময়ে তিনটি নির্দিষ্ট সিকিউয়েন্স ব্যবহৃত না হলে প্রোটোকল অনুযায়ী সিস্টেম (বা ডি-অ্যাকটিভেশন) চালু করা সম্ভব হবে না। এই সিস্টেমের মূল কাজ সমাধা করবে দ্বিতীয় প্রোটোকল। এটি প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্ন-রেকগনিশন প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি (হেনেস অ্যাণ্ড সিম্পসন, এমআইটি ১৯৯৪, ১৯৯৭, ২০০১), ফলে এ সিস্টেম কারও চেনা থাকলে, এবং প্রচুর প্র্যাকটিস থাকলে, শুধু তখনই চাহিদা অনুযায়ী কেউ সিকিউয়েন্স প্যাটার্ন পূরণ করতে পারবে। এই সিস্টেম কারও অচেনা হলে, এবং তার মোটর-নিউরাল রিফ্লেক্স অস্বাভাবিক দ্রুত না হলে কেউ-ই এই সিস্টেমকে বশ করতে পারবে না (ওপি.

সিইটি. জেফ ওয়াকার এবং ফ্রেড বেইস,
ইউএসএএমআরএমসি, ন্যাটো এমএনআর-
আর স্টাডি)।

এসব প্রিন্সিপাল অনুযায়ী, ফিল্ড টেস্ট-এ দেখা
গেছে, কর্তৃপক্ষ নয় এমন কেউ টাচলক-৯
ব্যবহার করতে চাইলে এই সিস্টেম থাকে
প্রায় ৯৯.৯৫% নিরাপদ। অন্য যে-কোনও
মিলিটারি সিকিউরিটি সিস্টেম ব্যবহারে এতটা
সাফল্য পাওয়া যায়নি।

প্রোটোকল সমূহ:

টাচলক-৯ ইউনিটের তিনটি প্রোটোকল:

১। প্রক্সিমিটি: কর্তৃপক্ষ নয় এমন কেউ
টাচলক-৯ ইউনিট আর্মিং/ডিসআর্মিং করতে
চাইতে পারে, কাজেই এই ইউনিট ডেলিভারি
সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়নি। প্রথম
প্রোটোকল ডেলিভারি সিস্টেমের প্রক্সিমিটি।
লিয়ার্ড মিসাইলের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের
ষাট (৬০) ফুট দূর থেকে চালু করা সম্ভব হবে
টাচলক-৯।

২। লাইট-সেন্সার রেসপন্স ইউনিট: একবার
ষাট ফুটের ভিতর ওই ইউনিট নিয়ে গেলে,
তখনই শুধু ওয়ায়ারলেস মডেমের মাধ্যমে
ডিসআর্ম সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করা
সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে ড্রাগন কর্পোরেশনের
অত্যাধুনিক লাইট-সেন্সার ইন্টারফেস কাজ

শুরু করবে। এ ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী জরুরি দায়িত্ব পালন করবে প্যাটার্ন রিকগনিশন সিস্টেম। (দেখুন ন্যাটো এমএনআরআর রিসার্চ প্রোগ্রাম রেজাল্ট, ইউএসএএমআর-এমসি।)

৩। সিকিউরিটি কোড: ডিসআর্ম বা ওভাররিড কোড বন্ধ করতে হলে এন্ট্রি ব্যবহার করতে হবে।

শেষ লাইনে হাতে লিখেছে ডেনিস ই. ম্যাকিন:

‘ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড নির্দিষ্ট করা হয়েছে জেনারেল রেমণ্ড কে. গ্র্যাঞ্জারের মাধ্যমে। নতুন তথ্য অনুযায়ী ওই মার্সেন প্রাইম সংখ্যা এখনও জানা সম্ভব হয়নি।’

প্রোটোকল সেকশনে সংযুক্ত করা হয়েছে আরেকটি পৃষ্ঠা। ওটা মাসাদের ইন্টারসেপ্ট করা টেলিফোন ট্রান্সক্রিপ্ট:

ট্রান্স লগ: বি-২-৩০০২-৮৭৯

ডেট: ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৫১৬ অ্যাওয়ার্স ই.এস.টি.

রেক ফ্রম: ড্রাগন কর্পো, বরফোক, ভিএ, ইউএসএ

কাটসা: ডেনিস ই. ম্যাকিন (৪৪৩-৭৬০২) -

ভয়েস ওয়ান (জেংকিস, আর.জে. ড্রাগন চিফ
অভ ইঞ্জিনিয়ারিং): 'স্যর, ডি.ও.ডি
ইন্সপেকশন রিপোর্ট ভাল। আমাদের অগ্রগতি
দেখে তারা খুবই খুশি। বিশেষ প্রশংসা
করেছে টাচলক-৯ পরীক্ষা করে। যিশু, এরা
যেন নতুন খেলনা পাওয়া বাচ্চা হয়ে
উঠেছিল। বারবার কোড ভাঙতে চেয়েছে।'

ভয়েস টু (ডেমিয়েন ডগলাস, ড্রাগন
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও সিইও): 'খুবই
খুশি হলাম, জেংকিস। এক্সেলেন্ট। আর
কিছু?'

ভয়েস ওয়ান (জেংকিস): 'এরা জানতে
চেয়েছে পরেরবার কখন ইন্সপেকশন করবে।
ডি.ও.ডি. পরবর্তী তারিখ চাইছে।'

ভয়েস টু (ডেমিয়েন ডগলাস): 'অক্টোবর
মাসের পনেরো তারিখ হলে কেমন হয়?
আমাদের প্রজেক্টের কয়েকজন পার্টনার সময়টা
পেলে খুশি হবে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল খবির।

তার মানে কোনও কারণে ওই তারিখকে নির্ধারণ করা
হয়েছে।

অক্টোবরের পনেরো।

অর্থাৎ আগামীকাল।

ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্সের ইন্সপেক্টররা হাজির হবে
ডেমিয়েন ডগলাসের ইন্সটলেশন প্লান্টে।

পরের ডকুমেন্ট পড়তে শুরু করেছে খবির। এবং ঠিক তখন
হঠাৎ করেই বুঝল, কেন শুরু হয়েছে বাউন্টি হান্ট।

সব ডকুমেন্টের ভিতর এই সামান্য নথি কিছুই নয়।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ওটা ড্রাগন কর্পোরেশনের একটি ইন্টারনাল ই-মেইল:

ফ্রম: আর.জে.

টু: অল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ, প্রজেক্ট সি-০৫১

ডেট: অক্টোবর ১, ৮:৪৫ পি.এম.

সাবজেক্ট: নেক্সট ডি.ও.ডি. ইন্সপেকশন

লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনাদেরকে
জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। আমাদের ছয়মাসের
পরিশ্রম পণ্ড হয়নি। খুব ভালভাবেই শেষ
হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স কমিটির
ইন্সপেকশন। আপনারা প্রচণ্ড পরিশ্রম
করেছেন, তাই সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

ডি.ও.ডি.-র তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন আমাদের
অগ্রগতি দেখে। হতবাক হয়েছেন আমাদের
টেকনোলজিকাল উন্নতি দেখে।

এবং বহু সাধনার পর শেষ হয়ে এসেছে

আমাদের কাজ। অক্টোবরের ১৫ তারিখে
নরফোক ইন্সটলেশন প্লান্টে শেষ ইন্সপেকশনের
জন্য দুপুর বারোটোর সময় জড় হব আমরা।
অবশ্য সবাইকে জায়গা করে দেয়া সম্ভব নয়।
আপনাদের পক্ষ থেকে হাজির হবেন প্রতিটি
ডিপার্টমেন্টের প্রধান। এ ইন্সপেকশনের এক
সপ্তাহ আগে থেকেই কঠোর সিকিউরিটি
ক্লিয়ারেন্সের ভিতর দিয়ে যেতে হবে।

আর.জে.

টনক নড়ে গেছে খবিরের।

আগামীকাল অক্টোবরের ১৫।

ড্রাগন কর্পোরেশনের ভার্জিনিয়ার নরফোক-এ মিসাইল
নির্মাণ ফ্যাসিলিটিতে ইন্সপেকশনে যাবে আমেরিকার নিরাপত্তা
বিভাগের অফিসাররা।

তখনই টের পাবে, ওই প্লান্টে কিছু বদলে গেছে। পাল্টে
নেয়া হয়েছে কিছু মিসাইল। বা কিছু মিসাইল কম থাকবে। বা
আরও কিছু। তখনই আমেরিকার সরকার খুঁজতে বাধ্য হবে
মাসুদ স্যরকে। কারণ গোটা দুনিয়ায় তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি
টাচলক সিস্টেম ডিসআর্ম করতে পারেন।

এমন মানুষ, যার রিফ্লেক্স টাইফুনের মত।

ওই তালিকা। ওখানে স্যরের মত আরও কয়েকজন আছে।

আরেকটা চিন্তা ঢুকেছে খবিরের মগজে। যে কারণেই হোক,
ডেমিয়েন ডগলাস এবং ম্যাজেস্টিক-১২ চাইছে আমেরিকার
সরকার আগামীকাল ইন্সপেকশন করুক। কারণটা কী, বুঝতে
পারছে না ও। কিন্তু ওই লোকগুলোর পরিকল্পনার একটা অংশ
ওই ইন্সপেকশন।

আরেকটি বিষয় আরও পরিষ্কারভাবে বুঝল খবির।

ওই বাউন্টি হান্ট বোধহয় সতর্ক করে দেয়ার জন্য। এম-১২ সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সঙ্গে লাগতে এসো না।

এখন ওসব বাদ যাক।

আগামীকাল দুপুর বারোটোর আগেই আমেরিকার সরকার হাড়ে হাড়ে টের পাবে, মস্ত কোনও গোলমাল আছে ড্রাগন কর্পোরেশনের নরফোক প্লান্টে। লিয়ার্ড মিসাইল বদলে গেছে। বা উল্টোপাল্টা করছে নোয়া'য লঞ্চ শিপগুলো। আর ওই পরিবর্তন ম্যাজেস্টিক-১২ কাউন্সিলের প্রয়োজন। নইলে হয়তো শুরুই হবে না নতুন কোল্ড ওয়ার।

‘আমাদের দ্রুতগতি বিমান লাগবে,’ গম্ভীর সুরে বলল খবির। ঘুরে চাইল চার্লস ডেলাক্রুসের দিকে। ‘আপনাদের দেশের নিরাপত্তা বিভাগে যোগাযোগ করুন। বলবেন, যেন আগেই শুরু হয় নোয়া'য-লিয়ার্ড ইন্সপেকশন। গুয়ামের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সতর্ক করুন। তদন্ত করা হোক ড্রাগন কর্পোরেশনের সব প্লান্টে।’

‘তাই করা হবে,’ কথা দিল ডেলাক্রুস।

নানান সংখ্যার লঞ্চ লিস্ট আবারও দেখল খবির। ওখানে রয়েছে লঞ্চ সাইটের জিপিএস কো-অর্ডিনেটস্ এবং টার্গেট। ‘খুঁজে বের করুন কোথা থেকে এসব মিসাইল উৎক্ষেপ করবে। আর ওগুলো পড়বেই বা কোথায়।’

নিজেই দেরি না করে সামনের কমপিউটারে জিপিএস প্লটিং প্রোগ্রাম চালু করল খবির। স্যাটালাইট রেডিয়োতে বলল, ‘স্যর! আমি খবির! ভয়ঙ্কর খারাপ খবর আছে...’

চার

ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়নের কাছেই।

ব্রিটানির উপকূল, দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্স।

অক্টোবরের, ১৪।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

একটু আগে কুয়াশা ও তিশার ট্রাকের সামনে ঝুলছিল 'ড্রাগন কর্পো' লেখা কন্টার। এখন দুই বন্দিকে নিয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। ওই কন্টার ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়নে ফিরিয়ে নিচ্ছে কুয়াশা ও আহত তিশাকে।

পাহাড়ের পায়ের কাছে সাগরের গভীর অংশে ভাসছে একজন। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওই কন্টারের দিকে।

মাসুদ রানা।

জ্বলন্ত ম্যাগ রিগ রাস্তা ছাড়তেই গিয়ে লাগল ভাসমান মিরাজ ফাইটারের নাকে, কিন্তু তখন ওখানে ছিল না রানা।

রাস্তা থেকে ট্রাকের চাকা সরতেই ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে বাঁপিয়ে পড়েছে। মুহূর্তের জন্য ওর মাথার উপর দিয়ে গেছে ট্রাক।

তারপর ফাইটারে গিয়ে লাগল ইয়াজদাহা রিগ।

তখনই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো।

আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে।

চারপাশে ছিটকে গেল ভাঙাচোরা, পোড়া ধাতব টুকরো।

ওই বিস্ফোরণের তিরিশ ফুট নীচেই ছিল রানা। সাঁই-সাঁই করে পড়ছে, আর তখনই দেখল, উপরে কমলা আগুনের গোলা। তিশা বা কুয়াশা ওর পতন দেখেনি। ট্রাক থেকে খসে পড়বার সময় নিজেকে সত্যিকারের বুলেট মনে হয়েছে রানার।

প্রথমে ভেবেছিল ম্যাকলুক ব্যবহার করবে।

পরক্ষণে মনে পড়ল, ওটার প্রপেল্যান্ট শেষ।

পড়তে লাগল ও, কিন্তু তখনও ট্রাকের গতিবেগের কারণে একপাশে ছিটকে যাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর। গতি প্রচণ্ড। নীচে দেখল সাগরের অসংখ্য ঢেউ। তীরের মত উঠে আসছে সব। এত উপর থেকে সাগরে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ফেটে চুরচুর হবে দেহ। ম্যাপারটা অনেক উপর থেকে টমেটো ছেড়ে দেয়ার মতই।

কিছু তো করো! নিজেকে ধমক দিয়েছে রানা।

মন উল্টো বলল: গাধা! আমি আবার কী করব!

তখনই মনে পড়ল ওর...

বুকের ওয়েবিঙের রিপকর্ডে হ্যাঁচকা টান দিল ও।

ওই রিপকর্ড ছিল পিঠে ঝুলে থাকা অ্যাটাক প্যারাসুটের। হারকিউলিস বিমানে উঠবার পর থেকেই ওটা সঙ্গে ছিল। জিনিসটা এতই চ্যাপ্টা, ভুলেই গিয়েছিল ওটার অস্তিত্ব।

ফটাশ্ আওয়াজ তুলে মাথার উপর ছাতার মত খুলে গেল অ্যাটাক প্যারাসুট, তখনও আশি ফুট নীচে সাগর।

প্যারাসুট পুরোপুরি মন্তুর করল না রানার পতন।

তবে নিরাপদেই নামল সাগরে। ঝপাস্ করে পড়েই তলিয়ে গেল। পরের কয়েক সেকেণ্ডে খুলে ফেলল প্যারাসুটের দড়ি-দড়া। নেমে চলেছে নীল পানির ভিতর। চল্লিশ ফুট উপরে বিস্ফোরিত হয়েছে পানি। মস্ত সব বুদ্ধদ তৈরি হলো।

‘আগেই প্রাণপণে সরতে শুরু করেছে রানা।

কয়েক মুহূর্ত পর নেমে এল ভারী ম্যাক রিগ ও ভাঙা মিরাজের কাঠামো। ধাতব অংশগুলো তখনও আগুনের মত গরম, ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ তুলছে। রানাকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল অনেক গভীরে। তার আগেই নিভে গেছে সব জ্বালা।

পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পর পাহাড়ের সামান্য দূরে ভেসে উঠল রানা। দেখল, সাগরের একটা জায়গা জুড়ে ফাইটার বিমানের অংশ এবং তেল জ্বলছে।

সাবধানে নিজেকে লুকিয়ে রাখল রানা, নানা আবর্জনার ভিতর ভাসছে। দুই মিনিট পর দেখল, পাহাড়ের মাথা উপকে ফিরতি পথ ধরেছে কপ্টার, চলেছে দুর্গের দিকে।

তিশা আর কুয়াশা পালাতে পেরেছে? ভাবল রানা, নাকি বন্দি ওরা কপ্টারের ভেতর?

‘তিশা!’ প্রায় ফিসফিস করে থোট মাইকে বলল রানা। ‘আমি বেঁচে আছি। তুমি কোথায়?’

জবাবে মৃদু কাশি শুনল রানা। ওদের পুরনো কৌশল। আপাতত কথা বলতে পারবে না তিশা। ওকে বন্দি করা হয়েছে।

‘একের জন্য হ্যাঁ, দুইয়ের জন্য না— তুমি কি একটু আগে দেখা ড্রাগন কর্পোরেশনের কপ্টারে?’

খুক করে কাশির আওয়াজ এল।

‘তুমি কি ভয়ঙ্করভাবে আহত?’

কাশির আওয়াজ।

‘সত্যি গুরুতর আহত?’

অস্পষ্ট দু’বার কাশি।

কাঠের মত শুকিয়ে গেল রানার গলা।

‘তোমার সঙ্গে কুয়াশা আছেন?’

ছোট্ট কাশি।

‘ওরা কি তোমাদেরকে দুর্গে নিয়ে যাচ্ছে?’

মৃদু কাশি।

‘ওখানে অপেক্ষা করবে, আমি পৌঁছে যাব।’

তীরের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করবে, তার আগে চারপাশ দেখে নিতে চাইল রানা। ধক করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। মাত্র দু’ শ’ গজ দূরে এসে থেমেছে ফ্রেঞ্চ ডেস্ট্রয়ার।

এইমাত্র একদিকের ডেক থেকে সাগরে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে ছোট প্যাট্রল বোট। ওটার নিচু ডেকে কমপক্ষে বারোজন লোক।

সাগরে নামতেই বৈঠা মেরে রওনা হয়ে গেল বোট।

আসছে ঠিক ওর দিকেই।

চুপ করে ভেসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

‘নিশ্চয়ই অ্যান্টার্কটিকার ওই সাবমেরিন দুর্ঘটনার কথা ভুলে গেছে ওরা,’ মনে মনে বলল রানা। পরক্ষণে চোখ রাঙানি দিল নিজেকে। ‘তুই হলে কখনও ভুলতি, ব্যাটা?’

তখনই কানের ভিতর কথা বলে উঠল ইয়ারপিস।

‘স্যর! আমি খবির! ভয়ঙ্কর খারাপ খবর আছে!’

‘সন্দেহ কী,’ মনে মনে বলল রানা। ‘হ্যাঁ, খবির, বলো।’

‘কথা শুনতে পারবেন? সময় লাগবে।’

‘সময় সংক্ষিপ্ত।’ আটলান্টিকের ঢেউয়ের মাঝে উঠছে- নামছে রানা। ‘বলতে যখন চাও, সংক্ষেপে বলো।’ চোখ রেখেছে বোটের উপর। ওটা মাত্র দেড় শ’ গজ দূরে। ‘দুঃখের কথা, এবার পৃথিবী ত্যাগ করছি।’

‘নিশ্চয়ই যাবেন, স্যর... তওবা-তওবা! কী হয়েছে, স্যর?’

‘বাদ দাও। কী বলবে বলো।’

‘এখন জেনেছি কেন আপনাকে মেরে ফেলতে চাইছে।’

‘খবির, রেডিয়ো প্যাচ করো। তিশা আর কুয়াশাও কথাগুলো শুনুক। যদিও ওরা কথা বলতে পারবে না।’

রেডিয়ার নির্দিষ্ট বাটন টিপে নিল খবির।

সংক্ষেপে বলল সুপারট্যাঙ্কার ও লিয়ার্ড ক্রোন মিসাইলের কথা। নতুন করে কোল্ড ওয়ার তৈরি করতে চাইছে এম-১২। বড় শহরগুলোর উপর মিসাইল ফেলবে তারা। টাচলক-৯ সিস্টেম সম্পর্কে বলল, ওটা দিয়ে মিসাইল ডিসআর্ম করতে পারবে ওই তালিকার কয়েকজন। নতুন করে ইউএস ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড বসিয়েছেন জেনারেল গ্র্যাঞ্জার। ম্যাকিন বলেছে, ওটা মার্সেন প্রাইম সংখ্যা।

কথাগুলো শুনে ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। ‘মার্সেন প্রাইম... এসব সংখ্যা তো...’ ওর চোখে ভেসে উঠল জেনারেল গ্র্যাঞ্জারের ছিন্ন মাথা। ভদ্রলোককে ড্রাগ দিয়েছিল ব্রিটিশ এজেন্টরা। ঠিক কথাই বলছিলেন লিয়ার্ড প্রজেক্ট সম্পর্কে। আর নোয়া’য শিপ... দুটোই জড়িত প্রজেক্ট। জাহাজ আর মিসাইল মিলে... সব ছদ্মবেশী মারণাস্ত্র। প্রতি সপ্তাহে বদলে নেয়া হবে ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড। এ মুহূর্তে ওটা সেভেজ মার্সেন...

বিমানে ড্রাগ দেয়া জেনারেলের কথা শুনে রানা ভেবেছিল, ভদ্রলোক নেশার ভিতর আবোল-তাবোল বলছেন মার্সেনারিদের বিষয়ে।

তা নয়।

সত্যি কথাই বলছিলেন জেনারেল।

মাত্র বলতে শুরু করেছিলেন সংখ্যা।

খবির সংক্ষেপে সব বলছে, আর একইসময়ে কমপিউটারে লঞ্চ লিস্ট থেকে জিপিএস কো-অর্ডিনেটস অনুযায়ী টার্গেট কী তা খুঁজতে শুরু করেছে চার্লস ডেলাক্রুস। এক সেকেন্ড পর বলল, ‘আমি প্রথম তিনটা জাহাজের কো-অর্ডিনেটস পেয়ে গেছি। পরের লাইনের সংখ্যাগুলো টার্গেট করা শহর।’

প্রিন্টআউট বের করে খবিরের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

কাগজে হাইলাইট করা হয়েছে নির্দিষ্ট সব জায়গার নাম।

চট করে কাগজে চোখ বোলাল খবির। বলল, 'স্যর, প্রথম জাহাজ ইংলিশ চ্যানেলে। শারবার্গের কাছে। একটু দূরে নরম্যাণ্ডি সৈকত। ওই জাহাজ থেকে লণ্ডন, প্যারিস ও বার্লিনের উপর মিসাইল ফেলা হবে। পরের দুই জাহাজ থেকে মিসাইল পড়বে নিউ ইয়র্ক ও স্যান ফ্রান্সিসকোতে। প্রতিটি জাহাজ কয়েকটা করে শহর উড়িয়ে দেবে।'

চুপ করে আছে রানা।

এক শ' গজ দূরে পৌছে গেছে প্যাট্রল বোট।

'মনোযোগ দিয়ে কথা শোনো, খবির,' বলল রানা। তখনই নিচু ডেউ ছাৎ করে লাগল ওর মুখে। থু-থু করে লবণাক্ত পানি মুখ থেকে ফেলল রানা। 'এসব জাহাজের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে সাবমেরিন। যদি তলিয়েই যায় জাহাজ, একটা মিসাইলও লঞ্চ করতে পারবে না। আমেরিকানদের জানাও, নোয়া'য শিপ প্রজেক্টের প্রতিটি জাহাজের জিপিএস লোকেশন লাগবে, তারপর অ্যাটাক সাবমেরিন দিয়ে নিজেদের জাহাজ ডুবিয়ে দিক ওরা।'

আলাপে যোগ দিল ডেলাক্রুস, 'এতে কাজ হতে পারে। কিন্তু সব ট্যাঙ্কার ডোবাতে পারব না আমরা।'

'সেক্ষেত্রে জাহাজে উঠতে হবে। সাইলোর ভেতর ডিসআর্ম করতে হবে মিসাইল। গুনলাম, ডিসআর্মার হিসেবে লাইট-সিগনাল রেসপন্স ইউনিট ব্যবহার করা হবে। ইউনিটের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে ডিসআর্ম প্রোগ্রামের তথ্য। ষাট ফুটের ভেতর পৌছাতে হবে, নইলে কাজ করবে না মিসাইলের কন্ট্রোল কন্সোল। একইসময়ে সব জায়গায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। বুঝতেই পারছেন, প্রতিটি জাহাজে উঠতে হবে আপনাদের সৈনিকদের। মিসাইলের সঙ্গে আমার স্যাটালাইট কানেকশন থাকতে হবে।'

‘স্যর, প্রতিটি জাহাজে উঠতে হবে?’ জানতে চাইল খবির।

‘হ্যাঁ, খবির। সাবমেরিন জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিতে না পারলে, প্রতিটি নোয়া’য শিপেই উঠতে হবে। মিসাইলের কন্সোলের ষাট ফুটের ভিতর যেতে হবে। কন্সোলের স্যাটলাইট আপলিঙ্ক আমার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আর তখনই আমি টাচলক ইউনিট ব্যবহার করে সবক’টা মিসাইল থামিয়ে দিতে পারব।’

‘খাইছে, স্যর!’ বলল খবির। ‘তো আমি কী করব এখন?’

আরেকটা ঢেউ ডুবিয়ে দিল রানাকে। ভেসে উঠেই বলল ও, ‘আগে প্রথম তিন জাহাজ ঠেকাও। প্রথমে যাবে নিউ ইয়র্কে, খবির। আর মিস্টার ডেলাক্রুসকে বলো মানচিত্রে এসব জাহাজের অবস্থান স্থির করুন। প্রথম জাহাজ আছে ইংলিশ চ্যানেলে। ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি সৈকতগুলোর কাছেই শারবার্গ। কেভিন কনলনের সঙ্গে যোগাযোগ করো। ওকে স্যান ফ্রান্সিসকোতে পাঠাও। এমন লোক চাই, যারা এসব ট্যাঙ্কার ভাল করে চেনে। যদি বাঁচি, আমি নিজেই ইংলিশ চ্যানেলের জাহাজে উঠব। আরেকটা কথা, খবির, কেভিনের কাছে জিজ্ঞেস করবে, সেভেস্ত্র মার্সেন প্রাইম নাম্বার কী। যদি না জানে, যেন জেনে নেয়।’

‘আর শেষ কথা, আগামীকাল বারোটোর আগেই যেন ড্রাগন কর্পোরেশনের মিসাইল তৈরির কারখানায় হাজির হয় ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্সের ইন্সপেক্টররা। জানতে চাই ওখানে কী ঘটল।’

‘আগেই ওই কাজ করতে বলে দিয়েছি,’ বলল খবির।

‘গুড।’

‘আপনি এখন কী করবেন, স্যর?’

রানার মাথার পাশে এসে থেমেছে ফ্রেঞ্চ প্যাট্রল বোট। রক্তচোখে ওকে দেখছে নাবিকরা। বাগিয়ে ধরেছে ফ্যামাস

অ্যাসল্ট রাইফেল ।

‘এখনও খুন করেনি,’ নিচু স্বরে বলল রানা । ‘বোধহয় কথা বলতে চাইছে কেউ । তার মানে, এখনই মরব না । দেখা যাক কী হয় । ...আউট, রানা ।’

অস্ত্রের মুখে বোটে তুলে নেয়া হলো ভেজা বেড়ালের মত চূপসে যাওয়া মাসুদ রানাকে ।

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির হেডকোয়ার্টার ।

সাব-লেভেল থ্রি ।

পেন্টাগন ।

অক্টোবর ১৪ ।

রাত সাড়ে দশটা ।

এইমাত্র অফিসে ফিরেছে কেভিন কনলন । সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, পরনে নোংরা পোশাক । এতই খারাপ লাগছে শরীর, মন চাইছে গলা ছেড়ে কাঁদতে । দু’পাশে দুই কঠোর চেহারার পুলিশ ।

পুলিশ-স্টেশনে ওর বস জন ওয়ার্নের মতই আরেক গাধা । অফিসার ওকে আটকে রেখে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে । তার ধারণা, কেভিনই একের পর এক খুন করছে বীভৎসভাবে । জিজ্ঞাসাবাদের আগে ব্যাটা বসিয়ে রেখেছে চারঘণ্টা । এবং পরে অসংখ্য প্রশ্নের জবাবে পেট থেকে বেরয়নি কিছুই ওর । কেভিন বলতে পারত, চাকরি করে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে । কিন্তু কিছুই বলেনি । মনে ছিল ভীষণ ভয়, এরাই হয়তো খুনি বা বাউন্টি হান্টার— এবার হয়তো শেষ করে দেবে ওকে । অনেক পরে ভাবল, হতাশ হয়ে ছেড়ে দেবে অফিসার । কিন্তু গাধাটা যখন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আগামীকাল কোর্টে খুনি হিসাবে ওকেই চালান দিতে চাইল, বাধ্য হয়ে অফিসের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দিয়েছে । এর আধঘণ্টা পর গম্ভীর দুই পুলিশের

পাহারায় ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে পেণ্টাগনের এই অফিসে।

কেভিনের জন্যই অপেক্ষা করছিল জন ওয়ার্ন, রাগে গরগর করছে মনে মনে। অনেক আগেই ছুটি হয়ে গেছে তার। কিন্তু মেরিয়ান রয়ে গেছে কনলনের খবর পাওয়ার জন্য, কাজেই... এখন পাশে দাঁড়িয়ে আছে রূপসী মেয়েটি।

‘কনলন!’ গর্জে উঠল ওয়ার্ন, ‘শুনি, কোন চুলায় গিয়েছিলে!’

‘এবার আজকের মত ছুটি নেব,’ নিচু স্বরে বলল কনলন।

‘তা তো নেবেই,’ বাঁকা হাসল ওয়ার্ন। ‘কিন্তু তার আগে কিছু কথার জবাব দিতে হবে। পেণ্টাগনের সিকিউরিটি রেগুলেশনের ৪০২ এবং ৪০৩ আইনের আওতায় নিয়ম ভাঙার কারণে...’

বড্ড ক্লান্ত কনলন, হতাশ হয়ে মেনে নিল— এবার তাকে ঝাড়া হবে জঘন্য ভাষায়। ওয়ার্ন লোকটা আস্ত ডাকাত। আর সামনে কোনও সুন্দরী মেয়ে থাকলে তো...

‘...এবং এরপর ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে তোমাকে এই অফিস থেকে। আর চাকরি থাকছে না তোমার। এবার হাড়ে হাড়ে টের পাবে, বিশেষ কেউ নও তুমি। ...তোমার গায়ে টোকা দেয়া যাবে না, তাই ভেবেছ! তোমার মত কাপুরুষ...’ চট করে মেরিয়ানের দিকে দেখে নিল ওয়ার্ন। একদিন এ সুযোগ পাবে ভেবে নিরানন্দ জীবন পার করছিল সে। ‘হ্যাঁ, তোমার মত কাপুরুষরাই এ দেশের মস্ত ক্ষতি করেছে। আর যারা আমার মত দেশের জন্য লড়াই করতে ভয় পায় না, যারা শক্ত হাতে ধরতে জানে অস্ত্র, নিজ জীবন দিয়ে দিতে পারে...’

কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

কারণ তখনই ঝড়ের মত অফিসে এসে ঢুকল বারোজনের রেকনেসেন্স মেরিনদের একটি দল। পরনে পূর্ণ ব্যাটল ড্রেস, হাতে ভারী অস্ত্র— কোল্ট কমাণ্ডো অ্যাসল্ট রাইফেল, এমপি-৭,

চোখে খুনির দৃষ্টি ।

বিস্ফারিত হলো কেভিন কনলনের দুই চোখ ।

মেরিনদের নেতা দাঁড়িয়ে পড়ল ঘরের মাঝে । কঠোর সুরে বলল, ‘আমি মেজর স্কট মোসলে, ইউনাইটেড স্টেটস্ অভ মেরিন কর্পস । কেভিন কনলনকে খুঁজছি।’

মস্ত ঢোক গিলল কেভিন ।

হাঁ হয়ে গেছে সুন্দরী মেরিয়ান । কী অপরাধ করেছে আপাত নিরীহ কেভিন? মনটা দমে গেল ওর । সত্যি পছন্দ করতে শুরু করেছিল ভদ্র এই যুবককে । কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে...

ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে ওয়ার্ন । ‘কী হয়েছে, স্যর?’ মিহি সুরে বলল, ‘কী করেছে এই কালপ্রিট?’

ওয়ার্নের সামনে থামল মেজর । বিশালদেহী লোক সে । সারা দেহে পোক্ত পেশি । ব্যাটল ড্রেসে তাকে আজকালকার সিনেমার সব রোবটের মত দেখাচ্ছে ।

‘তুমি বোধহয় জন ওয়ার্ন?’ বলল সে, ‘আমার কাছে নির্দেশ এসেছে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে । ভয়ঙ্কর এক আন্তর্জাতিক দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে । আর সে কারণে মিস্টার কনলন এ মুহূর্তে দেশের চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি । আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, দরকার পড়লে জীবন দিয়েও তাঁকে রক্ষা করতে হবে । এখনই এস্কোর্ট করে নিয়ে যাব ওঁকে । কাজেই, মিস্টার ওয়ার্ন, সামনে থেকে সরে যাও ।’

হতবাক হয়ে ছাগলের মত ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইল ওয়ার্ন । একেবারেই ভেঙে চুর-চুর হয়ে গেল বুকটা । হাড় শয়তান কেভিন কনলনকে বাদ দিয়ে এখন আর ওর প্রতি আগ্রহ দেখাবে মেরিয়ান?

মুগ্ধ চোখে কেভিনের দিকে চেয়ে আছে মেরিয়ান ।

অবাক চোখে নোংরা পোশাক পরা যুবককে দেখছে মেজর ।

ইতস্তত করল কনলন, কাকে বিশ্বাস করবে আর কাকে করবে না, বুঝতে পারছে না। আজ দুপুর থেকে যা শুরু হয়েছে!

‘মিস্টার কনলন,’ বলল মেজর মোসলে, ‘মিস্টার রানার তরফ থেকে এক বাংলাদেশি সার্জেন্ট আমাকে পাঠিয়েছে। জানিয়েছে, আবারও আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন মিস্টার রানার। আমার কথা বিশ্বাস না করলে...’

রেডিয়ো বাড়িয়ে দিল মেজর।

ওটা নিল কেভিন।

ওয়ায়ারলেস যন্ত্রটা থেকে কথা বলে উঠল সার্জেন্ট খবির।

আধঘণ্টা পর চার্টার্ড এক এগযেকিউটিভ জেট বিমানে উঠল কনলন।

প্রায় সুপারসনিক গতি তুলে রওনা হলো বিমান স্যান ফ্রান্সিসকো শহর লক্ষ্য করে।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে ওকে ব্রিফ করেছে খবির। খুলে বলেছে কী কারণে কেভিনের সহায়তা মাসুদ রানার প্রয়োজন। আরেকটা বিষয় জানতে চেয়েছে: কী আসলে সেভেঙ্চু মার্সেন প্রাইম নাম্বার।

‘সেভেঙ্চু মার্সেন নাম্বার?’ বলেছে কনলন, ‘ওটা বের করতে কলম লাগবে, কয়েকটা কাগজও। আর... ও, একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর।’

এ মুহূর্তে প্যাসেঞ্জার কেবিনে বসে মাথা খাটাতে শুরু করেছে ও। খসখস করে লিখছে প্যাডে। গভীর মনোযোগ। খেয়ালই নেই দেশের আরেক প্রান্ত লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে একা।

অবশ্য একা বললে চরম মিথ্যা হবে, ওর দেখভাল ও পাহারার কাজে রয়েছে ইউএস মেরিন কর্পসের বারোজনের চৌকস একটি দল।

পাঁচ

হোয়াইট হাউস ।

ওয়াশিংটন, ইউএসএ ।

অক্টোবর ১৫ ।

সকাল সোয়া নয়টা ।

অনেক লোকের গুনগুন হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে ।

নানাদিকে ছুটছে এইড ।

সিকিয়ার ফোনে কথা বলছেন মস্ত সব জেনারেল ও
অ্যাডমিরালরা ।

প্রত্যেকের মুখে একটু পর পর নোয়া'য শিপ, লিয়ার্ড প্রজেক্ট
এবং মাসুদ রানার নাম উচ্চারিত হচ্ছে ।

কিন্তু কেউ হৃদিস দিতে পারছে না বিসিআই-এর এজেন্ট
মাসুদ রানা কোথায় ।

নেভির এক অ্যাডমিরালের আগে হনহন করে হেঁটে মস্ত
রুমে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট । তাঁর কানে ফোন রেখে পিছনে
হাঁটছেন অ্যাডমিরাল রনসন ।

‘মিস্টার প্রেসিডেন্ট,’ নিচু স্বরে বললেন, ‘গতকালই চার্লস
ডেলাক্রুসের সঙ্গে কথা হয়েছে । মিস্টার রানা বলেছিল অ্যাটাক
সাবমেরিন ব্যবহার করতে । কিন্তু আমরা তার সঙ্গে একমত
নই । কোথাকার কোন্ ভেতো বাঙালি বলবে, আর আমরা তার
কথায় নাচতে থাকব... স্যর, আপনি নিশ্চই চান না ইউএস নেভি

ওই লোকের সামান্য অঙ্গুলি নির্দেশে...'

‘আহ, অ্যাডমিরাল,’ ধমকের সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট।
‘আগেই এসব আমাকে জানানো হয়নি কেন?’

‘আপনি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, স্যর।’

‘মেজর রানা যা বলেছেন, তাই করুন,’ বললেন প্রেসিডেন্ট।
‘উনি যা চান, তাই যেন করা হয়। যদি বলেন সাবমেরিন পাঠাতে, তাই করবেন। যদি বলেন, নর্থ কোরিয়াকে ব্লক করতে হবে, আমরা তাই করব। ভেবেছিলাম আগেই এসব বুঝতে পেরেছেন আপনারা! মাসুদ রানার প্রতিটি কথার বিরুদ্ধে আমার কান ভাঙাচ্ছেন আপনারা! অথচ আপনাদের মাথায় ঢুকছে না, ওই একটি লোকের কাঁধে ভর করে চলছে বর্তমান সভ্যতা! তাঁকে চিনি, বিশ্বাসও করি। নিজের জীবন সঁপে দিতে পারি তাঁর হাতে নিশ্চিন্তে। তিনি যে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলতে বলেননি, এতেই আপনাদের খুশি থাকা উচিত। অক্ষরে অক্ষরে ভদ্রলোকের কথা মত কাজ করুন, পরে আমাকে পরামর্শ দেবেন। এ মুহূর্তে ডিপ্লময় করুন আমাদের প্রতিটি অ্যাটাক সাবমেরিন।’

ড্রাগন কর্পোরেশন শিপবিল্ডিং অ্যাণ্ড মিসাইল অ্যাটাচমেন্ট প্লান্ট,
নরফোক, ভার্জিনিয়া।

অক্টোবর ১৫।

সকাল নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট।

এ মুহূর্তে ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্সের ইন্সপেক্টরদের ঘিরে রেখেছে ইউনাইটেড স্টেটস মেরিনের দুটো দল। নোয়া'য শিপ ও লিয়ার্ড জয়েন্ট প্রজেক্ট বিষয়ক ভার্জিনিয়ার নরফোক প্লান্টের দিকে চলেছে সবাই।

কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল সবাই ড্রাগন কর্পোরেশনের

আকাশ ছোঁয়া প্রকাণ্ড সব দালানের সামনে। মস্ত জায়গা নিয়ে ওই প্লান্ট। একের পর এক দালান। একটার সঙ্গে আরেকটা সংযুক্ত। রয়েছে বিশাল সাতটি ড্রাই-ডক। আকাশের নাক তুলেছে অসংখ্য ক্রেন।

এই প্লান্টেই তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক মিসাইল সিস্টেম। ইউএস নেভাল ছদ্মবেশী ভেসেলে বসিয়ে দেয়া হয়েছে সেসব মিসাইল। কখনও কখনও নিজেরাও মস্ত সব জাহাজ তৈরি করে এখানে ড্রাগন কর্পোরেশন।

এ মুহূর্তে একটি ড্রাই-ডকে চূপ করে বসে আছে মস্ত এক সুপারট্যাঙ্কার। ওটাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে একের পর এক ক্রেন। ওগুলো অনেক উপরের আকাশে উঠেছে।

অবাক কাণ্ড, সাড়ে নয়টার বেশি বাজে, কিন্তু কোথাও নেই কেউ।

ঝড়ের মত প্লান্টে ঢুকল মেরিনরা। বাধা এল না কোথাও থেকে। গোলাগুলি নেই, লড়াই হওয়ারও সম্ভাবনাও নেই। কয়েক মিনিটের ভিতর প্লান্ট সিকিয়ার বলে ঘোষণা দেয়া হলো।

রেডিয়োতে মেরিন কমান্ডার জানাল: ‘আপনারা ডি.ও.ডি.-র ছেলেরা আসতে পারেন। কিন্তু আগেই সতর্ক করছি, ভিতরের পরিস্থিতি মোটেও ভাল নয়!’

গন্ধটা দম আটকে দেয়ার মতই।

একেবারে পচে গেছে মানুষের লাশ।

জমাট বাঁধা থকথকে রক্ত ও লাশগুলোর ক্ষতের উপর ভনভন করে উড়ছে হাজারে হাজারে রক্ত-মাংস লোভী মাছি।

প্রধান অফিস এলাকায় বয়ে গেছে রক্তের স্রোত, দেয়ালে ছিট-ছিট খয়েরি দাগ। বেঞ্চগুলোর উপর কাদার মত রক্ত, গড়িয়ে নেমেছে স্টেয়ারকেস বেয়ে, তৈরি করেছে বীভৎস লালচে

স্ট্যালাকটাইটিস।

ড্রাগন কর্পোরেশনের কর্মীদের কপাল ভাল, ইন্সপেকশন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই তাদেরকে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছিল। সিকিউরিটি লকডাউন করা হয়েছিল বলেই তাদেরকে করুণভাবে মরতে হয়নি।

কোম্পানির সিনিয়র সব ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপার্টমেন্ট প্রধানদের কপাল মন্দ। পাশাপাশি পড়ে আছে মেইন ল্যাবের সামনে, ছাড়া হয়নি কাউকে। এক এক করে হত্যা করা হয়েছে। মৃতদেহগুলোর পিছনের দেয়ালে ছলাৎ করে লেগেছে রক্ত।

গত একসপ্তাহ ধরে মহাআরামে লাশ খেয়েছে অসংখ্য ইঁদুর।

অন্যান্য লাশ থেকে দূরে পাঁচটি মৃতদেহ। তারা ড্রাগন কর্পোরেশনের লোক নয়।

এমন নয় যে ড্রাগন কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা লড়াই ছাড়াই মরেছে। তাদের সিকিউরিটি ফোর্স আগন্তুকদের ক'জনকে শেষ করেছে।

এই পাঁচ লাশ পড়ে আছে প্লান্টের নানা জায়গায়। পাশেই তাদের একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল।

পরনে কালো মিলিটারি পোশাক। মাথায় আরবী কালো হাওলি বা বিড়ে।

প্রত্যেকের কাঁধে বিশেষ ডাবল-সিমিটার টাটু। ওটা ব্যবহার করে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন— গ্লোবাল জিহাদ।

কিছুক্ষণের ভিতর ক্ষতি অ্যাসেস করল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টররা। তাদেরকে সহায়তা করল এফবিআই ও আইএসএস -এর এজেন্টরা।

গুয়ামের ড্রাগন প্যাসেফিক প্লান্টে ইন্সপেকশন করতে যাওয়া দ্বিতীয় টিম থেকে ফোন এল। একইরকম ম্যাসাকার করা হয়েছে

ওখানেও ।

এ খবর পাওয়ার পর বিশেষ একটি সিকিয়ার ফোনে হোয়াইট হাউসের এইডের সঙ্গে যোগাযোগ করল ডি.ও.ডি.-র এক সিনিয়র ইন্সপেক্টর ।

‘খবর খুব খারাপ, স্যর,’ বলল সে, ‘নরফোকে আমরা পনেরোটা লাশ পেয়েছি । নয়জন ইঞ্জিনিয়ার, ছয়জন সিকিউরিটি স্টাফ । শত্রু খতম হয়েছে পাঁচজন । সবাই টেরোরিস্ট । লাশের ফরেনসিক থেকে বোঝা গেছে, এরা মারা গেছে ছয়দিন আগে । ঠিক কখন খুন হয়েছে, বুঝবার উপায় নেই । একই ঘটনা ঘটেছে গুয়ামে । অবশ্য মাত্র একজন টেরোরিস্ট মরেছে ।

‘নরফোকের পাঁচ টেরোরিস্টকে আইডেন্টিফাই করেছে এফবিআই । এরা গ্লোবাল জিহাদের লোক । তাদের একজন ওই সংগঠনের কাতলা, নাম শাহেদ করিম । কিন্তু এসবের সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে, স্যর: এই হত্যাকাণ্ডে আরও অনেক টেরোরিস্ট জড়িত ছিল । নরফোকের প্লান্ট থেকে হারিয়ে গেছে তিনটি সুপার-ট্যাঙ্কার । গুয়াম থেকে গেছে দুটো । ...এবং, স্যর, এসব সুপার-ট্যাঙ্কারের সঙ্গে উধাও হয়েছে লিয়ার্ড প্রজেক্টের মিসাইলও ।’

এইমাত্র ফ্রেঞ্চ উপকূলীয় এয়ারস্পেসে ভেসে উঠেছে একটি কুচকুচে কালো ফাইটার বিমান ।

গতকাল সন্ধ্যায় হাজির হয়েছে পাহাড়ি এলাকায় । একটু আগেও লুকিয়ে ছিল দুই পাহাড়ের মাঝের সংকীর্ণ উপত্যকায় । ঝোপঝাড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল ওটাকে ।

বিকেল তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ।

মন্তুরগতিতে ভ্রমরের মত উপকূলীয় দুর্গ শ্যাটিয়নের দিকে চলেছে কালো বিমান ।

‘রঘুপতি,’ বলল নিশাত, ‘হঠাৎ কোথায় চললে? আমরা কিন্তু এখনও মাসুদ স্যর বা অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।’

‘তা ঠিক।’

‘তা হলে কোথায় চলেছি?’

‘জরুরি কাজে। জানবেন, কিন্তু পরে।’

বিরক্ত হলো নিশাত। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে এবার কথাটা পাড়ল, ‘একটা কথা জানতে চাই তোমার কাছে।’

‘বলুন।’

‘তোমার মত এত ভাল রোবট ভয়ঙ্কর ওই বিজ্ঞানীর সঙ্গে কেন? গতরাতে খবিরের সঙ্গে কথা বলে, এবং পরে ইন্টারনেট ঘেঁটে জানলাম অসংখ্য মানুষ মেরেছে কুয়াশা।’

‘মানুষটা তিনি মোটেও খারাপ নন,’ নিচু স্বরে বলল রঘুপতি। মনে হলো না এসব কথা শিখিয়ে দেয়া, চিন্তা-ভাবনা করেই বলেছে।

‘কোন দিক দিয়ে ভাল?’

‘কখনও কখনও খুন করেন বটে, কিন্তু তার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ থাকে। ধরুন না কয়েক বছর আগের ওই সুদানের ঘটনা। আল-কায়দার ওপর হামলা করতে গেল আমেরিকান ডেল্টা ইউনিট। বোধহয় আমেরিকান আর্মিতে তাদের গুপ্তচর ছিল, আগেই সরে পড়েছিল আল-কায়দার সবাই। ওই ওয়্যারহাউসে কাউকে না পেয়ে খেপে গেল ডেল্টা ফোর্স। এক মাইল দূরে ছিল বসের গবেষণাগার, ওটা ধ্বংস করে দিল।’

‘কখনও কারও সঙ্গে সামান্যতম বিশ্বাসঘাতকতা করেননি বস। ডেল্টা ইউনিট তাঁকে বন্দি করে নিয়ে গেল পোর্ট সুদানের এক পরিত্যক্ত লাইটহাউসে। কপ্টারে সিআইএ-র লোক ছিল। সে ইন্টারোগেট করল: বসের নতুন জেনেটিক গবেষণার সব

তথ্য চাই তার।

‘তিনি যখন কিছুই বললেন না, মেরে ফেলতে চাইল তাঁকে।’

‘বাঁচল কী করে তোমার বস?’

‘ওঁকে কন্সটার থেকে নামিয়ে লাইটহাউসে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। আগেই কৌশলে হ্যাণ্ডকাফ খুলে ফেলেছিলেন বস। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক সৈনিকের অস্ত্র কেড়ে নেন। তাঁকে ঠেকাবার আগেই ডেল্টা ফোর্সের ওই তেরোজনকে হত্যা করেন। বন্দি করতে চেয়েছিলেন সিআইএ-এর লোকটাকে। কিন্তু পাল্টা গুলি করতে গিয়ে মরল সে। অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করেননি বস।’

‘খুব সংক্ষেপে বললে,’ জানাল নিশাত। ‘এরপর কী হলো?’

‘ওই লোকগুলোকে হত্যার জন্য দায়ী করা হলো বসকে। তাঁর মাথার উপর পাঁচ মিলিয়ন ডলারের বাউন্টি ঘোষণা করল আমেরিকান সরকার। পরে একটা স্কোয়াড পাঠানো হলো বসকে শেষ করতে। তাদের একজনও আর ফিরতে পারেনি।’

চুপ হয়ে গেছে রঘুপতি।

কথা বাড়াল না নিশাত।

নীচে পাহাড়ি রাস্তা। এখানে-ওখানে মস্ত সব গর্ত। পথের শেষে ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়ন।

চিন্তায় ডুবে গেছে নিশাত।

গতকাল সন্ধ্যা থেকে বারবার যোগাযোগ করতে চেয়েও মাসুদ স্যরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ফ্রেন্স এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার।

সামান্য দূরে উপকূল।

১৫ অক্টোবর।

বিকাল তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

বাউন্টি হান্টার্স-২

গতকাল উপকূলীয় সাগর থেকে প্যাট্রল বোটে তুলে নেয়ার পর রানাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফ্রেঞ্চ ডেস্ট্রয়ারে। ওখান থেকে ওকে নিয়ে রওনা হলো প্রকাণ্ড এক নেভাল পিউমা কন্সটার। পৌঁছে দিল চার্লস দ্য গল ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে।

ফ্লাইট ডেকে কন্সটার অবতরণ করতেই নীচে নামতে লাগল এলিভেটর। পৌঁছে গেল নীচের একটা ডেকে। রানা দেখল সারি সারি অসংখ্য মিরাজ ফাইটার, অ্যান্টি সাবমেরিন বিমান, ফিউয়েল ট্রাক ও জিপগাড়ি।

ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে হেলিকপ্টার থেকে নামাতেই এগিয়ে এল চারজন সিনিয়র ফ্রেঞ্চ অফিশিয়াল।

তাদের একজন নেভির অ্যাডমিরাল।

দ্বিতীয়জন আর্মির জেনারেল।

তৃতীয়জন এয়ারফোর্সের কমান্ডার।

চতুর্থ লোকটার পরনে ধূসর সুট।

তার নির্দেশেই রানার ডান বাহুতে কী যেন ড্রাগ পুশ করল এক সেকেন্ড কমান্ডার।

তখনই ভীষণ ঘুম পেল রানার, পরক্ষণে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

‘আমাদের জন্য আরও তথ্য আসছে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব ওর,’ মিলিটারির তিন উচ্চপদস্থ অফিসারকে জানাল ধূসর সুট।

কফিনের মত বদ্ধ এক কুঠুরিতে নিয়ে আটকে রাখা হলো অচেতন রানাকে।

আবার যখন চেতনা ফিরল ওর, চুপ করে পড়ে রইল।

চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে চারপাশ দেখল।

মিটমিট করে জ্বলছে হলদে বাল্ব।

দুই হাত পিঠে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো ।
রানা টের পেল, হাতে ঘড়ি আছে ।
অনেক কসরত করে ঘড়ি দেখল ।
ফ্রেঞ্চ স্থানীয় সময় অনুযায়ী এখন দুপুর একটা ।
পেটে প্রচণ্ড খিদে ।
গলা ও কক শুকনো কাঠের মত খটখটে ।
ছিঁড়ে পড়বে যেন মাথা, প্রচণ্ড ব্যথা ।
একবার গিয়ে দরজা পরখ করেছে, ওই ভারী লোহার কবাট
ভাঙবার সাধ্য ওর নেই ।
ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে থাকল রানা ।
অনেকক্ষণ পর খটাং আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা ।
ভিতরে এসে ঢুকল চারজন সশস্ত্র নাবিক । হ্যাঁচকা টানে
তুলে নেয়া হলো রানাকে, ধাক্কা দিয়ে বের করে আনা হলো
কফিন থেকে ।
সরু করিডোরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল ওকে । সিলিঙে
টিমটিমে হলদে আলো ।
দু'মিনিট পর চওড়া প্যাসেওয়েতে পড়ল ওরা ।
রানার দু'পাশে দু'জন, পিছনে দু'জন ।
আবারও সেই প্রকাণ্ড হল ঘরে হাজির হলো ওরা ।
আগের মতই অসংখ্য মিরাজ ফাইটার, অ্যান্টি সাবমেরিন
বিমান, ফিউয়েল ট্রাক ও জিপগাড়ি ।
হাজির হয়েছে সেই চার অফিশিয়াল ।
অবশ্য রানার চার প্রহরী ছাড়াও এখন বাড়তি দু'জন গার্ড
অস্ত্র হাতে তৈরি ।
চারপাশ দেখে নিল রানা । এটা মেইন্টেন্যান্স হ্যাণ্ডার ।
কোথাও পারসোনেলদের দেখা গেল না ।
অদ্ভুত থমথম করছে মস্ত ঘর ।

নাগবতা ভাঙল আর্মির জেনারেল, 'তা হলে তুমি সত্যিই বিসিআই-এর মাসুদ রানা। অ্যান্টার্কটিকায় একা শেষ করেছিলে আমার সেরা প্যারাদ্রুপারদের।'

অ্যাডমিরাল বলল, 'ওই দুঃখজনক দুর্ঘটনার সময় গোটা সাবমেরিন হারিয়েছি। আজও ওটাকে খুঁজে পাইনি আমরা।'

শালারা কিচ্ছু ভোলেনি, ভাবল রানা।

দ্বিগুণ হলো ওর মাথার ব্যথা।

ধূসর সুট পরা লোকটা সামনে বাড়ল। অত্যন্ত চৌকস সে। নিখুঁত উচ্চারণে ফ্রেঞ্চ বলে। ব্যাটাকে খুবই বিপজ্জনক মনে হলো রানার।

'মোসিউ রানা, আমার নাম প্লেসি মোহ্নি, এসেছি ডিরেকসঁ জেনাথালে দে লা সিকিউখিতি এক্সেতেখিয়েথ থেকে।'

ডিজিএসই বা বহির্বিশ্ব নিরাপত্তা ডিরেক্টরেট জেনারেল, ভাবল রানা। আমেরিকানদের আইএসএস-এর মতই, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংগঠন। মোসাদের কথা বাদ দিলে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ওটা।

গলা এমনিতেই শুকিয়ে আছে, ঢোক গিলতে গিয়ে রানা টের পেল জিভও শুকিয়ে গেছে।

'মিস্টার মোহ্নি, বলুন তো ব্যাপারটা কী?' কর্কশ স্বর বেরোল ওর কণ্ঠ থেকে। 'ফ্রান্স তা হলে ম্যাজেস্টিক-১২ কাউন্সিলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? নাকি শুধু ডেমিয়েন ডগলাসের সঙ্গে?'

'বুঝলাম না কী বোঝাতে চাইছেন,' হালকা সুরে কথাটা উড়িয়ে দিল মোহ্নি। 'আমরা শুধু জানি, মোসিউ ডগলাস আমাদের জন্যে, অর্থাৎ ফ্রান্সের জন্যে চমৎকার ট্যাকটিকাল অ্যাডভানটেজ তৈরি করেছেন। তাঁর সংগঠনকে বাহাবা না দিয়ে পারছি না আমরা।'

‘আমাকে ধরে এনেছেন কেন?’

‘আমি খুশি হব তোমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিতে পারলে,’ বলল আর্মি জেনারেল।

‘আর ওটা তোমার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে খাব আমি,’ বলল অ্যাডমিরাল।

‘আমি কিন্তু আপনাদের মত নই, অনেক প্র্যাকটিকাল,’ শান্ত স্বরে বলল মোহনি। ‘পরেও আপনারা যার যার ইচ্ছে পূরণ করতে পারবেন। তার আগে আমার কিছু প্রশ্ন আছে ওর কাছে। জানতে চাই মোসিউ ডগলাসের পরিকল্পনা পুরো ফুলপ্রুফ কি না।’

পাশের বেঞ্চে ব্রিফকেস রাখল সে। ওটা খুলতেই দেখা গেল ছোট ধাতব ইউনিট। জিনিসটা হার্ড বাউণ্ড বইয়ের সমান হবে।

কোনও মিনি-কমপিউটার, ভাবল রানা।

যন্ত্রটার মাঝে দুটো স্ক্রিন।

উপরের অংশে বড় স্ক্রিন।

নীচের স্ক্রিন ছোট এবং ডানদিকে।

উপরের স্ক্রিনে একের পর এক লাল ও সাদা গোলাকার কী যেন। জ্বলজ্বল করছে।

নীচের ছোট স্ক্রিনে দশ ডিজিটের কি-প্যাড।

আধুনিক সব টেলিফোনেই ওই জিনিস থাকে।

‘মেজর রানা,’ বলল মোহনি, ‘জিনিসটা দেখছেন? এটাই টাচলক-৯ সিকিউরিটি সিস্টেম। আমরা জানতে চাই আপনি এটা ডিসআর্ম করতে পারেন কি না।’

ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়ন ।

ব্রিটানির উপকূল, ফ্রান্স ।

১৫ অক্টোবর ।

বিকাল চারটা ।

প্রায়াক্ককার পাতাল ঘরে টেনে হিঁচড়ে আনা হয়েছে আহত তিশাকে । টান খেয়ে আরও হিঁড়ে গেছে কাঁধের জখম । নতুন করে ক্ষত থেকে পড়ছে রক্ত । জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তিশার । প্রায় অচেতন, ঘোরের ভিতর দেখল চারপাশে গোলাকার পাথুরে দেয়াল । সাগরের পানিতে ডুবে গেছে মেঝে । ঘরের গভীর অংশে সাঁতার কাটছে দশফুটি দুই হাঙর ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারাল তিশা । চেতনা ফিরল খটাং আওয়াজ পেয়ে ।

গিলোটিনের গর্দান রাখবার কাঠের তাকিয়ার উপর নেমেছে কাঠের আড়া, ওটা কঠিনভাবে চেপে ধরেছে ওর গ্রীবা । কাঠের তাকিয়া আড়তদারের ক্যাশবাক্সের আকৃতির, তবে বড় ।

বিন্দুমাত্র মাথা নাড়াতে পারল না তিশা ।

খটাং আওয়াজে গিলোটিনের লক আটকে দিল এক সশস্ত্র লোক ।

আগে কখনও একে দেখেনি তিশা ।

মাথার চুলগুলো গাজর রঙের । চোখদুটো যেন কূপ, চাহনি

মৃতের। চেহারাটা ক্ষুধার্ত ইঁদুরের মুখের মত।

কেন যেন শিউরে উঠল তিশা ভয়ে। মনে পড়ল রানার কথা। এখন যদি মস্ত মনের মানুষটা থাকত, যেমন করে হোক ওকে সরিয়ে নিত এখান থেকে।

চোখ তুলে উঁচু গিলোটিনের দিকে চাইল।

বারো ফুট উপরে বুলছে ক্ষুরধার ব্লেড।

জ্বরের ঘোরে মুখ বিকৃত করল তিশা। ব্যথা। ভয়ঙ্কর। আগুনের মত জ্বলছে বুক ও কাঁধের ক্ষত। বোধহয় ভিতরে রয়ে গেছে ট্রেসার বুলেট। হাঁটু গেড়ে বসতেও কষ্ট হচ্ছে এখন।

ওই ইঁদুর-মুখের পাশে আরেক বাউন্টি হান্টার— কার্ট কে. এবেলহার্ডের বামহাত। সাইকোটিক এক্স রয়াল মেরিন। নাম ফিলিপ। একটু আগে কে যেন তাকে ওই নামে ডেকেছে। লোকটার হাতে শ্টায়ার-এইউজি অ্যাসল্ট রাইফেল। মাঘল তাক করেছে ওর মাথা বরাবর।

লোকটার পরনে বিদ্যুটে কালো আলখেল্লা। যেন শেষ নেই পকেটের, ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে নানান অদ্ভুত ডিভাইস।

এমন কী পনি বটল ও মাউন্টেনিয়ারিং পিটন পর্যন্ত সেগুলোর ভিতর আছে।

ওই আলখেল্লা কুয়াশার।

মুখ তুলে চাইল তিশা।

দেখতে পেল বৈজ্ঞানিককে।

পনেরো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। সাগরের পানিতে দুই ইঞ্চি তলিয়ে গেছে পাথরের ওই মঞ্চের মেঝে। চোখ বুজে আছে বিজ্ঞানী। সানগ্লাস নেই। কূপের কারুকাজ করা পাথুরে দেয়ালে আটকে রাখা হয়েছে তাকে। দুই হাত শিকল দিয়ে বাঁধা। নল কাটা বন্দুকের দুই হোলস্টার এখন ফাঁকা।

উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে জলমগ্ন ডানজনে।

গমগম করে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ:

‘ঘুরতে ঘুরতে দূর থেকে দূরে সরছে বাজপাখি, আর শুনতে পেল না তার মালিকের কণ্ঠ। সবই যেন সরছে, কিছুই থাকছে না কেন্দ্রে। তারপর রইল শুধু বিশ্ব জুড়ে চরম অরাজকতা। ...আমার ভুল না হয়ে থাকলে ওটা লিখেছেন ইয়েট্‌স্‌।’

দর্শকদের ব্যালকনিতে হাজির হয়েছে ডেমিয়েন ডগলাস। পাশে বাউন্টি হান্টার কার্ট কে. এবেলহার্ড।

শার্ক পিটের দিকে চাইল ডগলাস, ভঙ্গি দেখে মনে হলো কলোসিয়াম থেকে দেখছেন কোনও রোমান সম্রাট। তার চোখ স্থির হলো তিশার উপর। বেচারি আছে কূপের পঞ্চাশ গজ দূরে।

‘অরাজকতা শুরু হয়েছে গোটা দুনিয়া জুড়ে, লেফটেন্যান্ট তিশা করিম,’ আবৃত্তির সুরে বলল ডেমিয়েন। ‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাতে আমি খুবই খুশি। ...তুমি খুশি নও?’

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে তিশা, চাপা স্বরে বলল, ‘না।’

ডানজনের ভিতর প্রতিটি শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

‘তিশা করিম খুশি নয়,’ বলল ডেমিয়েন। চাইল কুয়াশার দিকে। ‘কী বলব আপনাকে— কুখ্যাত বৈজ্ঞানিক, না বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক? আপনার কাজ অত্যন্ত অসঙ্গতিক মনে হয়েছে আমার। আপনি এই চমৎকার মানুষ-শিকার বন্ধ করতে চেয়েছেন। বারবার রক্ষা করেছেন মাসুদ রানাকে। যদিও জানেন, এর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর: চরম শাস্তি দেয়া হবে আপনাকে।’

চুপ করে আছে কুয়াশা, চেয়ে রইল বিলিয়োনেয়ারের চোখে।

‘বুঝতে পারছি কাউন্সিলের প্ল্যানে বাধা দিতে চাইছে কেউ,’ বলল ডেমিয়েন। ‘মাসুদ রানাকে রক্ষা করতে কে টাকা দিচ্ছে

আপনাকে, কুয়াশা?’

চুপ রইল কুয়াশা। মনে পড়েছে ওর প্রেমিকা লিলি মাখসাখের কথা। কথাটা ও-ই প্রথমে তুলেছিল, প্যারিসে।

‘প্রতি তিনটে কথায় অন্তত একবার যার নাম তোমার মুখে আসে, সেই মাসুদ রানাকে খতম করে দিচ্ছে ম্যাজেস্টিক-১২। তারা অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যবসায়ী। তুমি চাইলে তোমার প্রিয় রানাকে সতর্ক করতে পারো।’

লিলি ভাল করেই জানে কুয়াশার জন্য কী-ই না করেছে মাসুদ রানা। তুলে নেয়া হয়েছে পুলিশের হুলিয়া, বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বিপুল টাকা দেয়া হয়েছে গবেষণাগার তৈরির জন্য। এখন আর পলাতক আসামী নয় কুয়াশা।

লিলির মুখে কথাটা শোনার পর সেদিন থেকেই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে কুয়াশা।

‘আপনি কিন্তু নিজের সর্বনাশ করছেন,’ চেহারায হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে কুয়াশার দিকে চাইল ডেমিয়েন। ‘ভেবে দেখুন, আমি যখন প্রায়ার্স দিয়ে হ্যাঁচকা টানে আপনার জিভটা ছিঁড়ে নেব, আফসোস করবেন আগেই মুখ খোলেননি কেন।’

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কুয়াশা। কথা বলল না।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে নিয়ে বলল তিশা, ‘আমরা তোমাদের সব প্ল্যান জানি, শয়তানের চেলা। তোমরা নতুন করে কোন্ড ওঅর তৈরি করতে চাইছ। আসলে পারবে না। প্রতিটি দেশের সরকার জেনে যাবে সব। আমরা এরই ভেতর আমেরিকান সরকারকে সবই জানিয়েছি।’

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল ডেমিয়েন।

‘মাই ডিয়ার লেফটেন্যান্ট তিশা, তুমি কি সত্যিই মনে করো আমি কোনও সরকারকে ভয় পাই? প্রতিটি দেশের সরকার মানেই পেট-মোটা মাঝবয়সী একদল চোর-চোড়ার ক্লাব।

নিজাদের লাগ ফিতার বাঁধনে আটকা পড়েছে। গরীব দেশের
মানবতার কথা বাদই দিই, পশ্চিমা সরকারগুলোরও একই
মনোভা— সেখানে ঢুকে পড়েছে লোভী একদল অপদার্থ। উঁচু
পদে যাওয়ার জন্যে কামড়া-কামড়ি করছে নর্দমার হুঁদুরের মত।
সবারই চাই প্রেসিডেনশিয়াল বিমান, প্রাইম মিনিস্ট্রিয়াল
অফিস... ইত্যাদি। একটা আচ্ছন্নতার ভেতর আছে এরা।

‘আর নতুন এই কোন্ড ওঅর,’ নিচু হয়ে গেল ডেমিয়েনের
কণ্ঠ, ‘এই প্ল্যান আসলে কাউন্সিলের মূল প্ল্যান নয়, ওটা আমার
সৃষ্টি। আমার প্লানে রয়েছে সত্যিকারের দূরদৃষ্টি।

‘ইয়েটস্-এর কবিতার কথাই ভাবো, লেফটেন্যান্ট— সেই
বাজপাখির মালিকের কথা, যে কিনা আর বাজপাখিটাকে
নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। ভাবো এমন এক দেশের কথা, যে
দেশ ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র কোনওভাবেই নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে
পারবে না। যেন নিজস্ব চিন্তা রয়েছে এসব অস্ত্রের। আঁচ করতে
পারো ওগুলো কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে? ওদের
সৃষ্টিকর্তার চেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে ওরা। স্বাধীন হয়ে
গেছে।

‘এবার ভাবো ইউএস ডিফেন্স ইণ্ডাস্ট্রির কথা। এ ক্ষেত্রে ঠিক
তাই হয়েছে। কী ঘটবে যদি তাদের কর্তৃপক্ষের কথা কানে না
তোলে মিসাইল নির্মাতারা? যদি মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স
ঠিক করে তারা আর ইউনাইটেড স্টেটস্ সরকারকে চায় না?’

‘আপনারা ভাবছেন দখল করে নেবেন আমেরিকা?’ অবাক
সুরে বলল তিশা।

‘কেন নয়? বাধা দেবে কে?’ হেসে উঠল ডেমিয়েন।

‘রানার মত আরও অনেকে বাধা দেবে,’ জোর দিয়ে বলল
তিশা।

‘তোমরা ভাবছ বর্তমান দুনিয়াটাকে টিকিয়ে রাখতে

পারবে?’ ডগলাসের ঠোঁটের হাসি বিস্তৃত হলো। ‘আমরা যেখানে আমেরিকাকেই পান্ডা দিচ্ছি না, সেখানে গরীব দেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক’জন কী করবে? আগামীকাল থেকে আমাদের পা চাটতে শুরু করবে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা দেশ। আগে থেকেই পা চাটছে অনেকে। ...আর তুমি বলছ মাসুদ রানার কথা। হ্যাঁ, আমাদের মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড। ...গুণ আছে তার, কি বলো? তুমি কি জানো, কাউন্সিল বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে তার বিষয়ে? লিস্টে তার নাম রাখা হয়েছে সেই কারণেই। মিথ্যা কথা বলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল সাইবেরিয়ায়, এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যাতে সহজেই ফাঁদে পা দেয় তোমার হিরো। বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাউন্সিলের ওই কাঁচা প্ল্যান কাজে আসেনি।’

‘অন্য সব প্ল্যানও বানচাল হবে।’

‘কিন্তু তোমার প্রেমিক এখনও বেঁচে আছে,’ তিশার কথায় কান না দিয়ে বলল ডেমিয়েন। ‘এটা বড় একটা সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।’

এত ব্যথার ভিতরও হঠাৎ স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে গেল তিশার। ডেমিয়েন ডগলাসের দিকে চাইল। পরক্ষণে হিমশীতল স্রোত নামল মেরুদণ্ড বেয়ে। লোকটার চোখে কী যেন, আগে কখনও এমন ভয় লাগেনি ওর।

ডেমিয়েন ডগলাসের ওই দৃষ্টি কুয়াশাও দেখেছে, চমকে গেছে। মস্ত কোনও ক্ষতি করতে তৈরি হয়েছে লোকটা!

সোজা হয়ে দাঁড়াল কুয়াশা, শিকল আটকে রেখেছে দুই হাত। বুঝতে পারছে, ছিঁড়তে পারবে না গায়ের জোরে।

‘এখন কথা হচ্ছে,’ শুরু করল ডেমিয়েন, ‘সাধারণ কোনও গল্প-কাহিনিতে আমার মত ভয়ঙ্কর ভিলেন বন্দি করে রাখত নায়কের প্রেমিকা লেফটেন্যান্ট তিশা করিমকে। নইলে কীভাবে বাগে পাবে নায়ককে? আর এ কথাই গতকাল থেকে ভাবছিল

আমাদের কাট কে. এবেলহার্ড ।’

‘কিন্তু?’ বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইল তিশা ।

‘কিন্তু এই সিনেমার ভিলেন সাধারণ নয়,’ বলল ডেমিয়েন ।

চুপ হয়ে গেছে সে । কঠোর চোখ দেখছে তিশাকে ।

‘এটাই তফাৎ সাধারণ ভিলেনের সঙ্গে আমার,’ বলল ডেমিয়েন, ‘আমি বাড়তি কিছু করতে চাই । নইলে মাসুদ রানা গর্ত থেকে বেরোবে কেন? যেন তার মনে হয় কাউন্সিলের প্ল্যানের পিছনে না দৌড়ে আমার পিছনে আসা অনেক জরুরি । ...মিস্টার কোভাক!’

ঠিক তখনই দেখা দিল হুঁদুর-মুখো কোভাক, খপ করে ধরল সে গিলোটিনের রিলিজ লিভার ।

ভয় পেল তিশা । চোখে আতঙ্কিত দৃষ্টি । ও বাঁচতে চায় । সারাটা জীবন পাশে থাকতে চায় রানার ।

কুয়াশার চোখে চোখ পড়ল ওর । চাপা স্বরে বলল, ‘মিস্টার কুয়াশা, যদি বেরিয়ে যেতে পারেন, আমার হয়ে একটা কথা বলবেন রানাকে?’ তিশার কণ্ঠ কাতর ।

‘তা কী?’ শুকনো গলায় জানতে চাইল কুয়াশা ।

‘বলবেন, আমি ওকে হ্যাঁ বলতাম ।’

আরেকবার ডেমিয়েনের দিকে চাইল কোভাক ।

‘এবার টান দাও লিভারে,’ নির্দেশ দিল ডগলাস ।

‘খবরদার, ডগলাস, কুকুরের বাচ্চা!’ গর্জে উঠল কুয়াশা, ‘খুন হয়ে যাবি তুই আমার হাতে!’

থমকে গেল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট । পরক্ষণে হাসল । ‘তাই, কুয়াশা? কীভাবে মারবে আমাকে?’

এবার কোভাককে নির্দেশ দেবে সে । বারো ফুট উপর থেকে রওনা হবে ক্ষুরধার ব্লেড । বিদ্যুৎবেগে নামবে তিশার মরাল গ্রীবা লক্ষ্য করে ।

কাঠের তাকিয়ায় জোরালো থাক্ আওয়াজ হবে।

গিলোটিনের পায়ের কাছে খসে পড়বে মস্তকহীন তিশার দেহ।

‘আচ্ছা, কুয়াশা, কেন ভাবছ আমার ক্ষতি করতে পারবে?’ হাত তুলে কোভাককে থামতে ইশারা করল ডগলাস।

তিশা মনের চোখে দেখল, কাটা গলা থেকে জলপ্রপাতের মত ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত। ভিজে যাচ্ছে পাথরের মঞ্চ, ওই স্রোত নামছে মঞ্চের নীচে সাগরের পানিতে। চোখ বুজে ফেলল ও।

‘কারণ, আমি প্রতিশোধ নেব,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল কুয়াশা। ‘আমার হাত থেকে রক্ষা নেই তোরা।’

গিলোটিনের লিভারে হাত রেখে ডগলাসের দিকে চাইল কোভাক। তার ভাবতেই ভাল লাগছে, সুন্দরী মেয়েটির মাথা থেকে ধড় আলাদা হলেই পানিতে মিশবে রক্ত। আগ্রহী হয়ে ছুটে আসবে দুই হাঙর। তীরের মত দুটো ধূসর ছায়া ওরা, হাজির হয়েছে গিলোটিনের মঞ্চের কাছেই।

‘আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমার,’ বলে উঠল ডগলাস। ‘পারলে নিজেকে বাঁচাও!’

শিকল ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে কুয়াশা, চেয়ে আছে ডগলাসের দিকে।

‘কোভাক!’ ধমকের সুরে ডাকল ডগলাস, ‘আপাতত গিলোটিনের কাজ বন্ধ। জরুরি কাজ দেব তোমাকে, আমার অফিসে এসো। ...আর হাণ্টার, চোখে মাযল ঠেকিয়ে নরকে পাঠিয়ে দাও কুয়াশাকে।’

ডগলাসের দিকে চেয়ে আছে তিশা। ভাবছে, লোকটা বদ্ধ উন্মাদ, বড় দ্রুত পাল্টে নেয় সিদ্ধান্ত।

চোখে পড়ছে উজ্জ্বল আলো, কিন্তু সামান্যতম ব্যথা পাত্তা না

দিয়েই ঘুরে চাইল কুয়াশা ডগলাসের দিকে। রাগে গনগন করছে সুদর্শন মুখ।

ডেমিয়েন ডগলাসের মৃত মাছের মত ঘোলা চোখে শীতল দৃষ্টি। মুখ যেন কোনও মুখোশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যালকনির দরজা পেরিয়ে চলে গেল নিজ অফিসের দিকে।

ইঁদুরের মুখের মত চেহারার কোভাক পিছু নিল একান্ত বাধ্য পোষা কুকুরের মত। গিলোটিনের পিছন দিকের লোহার দরজা খুলে উধাও হলো।

একইসময়ে হঠাৎ করেই কুয়াশার দিকে এগুতে লাগল ফিলিপ হান্টার, এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-এর খুনি। হাতে রূপালি রেমিংটন শটগান, পরনে কুয়াশার কালো আলখেল্লা। পকেট ভরা নানান ডিভাইস।

ব্যালকনি থেকে হাত নেড়ে বলল কার্ট কে. এবেলহার্ড, 'গাধাটার চোখে মাযল ঠেকিয়ে গুলি করতে বলেছে, তারপর খাইয়ে দেবে হাঙর দিয়ে।'

'ইয়েস, স্যর,' বলল হান্টার। 'আর কচি মালটা?'

'চাইলে রক্তাক্ত মেয়েটাকে ভোগ করতে পারো, পরে ওকে কূপের ভেতর ছেড়ে দিয়ো।'

'ইয়েস, স্যর।' খুশিতে সবক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল তার।

কুয়াশা হত্যা এবং এরপর রূপসী মেয়েটিকে ধর্ষণের দৃশ্য দেখবার জন্য অপেক্ষায় রইল রেকণ্ডো কার্ট কে. এবেলহার্ড।

গিলোটিনের মঞ্চ থেকে শুরু হওয়া সরু সেতু পেরুতে শুরু করেছে বিশালদেহী হান্টার, কয়েক সেকেন্ড পর পৌঁছে গেল কুয়াশার দেয়াল ঘেঁষা মঞ্চ। প্রতি পদক্ষেপে ছলাৎ ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠছে সাগরের অগভীর পানি।

আসছে আততায়ী, চোখ কুঁচকে আশপাশ দেখে নিল কুয়াশা।

কোনও সুযোগ নেই বাঁচবার ।
চোখে দেখছে না বললেই চলে ।
দুই হাত শিকলে বাঁধা ।
অনেক কাছে চলে এসেছে খুনি ।

ঝড়ের মত ভাবছে কুয়াশা, নীচের ঠোট এত জোরে কামড়ে
ধরেছে, রক্ত বেরিয়ে গেল । কয়েক সেকেণ্ড পর রক্ত মেশানো
থুতু ফেলল দূরে ।

ছয়ফুট দূরে থামল ফিলিপ হাণ্টার । রেঞ্জের বাইরে রয়ে
গেছে । কিছুই করতে পারবে না কুয়াশা । দুই পা দিয়ে কোমর
পেঁচিয়ে ধরা অসম্ভব । লাথি দেয়াও সম্ভব নয় অণ্ডকোষে ।

কুয়াশার রূপালি রেমিংটন তুলল হাণ্টার, শিকারের চোখের
দিকে মাযল তাক করেছে । অবিশ্বাস্য চিকন পিনপিনে কণ্ঠে
বলল, ‘আমি শুনেছিলাম তুমি বিজ্ঞানের জাদুকর । কোথায়?
কিছুই তো করতে পারলে না!’

‘আমি কে তা বুঝবে,’ থুতনি দিয়ে হাণ্টারের পায়ের দিকে
দেখাল কুয়াশা ।

ভুরু কুঁচকে ফেলল ফিলিপ হাণ্টার ।

নিজের পায়ের দিকে চাইল । পানির ভিতর ওর বুটের
পাশেই হাজির হয়েছে এক টাইগার শার্ক । এইমাত্র ওখানে রক্ত
ভরা থুতু ফেলেছে কুয়াশা ।

বাঙালি বৈজ্ঞানিক যা আশা করেছিল, ঠিক তাই হলো ।

‘আরেহ্...’ দশ ফুট হাওরের কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য
দুই পা সরে এল লোকটা ।

আর পড়ল তার চেয়েও বিপজ্জনক আরেক শিকারির
আওতার ভিতর ।

পরক্ষণে দশ নম্বর সাইক্লোনের বিপুল বেগের হাওয়ার মত
নড়ে উঠল কুয়াশা ।

চাবুকের মত উপরে ঝটকা দিয়ে উঠল ওর দেহ, পরক্ষণে পিছন থেকে দুই পায়ে পেঁচিয়ে ধরল হাণ্টারের বুকের পাঁজর। উরুর চাপ আরও বাড়ল, কুয়াশা শুনতে পেল বিশ্রী মড়াং-মড়াং-মড়াং আওয়াজ। মট-মট ভাঙছে লোকটার পাঁজরের হাড়।

প্রচণ্ড ব্যথায় গুঁড়িয়ে উঠল ফিলিপ হাণ্টার, ছটফট করছে অজগরের ভয়ঙ্কর বাঁধনের ভিতর।

তাকে নিজের কাছে সরিয়ে আনল কুয়াশা। ওর চাই ডিভাইস ভরা আলখেল্লা। পরক্ষণে একহাতে পকেট থেকে তুলে নিল মাউন্টেনিয়ারিং পিটন, ওটা বিঁধিয়ে দিল বামহাতের শিকলের উপর, ঝট করে খুলে দিল রিলিজ। প্রচণ্ড শক্তিশালী স্প্রিং ঠং আওয়াজ তুলে বিস্তৃত করল পিটনকে...

সঙ্গে সঙ্গে মড়াং করে ভাঙল পুরনো লোহার শিকলের আঙটা, মুহূর্তে খুলে গেল বামহাত।

উপরের ব্যালকনি থেকে সবই দেখছে কার্ট কে. এবেলহার্ড। অস্ত্র ঘোরাল সে কুয়াশার দিকে। কিন্তু দুই পায়ের জোরে নিজের আগে হাণ্টারকে রাখল বৈজ্ঞানিক।

তা ছাড়া, ফিলিপের কাছ থেকে আরও কিছু পাওয়ার আছে ওর।

মুক্ত বামহাতে দ্বিতীয় জিনিসটা তুলে নিল আলখেল্লার পকেট থেকে।

জিনিসটা খুদে ব্লো-টার্চের পাউচ।

ঝটকা দিয়ে থলে থেকে ব্লো-টার্চ নিল কুয়াশা, পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার। পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ জিনিসটা কাজে নামল ফিলিপ হাণ্টারের পিঠে।

জেগে উঠেছে মিনি ব্লো-টার্চ, ছিটকে বেরোল সুপারহিটেড নীল শিখা।

চিকন কিন্তু বিকট সুরে আতঁনাদ ছাড়ল ফিলিপ হাণ্টার।

গজালের মত নীল শিখা সহজেই পড়পড় করে ঢুকেছে তার দেহে, দুই সেকেণ্ড পর বেরিয়ে গেল দেহের সামনের দিক দিয়ে— যেন জ্বলজ্বলে তলোয়ার।

ফ্যাকাসে সাদা মুখে হতবাক হয়ে গেছে মৃতপ্রায় বাউন্টি হান্টার, আশ্চর্য করে এলিয়ে পড়ল কুয়াশার বুকে।

‘তুমি না খুব মজা করবে?’ চাপা স্বরে বলল বৈজ্ঞানিক। আরও ভালভাবে বাগিয়ে ধরেছে ব্লো-টর্চ। পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে লোকটার দেহের অভ্যন্তর।

কয়েক সেকেণ্ড পর একেবারে শিথিল হয়ে গেল হান্টার।

তাকে পড়ে যেতে দিয়ে একইসময়ে টান দিয়ে ফিতাহীন আলখেল্লা খুলে নিল কুয়াশা। পরক্ষণে পিটন ব্যবহার করল ডানহাতের শিকলের উপর। মটাৎ করে ভাঙল আঙটা।

ফিলিপ হান্টার ধূপ করে পড়তেই ব্যালকনি থেকে কুয়াশাকে দেখতে পেয়েছে এবেলহার্ড। অস্ত্রের মাযল তাক করল সে কুয়াশার বুকে।

কিন্তু বাঙালি বৈজ্ঞানিক এখন পুরো মুক্ত।

মৃত হান্টারের লাশের ওপাশে ক্ষিপ্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়াশা। সামনের মৃতদেহে বিঁধল একের পর এক গুলি।

কয়েক সেকেণ্ডে আলখেল্লা পরে নিল কুয়াশা, লাফিয়ে উঠেই রক্তে ভরা পানিতে টাইগার শার্কের নাকের কাছে ছুঁড়ে ফেলল লাশ। পরক্ষণে এবেলহার্ডকে হতবাক করে তুলে নিল রেমিংটন শটগান।

ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গুলি লাগল এবেলহার্ডের মাথার পাশের দেয়ালে। ছিটকে গিয়ে পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা।

দৌড়াতে শুরু করেছে কুয়াশা। গুলি করছে উপরের ব্যালকনি লক্ষ্য করে।

রেলিঙের ওপাশে লুকিয়ে পড়েছে এবেলহার্ড।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডে গিলোটিনের কাছে পৌঁছে গেল কুয়াশা। দুটো গুলি পাঠাল ব্যালকনি লক্ষ্য করে, পরমুহূর্তে রেমিংটন নামিয়ে রেখেই দুই হাতে ধরল কাঠের তাকিয়ার উপরের অংশ।

অবিশ্বাস্য শক্তি নিয়ে মড়মড় করে ভেঙে ফেলল তিশার গ্রীবার উপরের কাঠের আড়া।

‘তিশা, পিছু নাও!’ চাপা স্বরে বলল বৈজ্ঞানিক। ‘ভয় নেই!’

কূপ ও মেঝের গভীর অংশে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পানি।

ঘুরছে হাঙর।

ফিলিপ হাণ্টারের লাশ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক হাঙর, মস্ত সব কামড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে মৃতদেহ। আর তর সইল দ্বিতীয় হাঙরের, সে-ও যোগ দিল উৎসবে।

তিশা আর ছুটতে পারছে না।

দৌড়ের ফাঁকে থেমে ওকে কাঁধে তুলে নিল কুয়াশা। দেখল, আবারও ব্যালকনির রেলিঙের ওপাশে উঠছে এবেলহার্ডের মাথা।

একহাতে রেমিংটন থেকে পর পর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল কুয়াশা ব্যালকনির দিকে।

কানের কাছে গুলির জোরালো ভ্রমর গুঞ্জন শুনে আবারও লুকিয়ে পড়ল লোকটা।

তিশাকে নিয়ে গভীর পুলের পাশে পৌঁছে গেছে কুয়াশা। দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানির ভিতর।

ক্ষত-বিক্ষত লাশ নিয়ে টানাটানি করছে দুই হাঙর। রক্তাক্ত ফেনা নানাদিকে ছিটকাচ্ছে।

পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট, তারপর থামল হাঙরের দাপাদাপি। আবারও শান্ত হলো পানি।

কোথাও দেখা গেল না কুয়াশা বা তিশাকে।

ভয়ঙ্কর ডানজন বা মৃত্যু-কূপে নেই ওরা।

ছয় মিনিট পর আহত তিশাকে নিয়ে ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়নের বাইরের সাগরে খেপা ঢেউয়ের মাঝে ভেসে উঠল কুয়াশা। বাম কাঁধে তিশা, ডানহাতে পনি-বটল। ওটা থেকে অক্সিজেন দিয়েছে তিশাকে, নিজেও শ্বাস নিয়েছে।

দুর্গের নীচের শার্ক পিট থেকে গেছে দীর্ঘ প্যাসেজ, শেষে বেরিয়েছে খোলা সাগরে। ওই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সাগর-সমতলে উঠে আসতে ওই মিনি স্কুবা বটল ব্যবহার করেছে কুয়াশা।

ডানজনের কূপে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ডান কজির নির্দিষ্ট এক জায়গায় টোকা দিয়েছে। পরে আবারও ছোট্ট অপারেশন করে খুদে মাইক্রোচিপস নতুন করে অ্যাকটিভেট করবে।

সাগর-সমতলে ভেসে ওঠার পর পরই কুয়াশা দেখল, মাথার ওপর নেমে আসছে কুচকুচে কালো সুখোই এস-৩৭ ফাইটার বিমান। ওটার থ্রাস্টারের কারণে খেপে উঠেছে চারপাশের সাগর।

কয়েক সেকেন্ড পর বিমান থেকে নীচে পড়ল হার্নেস।

খুলে গেছে বিমানের বম বে।

একমিনিট পেরোবার আগেই তিশাকে নিয়ে বিমানের পেটে উঠল কুয়াশা।

‘আপনি ঠিক আছেন, বস?’ জানতে চাইল রঘুপতি। নতুন সানগ্লাস বাড়িয়ে দিল কুয়াশার দিকে।

ওটা নাকের উপর বসিয়ে নিল কুয়াশা, আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিল তিশাকে। জবাব দিল না রঘুপতির কথার, অবশ্য সামান্য মাথা দোলাল।

ককপিট থেকে বেরিয়ে এসেছে নিশাত, চমকে গেছে আহত তিশাকে দেখে, বসে পড়ল ওর পাশে।

‘তিশা!’

‘আমি ঠিক আছি, আপা,’ দুর্বল স্বরে বলল তিশা। ‘রানা... রানা... ও কোথায়?’

‘রঘুপতি, রানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছ?’ জানতে চাইল কুয়াশা। ‘মাইক্রোডট রেখেছিলাম পাম পাইলটে। ওই গুঁড়ো লাগার কথা ওর হাতে।’

‘অনেক আগেই তাকে পেয়েছি, বস,’ বলল রঘুপতি। ‘সে আছে উপকূল থেকে সামান্য দূরে এক ফ্রেঞ্চ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে। কথা বলিনি।’

মনে মনে বলল নিশাত, রঘুপতি শালাকে বলেছিলাম, তুমি ভাল রোবট, তা মোটেও না— ভাল না কচু! শালা আগেই মুখ খুললে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পেতাম।

তিশার ক্ষত পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল নিশাত।

‘বিমানে ফাস্ট এইড বক্স আছে, আপাতত তিশার পাশেই থাকুন, চিকিৎসা দেয়ার চেষ্টা করুন,’ নিশাতকে বলল কুয়াশা। চাপা শ্বাস ফেলে বলল, ‘এবার রানাকে বের করে আনতে হবে ওই জাহাজ থেকে।’

সাত

উপকূল থেকে সামান্য দূরের আটলান্টিক মহাসাগর।

ফ্রেঞ্চ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ব্রিয়া পওলাস।

হ্যাণ্ডারের পাশের এক স্টিলের ছোট ঘরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে রানাকে। পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেছে দরজা।

একটা টেবিল ও চেয়ার ছাড়া কিছুই নেই ঘরে।

রানা এখনও জানে না, টেবিলে প্লেসি মোহনির টাচলক-৯ ডিসআর্মিং ইউনিট। পাশেই উজ্জ্বল, লাল বাতি জ্বলে বসে আছে ফসফরাস গ্রেনেড।

ঘরের এক কোণে কালো কাঁচের ওপাশে ক্যামেরার ঝিরঝির আওয়াজ শুনল রানা।

‘মেজর মাসুদ রানা,’ স্পিকারে ভেসে এল ডিজিএসই-এর এজেন্টের কণ্ঠ, ‘এটা খুব সহজ পরীক্ষা। আপনার সামনের টেবিলে যে ফসফরাস গ্রেনেড, তার সঙ্গে শর্টওয়েভ রেডিয়ার মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে টাচলক ইউনিট। গ্রেনেডটা ডিসআর্ম করতে হলে ব্যবহার করতে হবে ওই টাচলক ইউনিট। পরীক্ষার শেষে পৌঁছলে আপনি ডিসআর্ম কোড ব্যবহার করবেন। কোড: ১২২। মাত্র একমিনিট পর বিস্ফোরিত হবে গ্রেনেড। ...এবার আপনার সময় শুরু হচ্ছে... আর আছে উনষাট সেকেন্ড!’

ঝট করে মেঝে ছেড়ে চেয়ারে গিয়ে বসল রানা, সারা গায়ে ব্যথা। কাছ থেকে দেখতে শুরু করেছে টাচলক-৯ ইউনিট।

জিনিসটা দুই ভাগে ভাগ করা; বামদিকে রয়েছে ছোট ছোট আটটি বৃত্তাকার লাল আলোর খোপ, আর ডানদিকে একই সমান পঁচিশটা সাদা আলোর খোপ। লাল বা সাদা যে-কোনও খোপে জ্বলে উঠবে আলো, এবং পরমুহূর্তে নিভে যাবে। রানার কাজ: নিভে যাওয়ার আগেই আলোকিত খোপ আঙুল দিয়ে স্পর্শ করা। এই প্যানেলের নীচে রয়েছে অনিয়মিতভাবে সংখ্যা লেখা বারোটি চাবি। বাতি ছোঁয়ার কাজে সফল হলে ওখানে কোড টিপতে হবে। স্ক্রিনে সঠিক কোড লেখা হলেই ডিজআর্ম হবে গ্রেনেড।

মেইন স্ক্রিন ভরে উঠছে সাদা ও লাল বৃত্তে— বামে লাল, ডানদিকে সাদা। নীচের স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে বার্তা:

ফাস্ট প্রটোকল (প্রক্সিমিটি): স্যাটিসফাইড.
ইনিশিয়েট সেকেন্ড প্রটোকল ।

এবার মাইন স্ক্রিনে দপদপ করতে শুরু করেছে সাদা বৃত্ত—
প্রতিটি বৃত্ত মুহূর্তের জন্য টিপটিপ করছে। প্রতিবার সামান্য
সময়ের জন্য। ধীর গতিতে র‍্যাগুম সিকিউয়েন্স চলছে:

সেকেন্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):
ফেইল ডিসআর্ম অ্যাটেম্পট।
রেকর্ডেড।

থ্রি ফেইল ডিসআর্ম অ্যাটেম্পট উইল
রেজাল্ট ইন ডিফল্ট ডেটোনেশন।

সেকেন্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):
রি-অ্যাকটিভেটেড।

‘আশ্চর্য তো!’ স্ক্রিনের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করল রানা।

‘আর পঞ্চাশ সেকেন্ড, মেজর,’ জানিয়ে দিল মোহ্নি। ‘নিয়ম
মেনে সঠিক সময়ে ওই গোল বাতিগুলো স্পর্শ করুন।’

‘বুঝলাম।’

আবারও জ্বলতে শুরু করেছে সাদা বৃত্ত। একের পর এক।

‘চল্লিশ সেকেন্ড...’

দ্রুত হতে শুরু করেছে সাদা বৃত্তের সিকিউয়েন্স। বৃত্তের
সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলছে রানার আঙুলগুলো। স্ক্রিনে একটি করে
বৃত্ত স্পর্শ করছে।

হঠাৎ করেই বামদিকের ডিসপ্লেতে জ্বলজ্বল করে উঠল
একটা লাল বৃত্ত।

ওটার জন্য তৈরি ছিল না রানা। কিন্তু স্পর্শ করেছে সঠিক
সময়ে। আগের মতই জ্বলতে এবং নিভতে লাগল সাদা বৃত্ত,
গতি বাড়ছে আরও। ওগুলোর সঙ্গে বেড়ে গেল রানার আঙুল
নড়বার গতি।

‘ত্রিশ সেকেন্ড... ভালই তো করছেন, মেজর।’

জ্বলে উঠেছে আরেকটা লাল বৃত্ত।

এবার অনেক দেরি করে ফেলেছে রানা।

জোরালো বিপ্ আওয়াজ ছাড়ল স্ক্রিন:

সেকেন্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):
ফেইল্ড ডিসআর্ম অ্যাটম্পট রেকর্ডেড।

থ্রি ফেইল্ড ডিসআর্ম অ্যাটম্পটস্ উইল
রেজাল্ট ইন ডিফল্ট ডেটোনেশন।

সেকেন্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):
রি-অ্যাকটিভেটেড।

‘ধুশ্শালা!’ বিড়বিড় করল রানা। চট করে দেখে নিল টেবিলে
পড়ে থাকা গ্রেনেড। তারপর ভুলে গেল ওটার কথা।

আবারও সাদা বৃত্ত জ্বলতে-নিভতে শুরু করেছে। শেষ বা
তৃতীয়বারের জন্য চালু হয়েছে সিকিউয়েন্স।

‘পঁচিশ সেকেন্ড বাকি...’

কিন্তু এবার পুরোপুরি তৈরি রানা, জানা হয়ে গেছে কী
করতে হবে। স্ক্রিনের উপর নাচতে লাগল ওর আঙুল। এক

একটা সাদা বৃত্ত জন্ম নিতেই চট করে স্পর্শ করছে। একইভাবে
আঙুল নাচতে লাগল লাল বৃত্তের উপর।

‘দশ সেকেন্ড... নয়...’

এবার বৃত্তের গতিতে জ্বলতে লাগল বৃত্ত। মুহূর্তে জ্বলছে
লাল বৃত্ত, পরক্ষণে আবার যে-কোনও সাদা বৃত্ত— কি-বোর্ডে
টাইপ করবার মত করে দ্রুত চলছে রানার আঙুল। তারই ফাঁকে
ভাবল, পরীক্ষা চলছে আমার রিফ্লেক্সের।

‘আট... সাত...’

ডিসপ্লে থেকে চোখ সরাল না রানা। নেচে চলেছে ওর
আঙুল। ডান চোখে এসে পড়ল এক ফোঁটা ঘাম।

‘ছয়... পাঁচ...’

নেচে চলেছে জ্বলন্ত সব বৃত্ত।

সাদা-লাল-সাদা-সাদা-লাল-সাদা...

‘চার... তিন...’

স্ক্রিনে লাফিয়ে উঠল একটা মেসেজ:

সেকেন্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):

স্যাটিসফায়েড।

থার্ড প্রটোকল (কোড এন্ট্রি):

অ্যাকটিভ।

প্লিয এন্টার অথোরাইজড

ডিসআর্ম কোড।

‘দুই...’

কিপ্যাডে বিদ্যুৎবেগে টাইপ করল রানা, টিপে দিল এন্টার।

ছোট স্ক্রিনে ভেসে উঠল সংখ্যা।

‘এক....’

একইসময়ে রানা টের পেল, কাজ হয়েছে।

থার্ড প্রটোকল (কোড এণ্ট্রি):

স্যাটিসফায়েড।

ডিভাইস ডিসআর্মড।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে।

কিন্তু আচমকা খুলে গেছে দরজা, ঘরে এসে ঢুকল প্লেসি মোহনি। হাততালি দিল বাচ্চাদের মত করে।

‘বাহ, সাবাশ মেজর রানা! বাহ! ভেরি গুড!’

মোহনির পিছনে ঘরে এসে ঢুকেছে দুই গুপ্তারের মত নেভাল কমাণ্ডো, দাঁড়িয়ে গেল রানার দুই পাশে।

খুশি মনে হাসল মোহনি। ‘সত্যিই চমৎকৃত হয়েছি। থ্যাঙ্ক ইউ, মেজর। আমরা ম্যাজেস্টিক-১২-র দাবি সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। প্রশংসা না করে পারছি না এই ডিসআর্ম সিস্টেমের। সন্দেহ কী, ওটা ভবিষ্যতে বছরছর নানান কাজে ব্যবহার করবে রিপাবলিক অভ ফ্রান্স। সত্যিই দুঃখজনক যে আপনাকে শেষ করে দিতে হবে। বয়েজ, মেজর রানাকে আবারও হ্যাণ্ডারে নিয়ে যাও। ওঁকে ঝুলিয়ে দেবে অন্যজনের পাশে।’

পাঁচ মিনিট পেরোবার আগেই হ্যাণ্ডারের ভেতর মৈঝে থেকে তিন ফুট উপরে ভেসে উঠল মাসুদ রানা। ফোর্কলিফটের লিফটিং প্রভের দুই আড়ার উপর বাঁধা দুই পা। দুই কজির দুই হ্যাণ্ডকাফ আটকে দেয়া হয়েছে ভেহিকেলের ভার্টিকাল স্টিল রানারের সঙ্গে।

ব্রিগা পওলাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের নির্জন মেইন হ্যাণ্ডার বে-র এক কোণে পার্ক করা হয়েছে এই ফোর্কলিফট। সামনে বেশ কয়েকটা রাফায়েল ফাইটার জেটের একযস্ট। একটা

ফাইটারের সামনে অর্ধচন্দ্রের মত করে চেয়ার ফেলা হয়েছে, সেখানে বসেছে তিন ফ্রেঞ্চ মিলিটারি অফিসার ও ডিজিএসই এজেন্ট।

রানাকে পাহারা দেয়া এক গার্ডকে খুশি খুশি স্বরে বলল প্লেসি মোহনি, ‘যাও, নিয়ে এসো ব্রিটিশ গুপ্তচরটাকে।’

পাশের দেয়ালে একটা বাটন টিপল লোকটা, আর তখনই উপরের দিকে উঠতে লাগল দেয়াল। বাস্তবে ওটা প্রকাণ্ড একটা স্টিলের দরজা। ওখান দিয়ে বেরোয় ফাইটার বিমান।

ওদিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আঁধার থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় ফোর্কলিফট। ওটার লিফটিং প্রঙে বন্দি আরেক লোক।

ঠিক রানার মত করেই ক্রুসিফাই করা হয়েছে তাকেও।

তফাৎ, এ লোকের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হয়েছে।

মুখ-হাত রক্তাক্ত, শুকনো রক্তে খয়েরি হয়ে গেছে শার্ট। বুকের উপর নেমে এসেছে মানুষটার খুতনি।

‘আপনি হয়তো ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট রিচার্ড কে. ডওসনকে চেনেন না, মেজর রানা,’ বলল মোহনি।

ডওসন, ভাবল রানা।

সে এমআই-৬-এর লোক।

বাউন্টি হান্ট তালিকার ভিতর ছিল।

ধরে আনা হয়েছে।

‘গত কিছুদিন ধরে এম-১২-র বিষয়ে তথ্যের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল ডওসন,’ বলল মোহনি। ‘আমরা জানতে পেরেছি, গত দু’বছর ধরে এম-১২-র চেয়ারম্যান ফ্রান্সিস ওলিফ্যান্টের কর্পোরেশনের ভিতর ঢুকে কাজ করছিল। কিন্তু ডওসন যেমন নজর রেখেছিল ওলিফ্যান্টের ওপর, ঠিক সেভাবেই তাকে খেয়াল করছিলাম আমরা।’

‘গতকাল ডওসন আমাদেরকে দিয়েছে চমৎকার কিছু ওয়া, যেগুলো না পেলেই চলত না। আমাদের জানিয়েছে, এম ১২ এ এক তরুণ সদস্যের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সিস ওলিফ্যান্ট। আর সে সদস্য আবার আমাদের বন্ধু ডেমিয়েন ডগলাস।’

‘ডওসনের বক্তব্য অনুযায়ী, ফ্রান্সিস ওলিফ্যান্ট বারকয়েক বলেছে, “ওই ছোকরা ডগলাস বিরক্ত করছে নতুন করে প্ল্যান করার জন্য।”’

‘এদিকে ডেমিয়েন ডগলাস মনে করছে ম্যাজেস্টিক-১২-র প্ল্যান যথেষ্ট দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নয়। আপনার তদন্ত অনুযায়ী, মেজর রানা, কী মনে হয়, নতুন করে প্ল্যান করা উচিত?’

‘ডেমিয়েন ডগলাস আপনাদের বন্ধু মানুষ,’ শুকনো গলায় বলল রানা। ‘তাকেই না হয় জিজ্ঞেস করুন।’

‘দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্সের কোনও বন্ধু নেই।’

‘কারণটা বুঝতে পারছি।’

‘সহকারী রয়েছে আমাদের,’ বলল মোহনি। ‘কিন্তু শত্রুদের মত করেই তাদের ওপরেও নজর রাখা হয়।’

‘আপনি ডগলাসকে বিশ্বাস করেন না,’ মন্তব্য করল রানা।

‘এক সেকেন্ডের জন্যেও না।’

‘অথচ তাকে রক্ষা করছেন, যা খুশি করতে দিচ্ছেন— কেন?’

‘যতক্ষণ আমাদের স্বার্থ এক, অসুবিধা কী? ...কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমাদের স্বার্থ আলাদা হতে শুরু করেছে।’

‘আপনারা এখন ভাবছেন, ও নাচাতে শুরু করেছে,’ বলল রানা।

‘ঠিকই বলেছেন।’

চুপ করে পরিস্থিতি বুঝতে চাইছে রানা। কয়েক মুহূর্ত পর

বলল, ‘ম্যাজেস্টিক-১২-র লিয়ার্ড মিসাইল তাক করা হয়েছে
প্যারিসের দিকেও।’

‘হ্যাঁ। তা আমরা জানি। এ জন্যে তৈরি ছিলাম। আমাদের
দেশ খোঁজখবর রেখেছে ম্যাজেস্টিক-১২-র বিষয়ে। আর সে
কারণেই গ্লোবাল জিহাদের টেরোরিস্টদের লাশ জোগাড় করে
দিয়েছি আমরা। মিসাইলের আঘাতে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে
আমেরিকা, জার্মানি ও ব্রিটেন। শেষে থাকবে পশ্চিমা সুপার-
পাওয়ার বলতে শুধু ফ্রান্স। তখনই সবাই জানবে, আমাদের এই
দেশ ঠেকিয়েছে বদমাশদেরকে।

‘মিসমার হবে নিউ ইয়র্ক, বার্লিন এবং লণ্ডন, কিন্তু কিছুই
হবে না প্যারিসের। এবং ফ্রান্স একমাত্র দেশ, যে ঠেকাবে
টেরোরিস্ট মিসাইল।

‘সেপ্টেম্বর এগারোর পর পাল্টা হামলা করতে তিন মাস
সময় লেগেছে আমেরিকার। একবার ভাবুন কমপক্ষে পাঁচটা মস্ত
শহর নিশ্চিহ্ন হলে ওরা কেমন হতবাক হবে? কিন্তু এসব ভয়ঙ্কর
হামলা থেকে নিরাপদ থাকবে ফ্রান্স। পশ্চিমা একমাত্র রাষ্ট্র, যেটা
ঝড়ের মত কাজ করবে। একমাত্র দেশ, যা প্রভাবশালী ও
ক্ষমতাশালী— যার কিছুই হয়নি। আর এ কারণে ফ্রান্স হয়ে
উঠবে নতুন কোল্ড ওয়ারে সত্যিকারের বিশ্বনেতা।

‘মেজর রানা, ম্যাজেস্টিক-১২-র আমাদের বন্ধুরা আশা
করছে এসব থেকে বিপুল টাকা পাবে। তাদের কাছে টাকা
মানেই ক্ষমতা। কিন্তু দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্স ওই ধরনের
ক্ষমতা চায় না। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আশা করে
ফ্রান্স। আমরা বদলে দেব বিশ্বের ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লা। আমরা
দুনিয়া চালাতে চাই।

‘বিংশ শতাব্দী ছিল আমেরিকার। সে সময়ে একের পর এক
দেশ দেউলিয়া হয়েছে। আর একুশ শতাব্দী হবে ফ্রান্সের।’

তিন সেনাপতি এবং ডিজিএসই-র এজেন্টের দিকে চেয়ে রইল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ‘আপনারা হোম গুপ্তদপ্তর দেখছেন।’

ব্রিফকেস থেকে কয়েকটা ছবি বের করল মোহনি, ভাসমান রানাকে দেখাল।

‘আলাপ চলুক। এসব ছবি মোসিউ ডগলাসের। গতবছর আফ্রিকায় তোলা হয়েছে।’

খবরের কাগজের ছবি: আফ্রিকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডেমিয়েন ডগলাস। একের পর এক ফ্যাক্টরি উদ্বোধন করছে। হাত নাড়ছে উল্লসিত জনতা।

‘সে যে কত ভাল, তা দেখাতে ওই ট্যুর করে,’ বলল মোহনি। ‘আর ওই ট্যুরে দেশগুলোর বড় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে। স্ট্র্যাটেজিকালি সিগনিফিকেণ্ট আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর ডিফেন্স মিনিস্টারদের সঙ্গেও মিটিং হয়। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে: নাইজেরিয়া, ইরিত্রিয়া, চাদ, অ্যাঙ্গোলা, ইয়েমেন এবং লিবিয়া।’

চুপ করে আছে রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল মোহনি, তারপর বলল, ‘গত বারো ঘণ্টার ভিতর নাইজেরিয়া, ইরিত্রিয়া, চাদ, ইয়েমেন এবং অ্যাঙ্গোলার এয়ারফোর্স আকাশে তুলেছে তাদের সমস্ত যুদ্ধ-বিমান। সব নেমে এসেছে লিবিয়ার পুর্বের এক এয়ারফিল্ডে। এসব দেশের এয়ারফোর্স বড় নয়। কিন্তু একইসঙ্গে আকাশে উঠলে ওই এরিয়াল আর্মাডাকে তাচ্ছিল্য করবে না কোনও দেশ। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মেজর রানা, ওরা ওখানে কী করছে?’

ভাবতে শুরু করেছে রানা।

‘মেজর রানা?’

জবাব দিল না রানা।

কানের ভিতর শুনল ডেমিয়েন ডগলাসের কথা: ‘কেউ কেউ আজও জানে না পৃথিবীর ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে ওই আফ্রিকায়।’
আফ্রিকা...

‘মেজর রানা?’ তাগাদার সুরে বলল মোহনি।

চোখ পিটপিট করল রানা। এক সেকেণ্ড পর দ্বিধা নিয়ে বলল, ‘আমি আসলেই জানি না কী করতে চায় ওরা।’

‘এই একই কথা বলেছেন মোসিউ ডওসন,’ বলল মোহনি।
‘সম্ভবনা রয়েছে, আপনারা সত্যি কথাই বলছেন। আবার এমনও হতে পারে, আপনাদেরকে একটু উৎসাহিত করা উচিত। তাতে হয়তো...’

ডওসনের ফোর্কলিফটের ড্রাইভারকে ইশারা করল সে।

‘দেরি না করে ইঞ্জিন চালু করল ড্রাইভার। কয়েক ফুট বামে সরে গেল। উঁচু করে তুলেছে ফোর্কলিফটের প্রং-দুটো। ঠিক সামনে রাফায়েল ফাইটার জেটের থ্রাস্টার। লাফ দিয়ে সিট ছাড়ল ড্রাইভার, গাড়ি থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে।

কারণটা কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল রানা।

রোওওওঅ্যাঅ্যাঅ্যারররর! আওয়াজে জেগে উঠেছে ফাইটার বিমানের ইঞ্জিন। ককপিটের ভিতর এক ফ্রেঞ্চ পাইলটকে দেখল রানা।

বিকট আওয়াজ শুনে বুক থেকে খুতনি তুলল ডওসন, দেখল ঠিক সামনে রাফায়েল ফাইটারের রিয়ার থ্রাস্টার। সামান্যতম পান্ডা দিল না। অনেক বেশি ক্লান্ত, মরে যেতেও আপত্তি নেই এখন। এত শক্তিও নেই যে হাতের বাঁধন ছিঁড়বার চেষ্টা করবে।

ককপিটের লোকটার দিকে ইশারা করল মোহনি।

লোকটা চালু করল বিমানের থ্রাস্টার কন্ট্রোল।

আচমকা রাফায়েল যুদ্ধ-বিমানের পিছনের থ্রাস্টার থেকে

ছিটকে বেরোল অবিশ্বাস্য সাদা আগুনের জিভ। গপ্ করে গিলে
নিল ডওসনকে।

ভয়ঙ্কর তাপ উড়িয়ে দিতে চাইল বিধ্বস্ত এজেন্টকে। উত্তপ্ত
হাওয়া ছিটকে লাগতেই মুহূর্তে ছাই হলো তার চুল। ঝলসে গেল
চোখ-মুখ। এক সেকেন্ডের দশভাগ সময়ে পুরো কাবাব হয়ে
গেল শরীর। মাংস পোড়া গন্ধ নাকে আসতেই বমি পেল রানার।

কয়েক সেকেন্ড পর বন্ধ হলো ফাইটার বিমানের ইঞ্জিন।
থমথম করতে লাগল হ্যাণ্ডার।

ডওসন হয়ে গেছে চারটে ঝলসানো টুকরো, ঝুলছে
ফোর্কলিফটের প্রাংগুলো থেকে।

টোক গিলতে চেষ্টা করল রানা। জিভ শুকনো।

ওর দিকে ঘুরল মোহনি। ‘এবার স্মৃতিচারণ সহজ হবে, তাই
না?’

‘ডেমিয়েন বা আফ্রিকার দেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না,’
শুকনো স্বরে আবারও বলল রানা। ‘ওই লোক বা ওসব দেশ কী
করছে আমার জানার কথা নয়। প্রথমবারের মত এসব শুনছি।’

‘তা হলে আপনাকে আর দরকার নেই আমাদের,’ বলল
মোহনি। ‘এবার অ্যাডমিরাল ও জেনারেলের উপভোগের সময়।
তঁারা আপনার আনন্দময় মৃত্যু দেখতে চান।’

রানার ফোর্কলিফটের ড্রাইভারের দিকে মাথার ইশারা করল
মোহনি। সামনে বাড়ল ভেহিকেল। থামল পোড়া ডওসনের
ফোর্কলিফটের পাশে। রাফায়েল ফাইটারের দ্বিতীয় রিয়ার
থ্রাস্টারের ঠিক সামনে থেমেছে।

থ্রাস্টারের কুচকুচে কালো গভীর গহ্বর দেখল রানা।

‘জেনারেল?’ বয়স্ক আর্মি অফিসারের দিকে চাইল মোহনি।
রানার কারণে অ্যান্টার্কটিকায় গোটা প্যারট্রুপার ইউনিট
হারিয়েছে ওই লোক। ‘চাইলে প্রতিশোধ নিতে পারেন,

• জেনারেল ।’

‘আনন্দের সঙ্গে ।’

চেয়ার ছাড়ল জেনারেল, মই বেয়ে গিয়ে উঠল রাফায়েলের ককপিটে । রানার উপর থাকল তার চোখ ।

ককপিটে ঝুঁকল সে, হাত বাড়িয়ে দিল ফ্লাইট স্টিকের দিকে । বুড়ো আঙুল চলে গেল আফটারবার্ন সুইচের সামনে ।

‘গুড বাই, মেজর রানা,’ স্বাভাবিক স্বরে বলল মোহনি ।
‘আপনাকে ছাড়াই দুনিয়াকে চলতে হবে । ভাল থাকুন ।’

জেনারেলের বুড়ো আঙুল চেপে বসল বার্ন সুইচের উপর ।

কিন্তু তখনই হঠাৎ করেই বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ হলো মেইন হ্যাণ্ডারের উপরে ।

বাজতে শুরু করেছে ক্ল্যাক্সোন ।

গোটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার জুড়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল ওয়ার্নিং লাল ইমার্জেন্সি বাতি ।

বার্নার সুইচে চাপ না দিয়ে ঘুরে চাইল জেনারেল ।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে নেভির অ্যাডমিরালের সামনে থামল এক এনসাইন । ‘স্যর! আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে!’

‘কী?’ গর্জে উঠল অ্যাডমিরাল । ‘কারা হামলা করল?’

‘মনে হয়, স্যর, একটা রাশান ফাইটার!’

‘রাশান ফাইটার? বল কী! ভুলে গেছ, এটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার! কে আসবে লড়তে? আবার বলছ একটামাত্র ফাইটার বিমান!’

ব্রিগা পওলাসের ফ্লাইট ডেকের উপর ভাসছে কুয়াশার কালো শকুন, বৃষ্টির মত চারপাশে ছুঁড়ছে বুলেট, পার্ক করা একের পর এক ফাইটার বিধ্বস্ত হচ্ছে মিসাইলের আঘাতে ।

এইমাত্র সুখোই যুদ্ধ-বিমানের ডানার নীচ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে চারটে মিসাইল, ওগুলো খুঁজে নিল চারটা টার্গেট।

ডেকে বসে থাকা এক রাফায়েল ফাইটার উড়ে গেল মিসাইলের আঘাতে। একইসময়ে ছিন্নভিন্ন হলো দুটো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল স্টেশন। চতুর্থ মিসাইল সাঁৎ করে ঢুকল মেইন হ্যাণ্ডার বে-র ভিতর। বিধ্বস্ত হলো এক অ্যাওয়ার্ড বিমান, নানাদিকে ছিটকে গেল অংশগুলো।

কালো শকুনের ককপিটে জাদু দেখাতে শুরু করেছে রঘুপতি।

ওর পিছনে গানারের সিটে কুয়াশা, রিভলভিং চেয়ারে বিমানের তিন শ' ষাট ডিগ্রি দেখছে। একের পর এক টার্গেট উড়ে যাচ্ছে বুলেট বা মিসাইলের আঘাতে।

‘নিশাত! তৈরি?’ জানতে চাইল কুয়াশা।

ককপিটের পিছনে কনভার্টেড বম বে-তে এসে দাঁড়িয়েছে নিশাত। কড়া ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে তিশাকে। নিশাতের সঙ্গে এখন এমপি-৭, এম-১৬, ডেফট ঈগল পিস্তল এবং একটা রকেট লুপ্কার প্যাক। ওটা ছিল বাউন্টি হান্টার ‘পোলিশের। শেষ অস্ত্রটা বুলিয়ে নিয়েছে পিঠে।

‘আমি তৈরি।’

‘তা হলে যান!’

খুলে গেল বম বে-র দরজা, ম্যাগজকের দড়ি ধরে সড়াৎ করে নেমে এল নিশাত।

ওদিকে ফ্রেন্ড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের কন্ট্রোল টাওয়ারে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে।

রেডিয়ো মাইকে গলা ছেড়ে চিৎকার করছে কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ানরা। তথ্য দিচ্ছে ক্যাপ্টেনকে।

‘আমাদের রেইডারের নীচেই ছিল!’

‘কোনও ধরনের স্টেলথ মেকানিয়ম...’

‘ফ্লাইট ডেকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট স্টেশনগুলোর উপর মিসাইল...’

‘দেরি না করে ক্যাটাপুল ব্যবহার করে ফাইটার...’

‘স্যর! লোপা থেকে বলছে পরিস্কার দেখছে...’

‘ফায়ার করতে বলো!’

ক্যারিয়ারের গ্রুপের একটা ডেস্ট্রয়ার থেকে নির্দেশমত রওনা হলো অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল— সোজা এল কালো শকুন লক্ষ্য করে।

গম্ভীর মুখে জানতে চাইল কুয়াশা, ‘রঘুপতি, পোলিশের বিমানের নষ্ট ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেযারগুলো ঠিক করেছে?’

‘নিশ্চয়ই, বস!’

প্রচণ্ড গতি নিয়ে কালো ফাইটারের দিকে আসছে মিসাইল।

কিন্তু একেবারে কাছে চলে আসতেই কাজ শুরু করল শকুনের ইলেকট্রনিক জ্যামিং শিল্ড। নাক ঘুরিয়ে নিল মিসাইল, ছুটল আরেকদিকে। লাগল গিয়ে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের বাইরের দিকের খোলে।

‘এস্কোর্টস! সিয় ফায়ার! সিয় ফায়ার!’ গলা ফাটাল জাহাজের ক্যাপ্টেন। ‘ওই বিমান অনেক কাছে! ইলেকট্রনিক ডিপার্টমেন্ট! খুঁজে বের করো ওটা কী ধরনের জ্যামিং করছে। নিউট্রালাইজ করো! ফাইটার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হবে ওই বিমানকে।’

রাফায়েল ফাইটারের পিছনে থ্রাস্টারের সামনে এখনও ক্রুসিফাই হয়ে ঝুলছে রানা।

হঠাৎ করেই কাত হলো প্রকাণ্ড জাহাজ। ওটার উপর আঘাত হানছে একের পর এক মিসাইল।

ফ্রেঞ্চ সেনাপতিরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রেডিয়ো নিয়ে। উপযুক্ত জবাব চাই তাদের।

অবশ্য, রাফায়াল বিমানের ককপিটে রয়ে গেছে আর্মির জেনারেল। চমক কেটে যেতেই জ্বলন্ত চোখে চাইল রানার দিকে। ঠিক করেছে, ছাড়বে না এই সুযোগ।

আবারও আফটারবার্ন সুইচের দিকে হাত চলে গেল তার। খপ করে ধরল কন্ট্রোল স্টিক। আর একইসময়ে একটা বুলেট ঢুকল তার মগজে। ককপিটের চারপাশে ছিটকে গেল ধূসর জেলি।

এত হৈ-চৈয়ের মাঝে কেউ খেয়াল করেনি ওপেন এয়ার স্টারবোর্ড এলিভেটোরের ফাঁকা জায়গা দিয়ে মাকড়সার মত করে নেমে এসেছে এক ছায়ামূর্তি।

বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা।

একহাতে এমপি-৭, অন্যহাতে এম-১৬। ঝড়ের মত ঢুকে পড়েছে হ্যাণ্ডার বে-র ভিতর। ছুটছে রানাকে লক্ষ্য করে। যেন প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে স্বয়ং দেবী মা-কালী।

রানাকে পাহারা বাদ দিয়েছে ফ্রেঞ্চ স্কোয়াড, সরে গেল ভেহিকেল ও বিমানের কাছ থেকে। ঠেকাবে নিশাতকে।

কিন্তু ভীষণ প্রলয়ের মত এসেছে নিশাত, গর্জে উঠল দু'হাতের অস্ত্র। বামে, ডানে, মাঝের লোকগুলো ছিটকে পড়ল গুলি খেয়ে।

বামের দুই গুলি শেষ করে দিয়েছে দুই প্যারাদ্রুপারের জীবন। মুখে গুলি খেয়েছে তারা। পিস্তলের মত করে এম-১৬ ডানদিকে তাক করেছে নিশাত, ওর পর পর তিনটে বুলেট ছিটকে ফেলল তিন কমাণ্ডোকে।

রাফায়াল বিমানের ডানা থেকে গুলি করল এক প্যারাদ্রুপার। ওই একইসময়ে সমারসল্ট করে আরেক দিকে সরে গেছে

নিশাত। তারই ফাঁকে ওর গুলি ঝাঁঝরা করল লোকটার বুক-
গলা।

হলুস্থলের ভিতর দুটো স্মোক গ্রেনেড ছুঁড়ল নিশাত,
সত্যিকার প্রতিশোধ-পরায়ণ প্রেতাত্মার মত ছিটকে আগে
বাড়ছে।

ধূমজালের ভিতর গুলি খেয়ে ধূপ-ধাপ মেঝেতে পড়ল চার
ফ্রেঞ্চ প্যারাট্রুপার। নিশাতের পরবর্তী গুলিতে অক্সা পেল
অ্যাডমিরাল। ডিজিএসই-র এজেন্ট হঠাৎ বুঝল, পাঁচ ব্লেডের
গুরিকেন বিঁধেছে তার অ্যাডামস অ্যাপলে। খুব কষ্ট পেয়ে মরতে
হবে তাকে।

পরের কয়েক সেকেণ্ডে রানাকে ঝুলিয়ে রাখা ফোর্কলিফটের
পাশে পৌঁছে গেল নিশাত।

‘কী খবর, ভাইডি?’

‘সুস্থ হয়ে গেলাম আপনাকে দেখে, আপা,’ হাসতে চাইল
রানা। ‘তিশার খবর জানেন?’

‘বেঁচে আছে। আপনার বন্ধু উদ্ধার করে এনেছেন ওকে
দুর্গের ভেতর থেকে।’

কুয়াশার কাছ থেকে নেয়া দুটো পিটন ব্যবহার করে রানার
হ্যাণ্ডকাফ ফাটিয়ে ফেলল নিশাত। পরের সেকেণ্ডে মেঝেতে
নামল রানা।

তবে নিশাত ওকে অস্ত্র দেয়ার আগেই প্লেসি মোহনির
দেহের পাশে পৌঁছে গেল ও। মৃতপ্রায় এজেন্টের পাশ থেকে
খপ করে তুলে নিল কী যেন। আবার চলে এল নিশাতের পাশে।
এবার ওর হাতে এমপি-৭ এবং ডেয়ার্ট ঈগল পিস্তল গুঁজে দিতে
ভুল করল না নিশাত।

‘আসুন ব্যাটারদের আচ্ছারকম সর্বনাশ করি,’ বাচ্চাদের মত
করে বলল ক্যাপ্টেন।

দু'জনের চোখে চোখ পড়তেই হেসে ফেলল রানা। খেয়াল করেছে নিশাতের পিঠে আরপিজি।

‘আপা, আপনার কথা ফেলতে পারি?’ ঘুরেই একটু দূরের জিপের দিকে দৌড় দিল রানা।

এদিকে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে টু-বাই-টু ক্যাটাপাল্ট লঞ্চিং শুরু হয়েছে। চারটা স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট রাফায়েল ফাইটার ছুটে শুরু করেছে রানওয়ে ধরে। মুহূর্তে ছিটকে উঠল আকাশে।

সামান্য গিয়েই আবারও ঘুরল ওগুলো, ভয়ঙ্কর ফর্মেশন তৈরি করে ফিরতে লাগল ভাসমান কালো শকুনকে লক্ষ্য করে।

‘ওরা আসছে, বস!’ সতর্ক করল রঘুপতি।

‘দেখেছি।’

রিভলভিং সিটে ঘুরে গেল কুয়াশা, টিপতে শুরু করেছে ট্রিগার। ভঙ্গিটা অনেকটা ভিডিয়ো গেম নিয়ে ব্যস্ত কচি ছেলেদের মত।

তীরের মত ওদের দিকে আসছে দুই রাফায়েল ফাইটার, দপদপ করে জ্বলতে লাগল কামানের মুখ।

কালো শকুনের চারপাশ দিয়ে ছুটছে অসংখ্য কমলা রঙের গুলি। আওয়াজ তুলছে হুস্-হুস্- বাতাসে গড়াতে শুরু করে সরে গেল রাশান বিমান। রিভলভিং বেলি মাউন্টেড গান দিয়ে উল্টো গুলি করছে কুয়াশা। একপলকের জন্য তিশার কথা ভাবল। অচেতন মেয়েটিকে আরামদায়ক কম্বলে মুড়িয়ে ভাল করে বেঁধে রেখেছে ওরা, কোনওদিকে ছিটকে গিয়ে আহত হবে না।

কালো শকুনের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রথম দুই বিমান, রইল শুধু দুই সনিক বুম। আসলে মনোযোগ সরিয়ে দিতে চেয়েছে তারা। আসল শো শুরু হলো এবার।

সাগরের ঢেউ ছুঁয়ে এল অন্য দুই ফাইটার, যেন গুঁতো দেবে

কালো শকুনের পিছুনে।

এখনও এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের স্টারবোর্ড এলিভেটোরের উপর ভাসছে কুয়াশার ফাইটার। চরকির মত ঘুরে গেল ওটা, মুখোমুখি হলো নতুন দুই বিমানের।

‘ধ্যাৎ!’ কাউন্টারমেয়ার স্ক্রিনে চেয়ে আছে রঘুপতি। ‘ওরা আমাদের জ্যামিং ফ্রিকোয়েন্সির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ...বারবার অন/অফ করছে। এবার আর মিসাইল জ্যাম করতে পারব না।’

নতুন দুই রাফায়েল ফাইটার থেকে দুটো করে মিসাইল ছোঁড়া হলো।

মিসাইল লক্ষ্য করে কামান দাগতে শুরু করেছে কুয়াশা। ফেলে দিল দুটো মিসাইল, কিন্তু তোপ এড়িয়ে আসছে অন্য দুই মিসাইল। প্রথমে নীচে নেমে গেল ওগুলো, তারপর আবারও উঠে এল শকুন লক্ষ্য করে।

‘রঘুপতি...’

সগর্জনে কুয়াশাদের বিমানের দিকে আসছে মিসাইল।

খেয়াল করে দেখছে রঘুপতি, একেবারে শেষসময়ে বুঝল কী করা উচিত।

বিদ্যুৎবেগে আসছে মিসাইলদুটো, এবার এসে লাগবে কালো শকুনের বুকে...

কিন্তু কালো শকুনকে আরেক দিকে সরাল রঘুপতি, সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের স্টারবোর্ডের প্রকাণ্ড এলিভেটোরের দরজা দিয়ে। ভাসতে ভাসতে জাহাজের মেইন হ্যাঙারে ঢুকে পড়েছে রঘুপতি।

ডেস্ট্রয়ার লোপার মিসাইলের সঙ্গে ইলেকট্রনিক ডিটেকশন সিস্টেম ছিল না, নিজেদের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে আঘাত হেনেছে, কিন্তু ফাইটার বিমানের মিসাইল তা নয়, জাহাজ

এড়িয়ে দূর-সাগরে গিয়ে ডুবে গেল ওগুলো। ওখানে তৈরি হলো মস্ত দুটো ফোয়ারা।

এদিকে ক্যারিয়ারের টাওয়ারে রেইডার অপারেটর হতবাক হয়ে চেয়ে রইল স্ক্রিনের দিকে। পরক্ষণে রেডিয়ো মাইকে চোঁচিয়ে উঠল: ‘হারামজাদা কোথায় গেল?’

‘কী? ...আবারও বলো...’

‘ওটা কোথায়?’ জানতে চাইল ক্যাপ্টেন। ‘ওরা কোথায়?’

‘স্যর, আমাদের জাহাজের ভেতর!’

ফ্রেঞ্চ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের গুহার মত প্রকাণ্ড হ্যাঙারে ভাসছে কালো শকুন।

‘চমৎকার, রঘুপতি!’ প্রশংসা না করে পারল না কুয়াশা। গুলি পাঠাতে শুরু করেছে পার্ক করা ফাইটার বিমান লক্ষ্য করে। বিধ্বস্ত হচ্ছে হেলিকপ্টার ও ট্রাক।

যেন কারও লিভিং রুমে আটকা পড়েছে মস্ত কোনও পাখি, হ্যাঙারের সামনে বাড়ছে কালো শকুন। ওটার ইঞ্জিনের ঝোড়ো হাওয়া আস্ত সব ফিউয়েল ট্রাক উল্টে ফেলছে দেয়ালের উপর।

চারপাশের সবকিছু ধ্বংস করতেই এসেছে রাশান ফাইটার। একবার ছাতে সামান্য ঘষা খেল পিছনের উঁচু ডানা।

‘রেডিয়োতে বলে উঠল কুয়াশা, ‘নিশাত! আপনি কোথায়?’

হ্যাঙারের পিছন লক্ষ্য করে ছুটছে একটি জিপ, গতি তুলেছে কমপক্ষে এক শ’ কিলোমিটার, এড়িয়ে যাচ্ছে উল্টে পড়া বিমান ও ট্রাককে। স্টিয়ারিং হুইলে নিশাত সুলতানা, পিছনের সিটে কুঁজো হয়ে বসেছে রানা।

‘হ্যাঙার বে-র প্রায় শেষে পৌঁছেছি, স্যর!’ বলল নিশাত, ‘উড়িয়ে দেয়ার মত কিছু পেলেন?’

‘আপনি রানাকে পেয়েছেন?’ জানতে চাইল কুয়াশা।

‘হ্যাঁ।’

‘আমরা কি আপনাদেরকে তুলে নেব?’

রানার দিকে চাইল নিশাত। ওর দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে রানা, আরপিজির প্যাক ঘাঁটছে।

‘আবারও বলছি, আপনাদেরকে তুলে নেব?’ দ্বিতীয়বার জানতে চাইল কুয়াশা।

‘না, এখনই নয়!’ গলা উঁচিয়ে বলল রানা। ‘আপা, কুয়াশাকে বেরিয়ে যেতে বলুন। দুই মিনিট পর নরক হয়ে উঠবে চারপাশ। এ জাহাজের কাছ থেকে যেন অনেক সরে যায়। আমাদের দেখা হবে বাইরে।’

‘শুনলাম,’ কয়েক মুহূর্ত পর বলল কুয়াশা। ঘুরে চাইল রঘুপতির দিকে। ‘রঘুপতি, বেরিয়ে যাও হ্যাঙার থেকে!’

‘ইয়েস, বস্,’ বলল রোবট। ‘কিন্তু...’ হ্যাঙার বে-র আরেক প্রান্তে দ্বিতীয় ওপেন এয়ার এলিভেটর চোখে পড়েছে।

সামনে বাড়ল সুখোই, পিছনে তৈরি হলো ঝড়। আর সব শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড পর পোর্ট সাইডের এলিভেটরের মাধ্যমে বেরিয়ে এল ওরা কাঁচা সোনার মত রোদে। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই।

দ্রুতগামী জিপের পিছনে আরপিজি প্যাক ঘাঁটছে রানা। একপাশে রকেট লঞ্চার, এ ছাড়া রয়েছে নানান এক্সপ্লোসিভ টিপ্‌ড রকেট চার্জ।

এক সেকেন্ড পর যেটা খুঁজছিল, পেয়ে গেল রানা।

ওটা কুখ্যাত সোভিয়েত পি-৬১ প্যালাডিয়াম চার্জ।

প্যালাডিয়াম চার্জের বাইরের খোলস প্যালাডিয়াম ধাতু দিয়েই তৈরি, কিন্তু ভিতরে রয়েছে এনহ্যান্সড হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড— এবং ওটার একমাত্র কাজ সিভিলিয়ান নিউক্লিয়ার

পাওয়ার প্লান্ট ধ্বংস করা।

নিউক্লিয়ার অস্ত্রের কোর-এ কমপক্ষে ৯০% এনহ্যান্সড ইউরেনিয়াম থাকে। সিভিলিয়ান পাওয়ার প্লান্টের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের কোর-এ রাখা হয় মাত্র ৫% ইউরেনিয়াম। এদিকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের রিঅ্যাক্টরে থাকে ৫০% ইউরেনিয়াম। ফলে সিভিলিয়ান পাওয়ার প্লান্ট বা নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের রিঅ্যাক্টর থেকে নিউক্লিয়ার এক্সপোশন হয় না। অবশ্য লিখ করতে পারে রেডিয়েশন— যেমন হয়েছিল চেরনোবিলে— ছাতির মত আকাশে ওঠে না ওই জিনিস।

প্রতি সেকেণ্ডে বেরোতে থাকে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন— ভয়ঙ্কর ফ্লেমেবল গ্যাস— ওটা ঠেকাতে ব্যবহার করা হয় রেকমবাইনার। ওটা বিপজ্জনক হাইড্রোজেন (H)কে রূপান্তরিত করে নিরাপদ (H_2O)তে।

কিন্তু প্যালাডিয়ামের সঙ্গে হাইড্রোজেন মিশলে তৈরি হয় উল্টো প্রতিক্রিয়া। বহুগুণ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে হাইড্রোজেন। সৃষ্টি হয় বিপুল পরিমাণে দাহ্য গ্যাস। ওটার সঙ্গে প্যালাডিয়াম মিশতে থাকলেই জন্ম নেবে ভয়ঙ্কর হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড।

দুই স্তরে কাজ করে পি-৬১ চার্জ ডেটোনেটর।

প্রাথমিক বিস্ফোরণ ঘটতেই মিশে যায় প্যালাডিয়াম ও হাইড্রোজেন, বিপুল পরিমাণে বাড়তে থাকে গ্যাস। এবং বোমার দ্বিতীয় স্তরে ওই গ্যাস ও অ্যাসিড জ্বলে ওঠে।

ফলাফল প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ। নিউক্লিয়ার ব্লাস্টের মত অতটা ভয়ঙ্কর নয়, তবে দুনিয়ার আর সব বোমার চেয়ে শক্তিশালী। পি-৬১ চার্জ সহজেই ফাটিয়ে দিতে পারে যে-কোনও এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের রিইনফোর্সড পুরু খোল।

‘ওদিকে চলুন, আপা! ওই যে রিঅ্যাক্টরের এগযস্ট ভেন্ট!’

হ্যাণ্ডার বে-র শেষে প্রকাণ্ড দুই সিলিন্ড্রিকাল ভেন্ট দেখল নিশাত। ভেন্টের উপরাংশে ঘুরছে মস্ত ফ্যান, জাহাজের পিছন দিয়ে বের করে দিচ্ছে বাড়তি হাইড্রোজেন।

হ্যাণ্ডার বে পেরোতে শুরু করেছে দ্রুতগামী জিপ, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে জ্বলন্ত সব ফাইটার বিমানকে।

জিপের পিছনে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, কাঁধে উপর তুলে নিল আরপিজি, তাক করল এগযস্ট চিমনির বিশালাকার ফ্যানে।

‘আমি ফায়ার করার পর, আপা, ছুটবেন উপরে যাওয়ার র‍্যাম্প লক্ষ্য করে! বড়জোর তিরিশ সেকেণ্ড, তারই ভেতর প্রথম স্তরের রিঅ্যাকশন শেষে শুরু হবে দ্বিতীয় স্তর! মনে রাখবেন, তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে!’

‘ঠিক আছে!’

লঞ্চারের সাইটের মাধ্যমে টার্গেট স্থির করল রানা। ‘নিপাত যাক রিপাবলিক অভ ফ্রান্স,’ মনে মনে বলল।

টিপে দিল ট্রিগার।

দুপ্ আওয়াজ ছাড়ল লঞ্চার। হ্যাণ্ডারের উপরের অংশের দিকে রওনা হয়ে গেল প্যালাডিয়াম টিপ্‌ড আরপিজি। তীরের মত চলেছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে সরল রেখার ধোঁয়ার লেজ।

ডানদিকের এগযস্ট ভেন্টের ফ্যান উড়িয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল প্যালাডিয়াম চার্জ, নীচের দিকে রওনা হয়ে হারিয়ে গেল। উত্তাপ খুঁজছে ওটা।

আরপিজি রওনা হতেই অ্যাক্সেলারেটর মেঝেতে টিপে ধরেছে নিশাত, চরকির মত জিপ ঘুরিয়ে নিয়েই উঠতে লাগল সুড়ঙ্গের মত র‍্যাম্প বেয়ে। খাড়া এ পথ উপরের ডেকে যাওয়ার।

বারবার বাঁক নিয়ে ঘোরানো পথে ঝড়ের গতিতে র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে জিপ।

তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে পিছলে যেতে চাইছে ঢাকা। তারই
ভিতর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের পেটের অভ্যন্তর থেকে গুনতে
পেল ওরা চাপা বুম্ আওয়াজ।

টার্গেটে লেগেছে প্যালাডিয়াম চার্জ।

স্টপওয়াচ চালু করল রানা।

০০.০১...

০০.০২...

ব্রিয়া পওলাসের আকাশে চার রাফায়েল ফাইটারের সঙ্গে
ডগফাইটে ব্যস্ত কালো শকুন। বাতাসে শৌ-শৌ আওয়াজ
তুলে বারবার বাঁক নিচ্ছে। তারই ফাঁকে মিসাইল ছুঁড়ে উড়িয়ে
দিল এক রাফায়েল ফাইটার। ওটাই ছিল কালো শকুনের শেষ
মিসাইল।

কসোল থেকে তীক্ষ্ণ বীইইইপ! আওয়াজ পেল রঘুপতি। নিচু
স্বরে বলল, ‘ওরা পুরো বুজে দিয়েছে আমাদের কাউন্টারমেয়ার
ফ্রিকোয়েন্সি! শেষ হয়ে গেছে মিসাইল শিল্ড!’

তখনই ওদের বিমানের পিছু নিল এক রাফায়েল ফাইটার।
সাগরের উপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলেছে দুই বিমান। সুখোই-
এর লেজের কাছে পৌঁছে গেছে রাফায়েল, ছুঁড়ছে কমলা রঙের
ট্রেসার।

কালো শকুন ছুটছে তুমুল গতি তুলে, তারই ভিতর রিভলভিং
গানার সিটে ঘুরে বসল কুয়াশা। টিপে ধরেছে ট্রিগার, ব্যবহার
করছে বিমানের পেটের নীচের রিভলভিং গান। এক বাঁক গুলি
ঝাঁঝরা করে দিল ফ্রেন্ড ফাইটারের ককপিট। ছিটকে উড়ে গেল
ওটার ক্যানোপি। তার আগেই লাশ হয়ে গেছে পাইলট। নাক
নিচু করে সাগরে গিয়ে পড়ল যুদ্ধ-বিমান। বিস্ফোরিত হলো
বিপুল পানি, সঙ্গে বিকট আওয়াজ।

‘বস্!’ হঠাৎ বলল রঘুপতি, ‘সামনের দিকের অস্ত্র লাগবে! এখনই!’

সিটসহ ঘুরে গেল কুয়াশা, দেখল এইমাত্র পড়ে যাওয়া রাফায়েলের পিছনে ছিল আরও দুটো ফ্রেঞ্চ ফাইটার!

এবার মিসাইল লঞ্চ করবে রাফায়েল ফাইটার...

এক সেকেন্ড পর কুয়াশা দেখল, বিমানের ডানা থেকে রওনা হয়েছে ধোঁয়ার দুটো আঙুল, সোজা আসছে কালো শকুনকে লক্ষ্য করে।

আকাশে গড়াতে শুরু করেছে রঘুপতি, ব্যবহার করল সেকেন্ডারি কাউন্টারমেয়ার: ওই সিস্টেমকে বলা হয় প্লাযমা স্টেলথ। আসলে আইয়োনাইজড গ্যাসের পার্টিকেল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় বিমান। ওটা ছোট একটা মেঘ যেন।

অনেক কাছে এসেও বিভ্রান্ত হলো দুই মিসাইল, ভি-এর মত দু’দিকে রওনা হলো আইয়োন মেঘ দেখে। সুখোই থেকে ছিটকে সরছে মিসাইল, এক সেকেন্ড পর দেখা গেল প্রথমটা প্রচণ্ড গতি নিয়ে নামল সাগরে। দ্বিতীয়টা ঘুরে গেল আকাশে, ছুটতে লাগল।

এখনও ছুটে আসছে দুই রাফায়েল ফাইটার, তাদের সঙ্গে কলিশন কোর্সে রয়ে গেছে কুয়াশার বিমান।

ঝট করে ঘুরেই গুলিবর্ষণ শুরু করল কুয়াশা।

উড়ে গেল একটা রাফায়েল বিমানে বামদিকের ডানা। এক সেকেন্ড পর বিকট আওয়াজ তুলে দুই বিমানকে বিদ্যুৎবেগে পিছনে ফেলল রঘুপতি।

অবশিষ্ট রইল একটি মাত্র রাফায়েল ফাইটার, কিন্তু সেটাও টিকল না। কুয়াশার বিমান ওটাকে পেরোবার পর পরই নিজের মিসাইলের আঘাতে দুই টুকরো হলো ফ্রেঞ্চ বিমান। ওই শেষ মিসাইল সুখোই-এর প্লাযমা স্টেলথ মেকানিসমকে এড়িয়ে

গিয়েছিল, কাছেই আরেকটা বিমান দেখে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি।

শেষ বিস্ফোরণ দেখবার জন্য ঘুরে চাইল কুয়াশা ও রঘুপতি। কিন্তু এমনসময় ভারী বুন্! আওয়াজ পেল ওরা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের দিক থেকে।

‘গতি আরও বাড়ান, আপা!’ রানা চেয়ে আছে স্টপওয়াচের দিকে।

০০.০৯...

০০.১০...

বিদ্যুদ্বিগ্নে র্যাম্প বেয়ে উঠছে জিপ।

হঠাৎই পোর্টে ত্রিশ ডিগ্রি কাত হয়ে গেল প্রকাণ্ড জাহাজ।

‘যেতে থাকুন, আপা!’ তাড়া দিল রানা।

প্যালাডিয়াম চার্জের প্রথম আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাইড্রোজেন রেকমবাইনার। ওই আওয়াজ গম্ভীর।

তার মানে ক্যারিয়ারের কুলিং টাওয়ারে বিপুল ড্রাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে তুমুল গতি তুলে। ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর প্যালাডিয়াম চার্জ ডেটোনেট করবে, আগুন ধরিয়ে দেবে হাইড্রোজেনে। ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের।

০০.১১...

০০.১২...

র্যাম্প বেয়ে উঠে সোনালী রোদে বেরিয়ে এল জিপ, কড়া ব্রেক কষে থেমে গেল।

হুলুস্থুল চলছে ফ্লাইট ডেকে।

ধোঁয়া উঠছে বিধ্বস্ত বিমান থেকে, একই অবস্থা অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানগুলোর। মারা পড়েছে বেশ কয়েকজন নাবিক। নাকের উপর ভর করে কুর্নিশ দিচ্ছে এক রাফায়াল ফাইটার— ভেঙে গেছে সামনের হুইল। ওটার কারণে ব্রিগা পওলাসের

দ্বিতীয় টেকঅফ রানওয়ে কাজে আসবে না। ওই বিমান টেকঅফ করতে রওনা হয়েছিল, এমনসময় কমলো শকুনের মিসাইল ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

চট করে পরিস্থিতি বুঝে নিল রানা।

‘আপা! কুর্গিশ করা বিমানের দিকে চলুন!’

‘উড়বে না তো!’ পাল্টা চেষ্টা নিশাত।

০০.১৫...

০০.১৬...

হলুস্থলের ভিতর ভাঙা বিমানের পাশে পৌঁছে গেল জিপ। নিশাত ঠিকই বলেছে, সামনের হুইল ভেঙে পড়ায় আর উড়তে পারবে না ওই বিমান।

০০.১৭...

০০.১৮...

‘আমি ওই বিমান ওড়াতে চাই না,’ বলল রানা, ‘এটা ওড়াতে চাই।’

লাফ দিয়ে জিপ থেকে নামল ও, উবু হয়ে তুলে নিল ক্যাটাপুল্ট হুক। বিধ্বস্ত বিমানের সামনের হুইলের সঙ্গে যুক্ত ছিল ওটা। ট্র্যাপেযোইডাল ক্যাটাপুল্ট হুক, বাষ্পচালিত ক্যাটাপুল্ট নয়। এই জিনিস ফ্লাইট ডেকের শুরু থেকে গুলতির মত ছুঁড়তে হয়। নব্বুই মিটার ব্যবহার করে বিমান আকাশে তুলে দেয়।

রানা দেরি না করে ক্যাটাপুল্ট হুক আটকে দিল জিপের সামনের অ্যাক্সেলে, হকের অন্য অংশ গেল ডেক ক্যাটাপুল্টে।

০০.১৯...

০০.২০...

‘স্যর, আপনি কি ঠাটা করছেন?’ জিপের সামনের রানওয়ে দেখছে নিশাত। রানওয়ে ফুরিয়ে গেছে বো-র শেষে। তারপর

বহু দূরে দিগন্ত । ফ্লাইট ডেকে পেতে রাখা হয়েছে ক্যাটাপুল্টের
রেইল । যেন দুই রেল লাইন । শেষে খাড়া হয়ে উঠেছে
রানওয়ে ।

০০.২১...

০০.২২...

নিশাতের পাশে লাফ দিয়ে জিপে উঠল রানা ।

‘গিয়ার নিউট্রাল করুন, সিট বেল্ট বেঁধে নিন,’ বলল রানা ।

০০.২৩...

০০.২৪...

খপ্প করে তুলে সিট বেল্ট আটকে নিল নিশাত । একই কাজ
করেছে রানা ।

০০.২৫...

এমপি-৭ বের করেছে রানা, মাযল তাক করল ক্যাটাপুল্ট
কন্ট্রোলার উপর । কালো শকুনের হামলা হওয়ার পর পরিত্যক্ত
হয়েছে এদিকটা ।

০০.২৬...

মাত্র একবার ট্রিগার টিপল রানা ।

০০.২৭...

পরক্ষণে সাঁৎ আওয়াজ হলো ।

রানার গুলি লাগতেই লঞ্চ লিভার ছেড়ে দিল ক্যাটাপুল্টকে ।
জীবনে প্রথমবারের মত অত ভয়ঙ্কর গতি পেল ওই জিপ ।

নব্বুই মিটার পেরোবে মাত্র ২.২ সেকেন্ডে ।

সিটে গঁথে গেল নিশাত ও রানা । টের পেল, কোটরের
ভিতর ঢুকে যেতে চাইছে চোখ ।

অবিশ্বাস্য গতি তুলে রানওয়ে পেরোতে শুরু করেছে জিপ ।

চারপাশ ঝাপসা দেখল ওরা ।

জিপের সামনের দুই চাকা ফাটল পঞ্চাশ মিটার পেরোতেই ।

তবুও রকেটের মত চলল গাড়ি, যেন ছিটকে বেরিয়ে এসেছে কামানের ব্যারেলের ভিতর থেকে গোলা— ভয়ঙ্কর গতি তুলে দিয়েছে ক্যাটাপাল্ট ।

ফাইটার জেটের মত অত গতি পেল না জিপ, ফাইটার তার নিজের থ্রাস্টারও ব্যবহার করে ।

রানা ও নিশাত আকাশে উড়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহী নয় ।

ওরা শুধু এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে বিস্ফোরণ হওয়ার আগেই পিতৃপ্রদত্ত প্রাণ নিয়ে নেমে যেতে চাইছে ।

রানওয়ার শেষে পৌঁছে গেছে জিপ । ছিটকে উঠল আকাশের দিকে । সাঁই-সাঁই করে চলেছে বাতাস কেটে । নাক আকাশে, বনবন করে ঘুরছে চাকা । আর ওদের পিছনে ফেটে পড়ল গোটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার !

কোথাও কোনও আগুন রইল না ।

রইল না কোনও ধোঁয়ার মেঘ ।

এসবের বদলে ভয়ঙ্কর বিকট এক আওয়াজ হলো: বুম্‌বুম্‌!
থরথর করে কাঁপতে লাগল চারপাশ ।

চমকে উঠেছে যেন গোটা সাগর ।

বাইরের দিকে ছিটকে গেল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের খোল— জ্বলন্ত হাইড্রোজনের বিপুল ধাক্কা খেয়ে প্রসারিত হলো প্রতিটি ইস্পাতের দেয়াল— যেন টিভি পর্দার ইনক্রেডিবল হাল্‌ক্‌, বেরিয়ে আসছে পোশাক ছিঁড়ে ।

বিশাল নক্ষত্র বিস্ফোরণের মত করে আকাশে ছিটকে উঠল লাখ লাখ রিভেট । একমাইল দূরে পৌঁছে গেল, পরবর্তী এক মিনিট ধরে টুপটাপ সাগরে পড়ল । একটু আগে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের পিছন ডেক থেকে আকাশে উঠেছিল এক কপ্টার, রিভেট-বর্ষণে ঝাঁঝরা হয়ে গেল ওটা মাঝ আকাশে ।

প্রকাণ্ড জাহাজের আস্ত সব স্টিলের পাত গিয়ে লাগল কাছের

ডেস্ট্রয়ারগুলোর পাশে। তুবড়ে দিল জাহাজের একদিক, চুরমার হলো ব্রিজের জানালার সব কাঁচ।

ব্রিয়া পওলাসের সবচেয়ে ক্ষতি হলো পিছনদিকে। ওখানেই ছিল বিস্ফোরণের এপিসেন্টার— কুলিং ভেন্ট। জাহাজের পাত ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতেই ওখানে তৈরি হয়েছে মস্ত খোড়ল। হুড়মুড় করে ওই গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগল আটলান্টিক মহাসাগরের নীল ঢেউ।

ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় এবং সেরা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ব্রিয়া পওলাস অনানুষ্ঠানিকভাবে ডুবতে লাগল চোখের সামনে।

মস্ত জাহাজের বো থেকে আকাশে উঠেছে রানা ও নিশাতের জিপ, বাতাস চিরে ছুটেছে বহুদূর লক্ষ্য করে। ডাঙায় চলা একটা জিপ গাড়ির পক্ষে যতদূর ওড়া সম্ভব উড়ে নামতে শুরু করল নীচে। আগেই সিটবেন্স খুলে ফেলেছে রানা ও নিশাত, পানিতে পড়ার ঠিক পাঁচ সেকেন্ড আগেই দুজন দুদিকে লাফ দিল। জাহাজের ফ্লাইট ডেক থেকে পুরো পঁচিশ মিটার নীচে সাগর। কিন্তু ওরা লাফিয়ে পড়েছে বিশফুট ওপর থেকে। রানা-নিশাত সাগরে পড়বার আগেই দূরে গিয়ে ঝপাৎ করে সাগরে নামল জিপ, চার পাশে ছিটকে উঠল পানি।

দুই সেকেন্ড পর ঝপ করে সাগরে নামল রানা ও নিশাত। বেকায়দাভাবে পড়ে ব্যথা পেল, ওদের বুট আগে নেমেছে পানিতে, তীরের মত নেমে যেতে লাগল ওরা। এক সেকেন্ড পর আবছা ভাবে শুনতে পেল বিকট আওয়াজ। ওদের পিছনে বিস্ফোরিত হয়েছে জাহাজ, চারপাশে বুলেটের মত ছিটকে গেছে লক্ষ লক্ষ নাট-বল্টু-রিভেট।

দ্রুত ডুবছে বিশাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। আগে ডুবল পিছন দিক। দেখবার মতই দৃশ্য। যারা বেঁচে রইল, ছুটল লাইফ বোট সাগরে নামাতে। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেক থেকে

সাগরে। ক্যুয়েক সেকেণ্ড পর যেন লেজের উপর দাঁড়িয়ে গেল মস্ত জাহাজ, আকাশে তুলেছে বো। এরই ভিতর তলিয়ে গেছে পিছনদিক।

ওটার দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ফ্রেঞ্চ ক্যারিয়ার গ্রুপের অন্যান্য জাহাজের সবাই।

কেউ ভাবতে পারেনি এ ধরনের ফুলস্কেল ওঅর চলবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোনও দেশ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হারায়নি।

হতবাক হয়েছে বলেই হয়তো প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি হলো ফ্রেঞ্চদের। ওই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের একমিনিট পর আটলান্টিকের ঢেউয়ের দশফুট উপরে নেমে এল কালো এক রাশান ফাইটার, হার্নেসে করে বিক্ষুব্ধ পানি থেকে চটপট তুলে নিল দু'জন মানুষকে বম বে-তে।

ওই দু'জনকে তুলে নিয়েই আবারও আকাশ চিরে ছুটতে লাগল সুখোই ফাইটার, পিছন থেকে চেয়ে রইল ব্রিটা পওলাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার গ্রুপের আর সব জাহাজ।

বম বে-তে এসে ঢুকল কুয়াশা। মেঝেতে শুয়ে ছিল নিশাত, বৈজ্ঞানিককে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল।

অচেতন তিশার দিকে চাইল রানা, 'ওর জ্ঞান ফেরেনি?'

'ঘুমের কড়া ওষুধ দিয়েছি,' বলল নিশাত, 'ক্ষত ড্রেসিং করেছি। গুরুতর আঘাত, কিন্তু এখনও ইনফেকশন হয়নি।'

'প্রথমে লগুনে যাব,' সিদ্ধান্ত নিল রানা, 'তিশার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কালো শকুন এলিজাবেথ হসপিটালের সামনে নামতে পারে,' বলল কুয়াশা। 'রেডিয়ো করে রানা এজেন্সির ছেলেদের জানিয়ে দাও ওখানে থাকতে। ওরা হসপিটালে ভর্তি করবে মেয়েটিকে।'

কুয়াশার দিকে চাইল রানা। ‘ঠিক আছে। এরপর ইংলিশ চ্যানেলের দিকে কোর্স স্থির করবে রঘুপতি। ওখানেই শারবার্গে রয়েছে প্রথম নোয়া’য শিপ।’

আস্তে করে মাথা দোলাল কুয়াশা, আবারও গিয়ে ঢুকল ককপিটে। বেড়ে গেল সুখোই ফাইটার বিমানের গতি, চলেছে লগুনের দিকে।

আট

আপার নিউ ইয়র্ক বে, ইউএসএ।

অক্টোবর ১৫।

সকাল এগারোটা পঁচিশ।

চোদ্দ মিনিট আগে জেএফকে এয়ারপোর্টের টারমাক স্পর্শ করেছে ব্ল্যাকবার্ড ফাইটার জেট বিমান। আর এই মুহূর্তে মেরিন কর্পসের সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টারে বসে আছে হোসেন আরাফাত খবির। স্ট্যাচু অভ লিবার্টির উপর দিয়ে উড়ে চলেছে কপ্টার আপার নিউ ইয়র্ক বে লক্ষ্য করে। পিছনে নিউ ইয়র্কের বিস্তৃত পর্বতের মত স্টিল ও কাঁচের তৈরি প্রকৃতি।

কপ্টারের হোল্ডে খবিরের পাশে বসেছে পুরো সশস্ত্র বারোজন রেকন্যাসেন্স মেরিন।

‘ওই প্লাণ্টে টেরোরিস্টদেরকে পেয়েছেন আপনারা?’ চিৎকার করে মাইকে জানতে চাইল খবির, খানিকটা বিস্মিত। কথা বলছে ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স টিমের দলনেতা এরিক

হাডসনের সঙ্গে। তারা অভিযান করেছিল ড্রাগন প্লাণ্টে।

‘হ্যাঁ, তারা ছিল। সবাই গ্লোবাল জিহাদের লোক। তাদের সঙ্গে শাহেদ করিমও ছিল। ওখানে ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছে।’

‘গ্লোবাল জিহাদ,’ বিড়বিড় করল খবির। পরক্ষণে বলল, ‘কিন্তু এসব তো ঠিক মিলছে না...’ চুপ হয়ে গেল ও।

হঠাৎ করেই বুঝতে শুরু করেছে সব।

দোষ দেয়ার জন্য কাউকে দরকার ম্যাজেস্টিক-১২-র।

দোষ দিতে হলে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের চেয়ে ভাল প্রার্থী আর কারা হতে পারে?

ড্রাগন কর্পোরেশন কী-ই বা করবে, যদি গ্লোবাল জিহাদের টেরোরিস্টরা তাদের মিসাইল ও জাহাজ ছিনতাই করে?

কিন্তু সত্যিকারের গ্লোবাল জিহাদ টেরোরিস্টদের পাবে কী করে ম্যাজেস্টিক-১২?

‘ফ্রান্স,’ বিড়বিড় করল খবির। ‘ওরা জোগাড় করে দিয়েছে।’

পাশেই বসেছে মেরিনদের নেতা ডেভিড, কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করল, ‘খবির, আসলে এসব কী হচ্ছে? ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে সবাই। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় টেরোরিস্ট অ্যাটাক আসছে। আমাদের নিজেদের মিসাইল ফেলবে ওরা আমাদেরই ওপর।’

‘কাজটা টেরোরিস্টদের নয়, ডেভিড,’ বলল খবির। ‘এসবই চলছে ব্যবসা বড় করার জন্যে। বিশ্বাস করুন, প্লাণ্টে লড়াই শুরু হওয়ার আগেই মারা পড়েছে ওসব টেরোরিস্ট। ম্যাজেস্টিক-১২-কে গোপনে সহায়তা দিয়েছে ফ্রেন্স সিক্রেট সার্ভিস। লাশ পৌঁছে দিয়েছে। এর এদিক ওদিক হয়নি।’

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের কাছে নোঙর ফেলা কন্টেইনার শিপ ও সুপারট্যাঙ্কারগুলোর দিকে চাইল খবির। মাল বোঝাই সব জাহাজ, অপেক্ষা করছে হাডসন ও ইস্ট রিভারে ঢুকবার জন্য।

নোয়া'য শিপ প্রজেক্টের কারণে এখন যে-কোনও জাহাজ হতে পারে মিসাইল লঞ্চ ভেসেল।

‘আমরা জানব কী করে কোন জাহাজটা?’ জানতে চাইল পাইলট।

‘জিপিএস কোঅর্ডিনেটস্ ২৮৭৪৪-০৫-৪১০৫-৫৪ অনুযায়ী গেলেই ওখানে জাহাজটা পাব,’ বলল খবির।

সংখ্যাগুলো জেনে নিয়ে ডায়াল অ্যাডজাস্ট করে নিল পাইলট, জিপিএস লোকেটার অনুযায়ী এগুতে শুরু করেছে।

শতবারের মত পাম কমপিউটারে লঞ্চ লিস্ট দেখল খবির। মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলবার সময় নোয়া'য শিপের জিপিএস লোকেশন বের করেছিল চার্লস ডেলাক্রুস।

কাজটা শেষে ওরা ম্যাপে তুলে নেয় কোথায় রয়েছে জাহাজগুলো।

আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির শহরগুলোর উপর নিউক্লিয়ার টিপ্‌ড মিসাইল ফেলবে তিনটা জাহাজ। এ ছাড়া, আরও রয়েছে দুটো নোয়া'য শিপ। একটা আরব সাগরে। ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তানের উপর ফেলবে মিসাইল। অন্যটা তাইওয়ান স্ট্রাইটে। বেইজিং ও হংকঙে ফেলবে টেপ'ও-ডং আইসিবিএম।

‘আল্লা...’ ফিসফিস করল খবির। পরক্ষণে স্যাটালাইট মাইকে যোগাযোগ করতে চাইল: ‘কনলন? আপনি কোথায়? পশ্চিমে কী ঘটছে?’

প্রশান্ত মহাসাগর।

স্যান ফ্রান্সিসকো বে থেকে দুই মাইল দূরে।

স্থানীয় সময় সকাল আটটা পঁচিশ মিনিট।

নিজেও একটা সুপার স্ট্যালিয়ন কন্টারে বসে উড়ে চলেছে কেভিন কনলন, তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে মেরিন রেকন

টিম। থরথর করে কাঁপছে কেভিনের দুই হাঁটু, এ ছাড়া চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই ও ভীত।

ওর মাথার চেয়ে দেড়গুণ বড় হেলমেট পরেছে, আর যে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে, ওটা দ্বিগুণ আকারের। কোলের উপর রেখেছে রিয়াল টাইম স্যাটালাইট আপলিঙ্ক ইউনিট। বিশালদেহী সব মেরিনদের মাঝে নিজেকে ওর বাচ্চা ছেলে মনে হচ্ছে।

এ মুহূর্তে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ ছুঁয়ে ছুটে চলেছে সুপার স্ট্যালিয়ন। সামান্য দূরে স্যান ফ্রান্সিসকো উপকূলে নোঙর ফেলেছে একটি সুপারট্যাঙ্কার।

‘হাই, খবির,’ নতুন থ্রোট মাইকে গলা ছাড়ল কেভিন। ‘আমরা পৌঁছে গেছি ওই সুপারট্যাঙ্কারের কাছে। মস্ত জাহাজ। যেমন হওয়ার কথা, ঠিক তেমনই। মিলে গেছে জিপিএস কো-অর্ডিনেটস্ পজিশন। সুপারট্যাঙ্কারের নাম এমভি রুবল, রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ভার্জিনিয়ার নরফোকে। ওটার মালিক ড্রাগন শিপিং কোম্পানি, ড্রাগন কর্পোরেশনের সাবসিডিয়ারি।’

হাঁটু কাঁপা থামলে ভাল হতো, ভাবল কেভিন।

‘আর বের করেছি আপনার মার্সেন প্রাইম,’ নতুন তথ্য দিল। ‘ম্যান, সত্যিই দারুণ জিনিস ম্যাথমেটিক্সের মার্সেন নাম্বার। আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে মাত্র কিছু। এদের কোনও কোনওটা দুই মিলিয়ন ডিজিটের। খুবই রেয়ার প্রাইম নাম্বার। নির্দিষ্ট ফরমুলা অনুযায়ী পাওয়া যায়। মার্সেন প্রাইম = $2^p - 1$ যেখানে “p” হচ্ছে প্রাইম সংখ্যা। কিন্তু উত্তরও হতে হবে প্রাইম সংখ্যা। তিন সংখ্যা হচ্ছে প্রথম মার্সেন প্রাইম। কারণ $2^2 - 1 = 3$ । ২ এবং ৩ আসলে প্রাইম সংখ্যা। কত ছোট সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছেন? কিন্তু শেষে কোথায় ঠেকবে কেউ জানে না। সপ্তম মার্সেন প্রাইম ৪,৩১,১২,৬০৯। ওটার বেস

প্রাইম সংখ্যা বুঝতে পারছেন, $2^{10}-1 = 8,321,471$, তার মানে প্রাইম...

উত্তর তা হলে ৪৩...

‘৪,৩১,১২,৬০৯,’ আবারও বলল কেভিন। এবার ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছে।

‘দাঁড়ান লিখে নিই,’ বলল খবির। ‘আপনি দুটো করে সংখ্যা বলতে থাকুন।’ ওদিকের কথা শুনে খসখস করে প্যাডে সংখ্যা লিখতে শুরু করেছে ও।

কয়েক মুহূর্ত পর ‘উম্, হ্যাঁ, আর নেই,’ হতাশ স্বরে বলল কেভিন।

‘কিছুক্ষণ আগে স্যরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসেও এ কথা জানিয়ে দিয়েছি,’ বলল খবির, ‘ওই সংখ্যাগুলো স্যরকে জানিয়ে দেব। অনেক ধন্যবাদ, কেভিন।’

সিগনাল কেটে গেল।

নিজের বিশ্বাসঘাতক দুই পায়ের দিকে চাইল কেভিন।

‘এ ধরনের কাজে যাওয়ার সময় এমনই হয়, মিস্টার কনলন,’ কেভিনের কম্পমান দুই হাঁটু দেখিয়ে সান্ত্বনা দিল মেরিনদের নেতা স্কট মোসলে। ‘কিন্তু মিস্টার রানা যখন আপনাকে বিশ্বাস করেন, তার মানেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনি সক্ষম।’

‘এ কথা বললেন, তাই ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করল কেভিন।

সগর্জনে সুপারট্যাঙ্কারের দিকে ছুটছে সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার।

ইংলিশ চ্যানেল।

অক্টোবর ১৫।

ফ্রান্স উপকূল।

বাউন্টি হান্টার্স-২

বিকেল পাঁচটা পঁচিশ মিনিট।

ইউএস ই.এস.টি. সকাল এগারোটা পঁচিশ মিনিট।

এই একটু আগে লণ্ডনের এলিজাবেথ হাসপাতালের লনে নেমেছিল কালো শকুন। তিশাকে বুঝে নিয়েছে রানা এজেন্সির ছেলেরা। দেরি হয়নি হাসপাতালের কেবিন পেতে।

সময় নষ্ট না করেই আবারও ইংলিশ চ্যানেলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে রানা, কুয়াশা, নিশাত ও রঘুপতি।

এ মুহূর্তে ভাবছে রানা: এর শেষ কোথায়? বাউন্টি হাণ্টারদের দিয়ে শুরু। না, তারও আগে পনেরোজনের মৃত্যু চেয়েছে ম্যাজেস্টিক-১২। এদের কারণে মারা পড়েছে বহু মানুষ। এখন মস্ত বিপদে পড়েছে গোটা দুনিয়া। আরও ঘোঁট পাকিয়েছে ডেমিয়েন ডগলাস। পুরো দুনিয়ার ক্ষমতা চাই তার।

দূর সাগরে চোখ রেখেছে কুয়াশা, নিশাত ও রোবট রঘুপতি, চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল রানার। আবারও রেডিয়ো করেছে খবির।

‘সব তথ্য পাঠিয়ে দিচ্ছি, স্যর,’ সময় নষ্ট না করেই বলল সার্জেন্ট।

টিপ্ আওয়াজ তুলল রানার পাম পাইলট: স্ক্রিনে ভেসে উঠল খবিরের প্লট করা সমস্ত নোয়া'খ শিপের হিসাব। চোখ বিস্ফারিত হলো রানার। আরব সাগর... তাইওয়ান স্ট্রাইটস্...

‘আর আপনার জন্যে সেভেন্থ মার্সেন সংখ্যা বের করেছে কেভিন কনলন,’ বলল খবির। ‘ওটা ৪,৩১,১২,৬০৯।’ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল আবারও।

বাম তালুতে সারধানে সংখ্যা লিখে নিল রানা, তারপর বলল, ‘৪,৩১,১২,৬০৯, ঠিক আছে, খবির?’

‘কে জানে, স্যর,’ হতাশ স্বরে বলল সার্জেন্ট।

‘কেভিনকে বোলো, এসব শেষে ওর সঙ্গে দেখা করব।’

...রানা আউট।’

চ্যানেল পাণ্টে নিল রানা, প্যাচ করল লগনের ইউএস এম্বেসিতে। ‘মিস্টার ডেলাক্ৰুস, আপনাদের সাবমেরিনের কী খবর?’

কিছুক্ষণ আগে লগনে ডেলাক্ৰুসের সঙ্গে কথা হয়েছে রেডিয়োতে।

তাতে শ্বাস ফেলে স্বস্তি পেয়েছে ভদ্রলোক। যোগাযোগ করে ওয়াশিংটনে জানিয়ে দিয়েছে, মাসুদ রানা সুস্থ আছেন।

‘আমার কাছে ভাল-খারাপ, দু’ধরনেরই খবর আছে,’ বলল ডেলাক্ৰুস।

‘ভাল খবর আগে দিন।’

‘ভাল খবর হচ্ছে, আমাদের লস এঞ্জেলস-ক্লাস অ্যাটাক সাবগুলো আছে আরব সাগর ও তাইওয়ান স্ট্রাইটে। প্রয়োজন পড়লে সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চ-বোটগুলোকে ডুবিয়ে দেবে।’

‘এবার খারাপ সংবাদ?’

‘আর খারাপ সংবাদ হচ্ছে: সঠিক সময়ে অন্য তিন লঞ্চ বোট, মানে নিউ ইয়র্ক, স্যান ফ্রান্সিসকো এবং ইংলিশ চ্যানেলের জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না আমাদের সাবমেরিন। এরা অনেক আগেই উৎক্ষেপ করবে মিসাইল। খবির আর কনলনকে গিয়ে উঠতে হবে ওই দুই জাহাজে, ডিসআর্ম করতে হবে মিসাইল।’

‘বুঝলাম,’ বলল রানা।

‘পেয়ে গেছি!’ নিচু স্বরে বলল রঘুপতি। খেপা সাগরে নোঙর করা এক সুপারট্যাঙ্কারের দিকে আঙুল তাক করেছে। এদিক ওদিক দুলছে মস্ত জাহাজ।

হাওয়া ছেড়েছে বেশ। কাত হয়ে উৎক্ষিপ্ত বর্শার মত নামছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। ধূসর আকাশ চিরে দিল গাঢ় নীল বিদ্যুৎ

ঝিলিক। খেপে উঠেছে সাগর। এদিক-ওদিক দুলছে প্রকাণ্ড জাহাজ। শক্তিশালী ফ্লাডলাইটে ভাসছে প্রকাণ্ড ডেক। ফ্রান্সের উপকূলে ওই জাহাজের মত মাল খালাস করবার জন্য অপেক্ষা করছে আরও অনেক জাহাজ।

ট্রান্সপণ্ডার সিগনাল আইডেনটিফাই করে বুঝেছি, ওটাই এমভি লোটাস, জিপিএস লোকেশনও মিলে গেছে।’

‘গুড ওঅর্ক, রঘুপতি,’ বলল রানা। ‘মিস্টার ডেলাক্রুস, আপনার সহায়তার জন্যে ধন্যবাদ। এবার কাজে নামতে হবে আমাদেরকে।’

কুয়াশা ও নিশাতের দিকে ঘুরে চাইল রানা। ‘ধরে নিতে পারি ওরা বাধা দেবে। সেক্ষেত্রে গোলাগুলি হবে। এটা প্রথম জাহাজ, এটার মিসাইল ঠেকাতে পারলে দূর থেকেও অন্য জাহাজের মিসাইল ডিসআর্ম করতে পারব। কারও কোনও প্রশ্ন?’

‘আমার কোনও প্রশ্ন নেই,’ বলল কুয়াশা।

‘দিন শেষে সব ভাল হোক,’ মন্তব্য করল নিশাত।

‘তা হলে তৈরি হয়ে নিন, আপা। আমরা জাহাজে নামছি,’ গম্ভীর সুরে বলল রানা।

নয়

ইংলিশ চ্যানেল।

স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

নিউ ইয়র্ক সময় অনুযায়ী সকাল সাড়ে এগারোটা।

মস্ত শকুনের মতই সুপারট্যাঙ্কারের ডেকের দশমুঠি উপরে নেমে এল সুখোই ফাইটার বিমান; ভাসতে লাগল এমেরের মাথা। উজ্জ্বল ফ্লাডলাইটে ওটাকে মনে হলো ভয়ঙ্কর টেরোডাকটিল।

খুলে গেল কালো শকুনের বম বে, রেপেল করে ডেকে নোমে এল তিন মূর্তি: মাসুদ রানা, কুয়াশা ও নিশাত সুলতানা।

প্রত্যেকে সশস্ত্র। হাতে এমপি-৭, গ্লক পিস্তল অথবা দোনলা পার্ভি শটগান। এসবই পাওয়া গেছে পোল্যাণ্ডের হাউন্টি হাণ্টার পোলিশের বিমানের হোল্ডে। রঘুপতির বাম পা-র উরু খুলে রানা ও নিশাতের জন্য দুটো ভেস্ট বের করে দিয়েছে কুয়াশা। ভেস্টদুটোর পকেট ভরা নানান যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র।

এমভি লোটাসের দীর্ঘ ফোরহেড-এ নেমেছে ওরা, সামনেই কন্ট্রোল টাওয়ার। বিকট আওয়াজ তুলে ওদের মাথার উপর থেকে বৃষ্টিভেজা আকাশে হারিয়ে গেল কালো শকুন।

পরের সেকেন্ডে ওদের চারপাশে ফুলকি তুলল অসংখ্য বুলেট।

কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করছে দুই স্লাইপার।

নিউ ইয়র্ক বে, ইস্ট কোস্ট, আমেরিকা।

আটলান্টিকের আরেকপ্রান্তে একইসময়ে সুপারট্যাঙ্কার এমভি করপোরেশনে ঝটিকা হামলা করেছে খবির এবং মেরিন যোদ্ধারা।

রানাদের মতই, যিপলাইন ব্যবহার করে কন্টার থেকে নেমে এসেছে সুপারট্যাঙ্কারের ফোরডেকে।

রানার দলের মত করেই ভারী গুলিবর্ষণের মুখে পড়ল ওরা।

কিন্তু রানাদের মত আঁধার ও বৃষ্টির কারণে সুবিধা পাওয়ার উপায় নেই খবিরদের। সকাল সাড়ে এগারোটা। কটকটে রোদে কুঁচকে যাচ্ছে চোখের পাতা।

করপোরেশনের ব্রিজে অপেক্ষা করছিল দুই স্নাইপার,
খবিররা দড়ির শেষে নেমে আসবার আগেই গুলি শুরু করেছে
তারা।

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়েছে দুই মেরিন, মৃত।

ধূপ করে ডেকে পড়েই পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করল খবির।

স্যান ফ্রান্সিসকো, ওয়েস্ট কোস্ট, ইউএসএ।

পশ্চিম উপকূলে সুপারট্যাঙ্কার এমভি রুবল দখল করতে
ঝড়ের গতিতে সামনে বাড়ছে কেভিন কনলনের সঙ্গী মেরিনরা।

কন্ট্রোল টাওয়ারের দুই স্নাইপারের তরফ থেকে পাল্টা গুলি
আসেনি।

আগেই স্কট মোসলের সৈনিকরা বুঝে গিয়েছিল অ্যান্শুশ
হবে।

সুপার স্ট্যালিয়নের দরজা থেকেই দলের ক্র্যাক গুটার গেঁথে
ফেলেছে দুই শত্রু স্নাইপারকে।

সুপারট্যাঙ্কারের কন্ট্রোল টাওয়ারের ছাতে ধূপধাপ নেমে
এসেছে সবাই। কেভিনকে মাঝে আগলে রেখে ঝটিকা হামলা
শুরু করেছে মেরিনরা।

জাহাজের হাই ভিজিবিলিটি ব্রিজ উইণ্ডোর পাশে স্নাইপারদের
লাশ পেল ওরা।

দুই স্নাইপার কৃষ্ণ বর্ণের। পরনে আফ্রিকার খাকি মিলিটারি
ফ্যাটিগ।

লাশদুটোর কাঁধের ইনসিগনিয়া অবাক করল মোসলেকে।
'আসলে হচ্ছেটা কী?'

দুই স্নাইপারের পোশাকে যে ব্যাজ রয়েছে, তা ইরিত্রিয়ান
আর্মির।

ইংলিশ চ্যানেল ।

ঝলসে উঠেছে বিদ্যুচ্চমক । সুপারট্যাঙ্কারের খোলে এসে পড়ছে প্রকাণ্ড সব ঢেউ । মাঝে মাঝেই সাঁৎ করে নীল-হলুদ বজ্র নেমে আসছে সাগরের বুকে, সেই সঙ্গে বিকট গর্জন । ফোরডেকে লেগে পিছলে নানাদিকে ছুটছে অসংখ্য বুলেট ।

এমভি লোটারের ব্রিজ লক্ষ্য করে গুলি করছে কুয়াশা ও নিশাত, মাত্র কয়েক সেকেন্ডে গেঁথেও ফেলল দুই স্লাইপারকে ।

‘আগেই বোঝা উচিত ছিল জাহাজে গার্ড রাখবে ডেমিয়েন ডগলাস,’ অন্য দু’জনের পাশে ছুটবার ফাঁকে বলল রানা । ফোরডেক পেরিয়ে কন্ট্রোল টাওয়ারের দরজা লক্ষ্য করে ছুটছে ।

গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল নিশাত, ‘এরা কারা? কাদের পাহারা দিতে পাঠিয়েছে?’

টাওয়ারের দিকে ছুটতে গিয়ে ওরা পেয়ে গেল একটা অ্যাক্সেস হ্যাচ, ওটা খুলল রানা । চমকে গেল কানফাটা অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজে । হ্যাচের পাশেই দীর্ঘ মই, নেমেছে জাহাজের বিশাল মিসাইল হোল্ডে ।

মইয়ের শেষে কী ঘটছে দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল রানা ও কুয়াশা ।

গোলাগুলি চলছে ওখানেই ।

অবাক চোখে রানা ও কুয়াশা দেখল, কালো পোশাক পরা একদল কমাণ্ডো লড়ছে । হাতে উষি এবং এম-১৬ রাইফেল । নিখুঁত মুভমেন্ট । গুলি করছে অচেনা একদল শত্রুকে লক্ষ্য করে ।

আবারও হ্যাচ আটকে দিল রানা । চাপা স্বরে বলল, ‘আমরা বোধহয় অন্যের লড়াইয়ে নাক গলাতে যাচ্ছিলাম ।’

‘নীচে কী দেখলেন, স্যর?’ চেষ্টা করে জানতে চাইল নিশাত ।

‘আমরা এই সুপারট্যাঙ্কারে প্রথম পার্টি নই,’ বলল রানা ।

‘অ্যা? তা হলে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছে নীচে ওরা কারা?’

‘চোখে চোখে কুয়াশার সঙ্গে কথা হলো রানার। ‘খুব কম এলিট ইউনিট আজও উষি ব্যবহার করে,’ বলল কুয়াশা। ‘ওরা ইজরায়েলি ফোর্স।’

‘আমিও একমত,’ বলল রানা।

‘আপনারা একটু খুলে বলবেন, আসলে কী হচ্ছে,’ রেগেই গেল নিশাত। বৃষ্টির ভিতর নকল পা ঠুকল ডেকে।

‘আমার ধারণা,’ বলল রানা, ‘আমাদের আগে এমন এক লোক এসে জাহাজে উঠেছে, যার ক্ষমতা আছে টাচলক সিকিউরিটি সিস্টেম ডিসআর্ম করার। সে ইজরায়েলি এয়ার ফোর্সের আব্রাম অ্যামনন। সঙ্গে এসেছে ইজরায়েলের সেরা ট্রুপ— সায়ারেত তিয়ামহিম।’

‘আজকের দিনটাই অদ্ভুত,’ বিরক্ত হয়ে বলল নিশাত। ‘আজিব, এমন কী ইজায়েলিরাও আজকে আমাদের পক্ষে লড়ছে! এরপর কী যে হবে, স্যর!’ প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ওর কণ্ঠ।

চট করে ঘড়ি দেখে নিল রানা।

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

নিউ ইয়র্কে এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিট।

আর মাত্র দশ মিনিট পর লঞ্চ করা হবে নিউক্লিয়ার মিসাইল।

‘নীচে খুনাখুনি করুক ইজরায়েলিরা, অ্যামনন মিসাইল ডিসআর্ম করে হিরো হলে আমার কোনও আপত্তি নেই,’ মৃদু হাসল রানা। ‘আমাদের কাজ এখন টাওয়ারে যাওয়া। ওই স্লাইপারদের দেখতে চাই। জানতে চাই তারা কারা, কাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। দরকার পড়লে গিয়ে সাহায্য করব অ্যামননের দলকে।’

কয়েক সেকেন্ডে টাওয়ারের সামনে পৌঁছে গেল ওরা, মাত্র দরজা খুলেছে রানা, এমনসময় চোখ ধাঁধানো আলো পড়ল ওদের উপর। মাথার উপরে সার্চলাইট জ্বলেছে হেলিকপ্টার।

ঝট করে ঘুরে চাইল রানা, মুখে এসে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা।
'যাহ্, মুশকিল,' বিড়বিড় করে বলল।

এক শ' গজ দূরে সুপারট্যাঙ্কারের ফোরডেকে অত্যাশ্চর্য সাদা আলো নিয়ে নামছে চোরাই মাল, অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার।

এক সেকেন্ড পর ডেকে নেমে এল ওটা।

লাফ দিয়ে কপ্টার থেকে ডেকে নামল তিনজন লোক, পরনে রাশান ব্যাটল-ড্রেস ইউনিফর্ম, হাতে স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল...

স্পেশাল কোবরা ইউনিটের মিখাইল পেরোনভ, এবং তার দলের অবশিষ্ট দুই সদস্য।

'ধ্যাৎ, ভুলে গিয়েছিলাম,' নিচু স্বরে বলল কুয়াশা। 'এখনও পুরস্কার আছে তোমার মাথার ওপর, রানা। ওই যে মিখাইল পেরোনভ।'

ঝটপট কন্ট্রোল টাওয়ারে ঢুকে পড়ল ওরা। বেশ কয়েকটা মইয়ের মত ধাপ পেরিয়ে ব্রিজে উঠে এল।

রানা চট করে দেখল ঘড়ি: পাঁচটা ছত্রিশ মিনিট।

কানে কনলনের কণ্ঠ শুনল: 'মেজর, স্যান ফ্রান্সিসকোর সুপারট্যাঙ্কার দখল করে নিয়েছি আমরা। চার স্লাইপার ছিল, পরনে ইরিত্রিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম। আর...'

দুই স্লাইপারের লাশের পাশে পৌঁছে গেছে রানা, কিছুই শুনছে না।

এই দু'জন আফ্রিকান সৈনিক।

কমাণ্ডো।

খাকি ফ্যাটিগ।

কালো হেলমেট।

কাঁধে একটা ক্রেস্ট । কিন্তু ওটা ইরিত্রিয়ার ক্রেস্ট নয় ।

এদের ক্রেস্ট নাইজেরিয়ান আর্মির এলিট কমাণ্ডো ইউনিট প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডের ।

আফ্রিকার অসংখ্য গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছে নাইজেরিয়ান প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড, তাদের খুনি হওয়ার ট্রেনিং দিয়েছিল সিআইএ । শুধু যে অন্য দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল তাই নয়, নাইজেরিয়ান নাগরিকদের বিরুদ্ধেই নামিয়ে দিয়েছিল । ল্যাগোস ও আবুজা-র মানুষ আজও প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডদের চেনে আরেকটি নামে: দ্য ডেথ স্কোয়াড ।

এরাই ডেমিয়েন ডগলাসের প্রোটেকশন টিম ।

ব্রিজে ছিল এই দু'জন স্নাইপার । ডেকের নীচে রয়েছে আরও সৈনিক, পাহারা দিচ্ছে মিসাইল সাইলো । হোল্ডে এখন এদের বিরুদ্ধেই লড়ছে ইজরায়েলিরা ।

‘কেভিন, তুমি বলেছিলে ওই লোকগুলো ছিল ইরিত্রিয়ান ।’

‘ঠিকই শুনেছেন ।’

‘নাইজেরিয়ান নয়?’

‘না । আমার সঙ্গী মেরিনরা তাই বলেছে । ইনসিগনিয়া ইরিত্রিয়ানই ছিল ।’

ইরিত্রিয়া... ভাবছে রানা ।

‘স্যর,’ ডাকল নিশাত । খুলে ফেলেছে স্টোররুমের দরজা ।

ছোট ঘরের মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে চারটে বডি ব্যাগ । ঝটপট একটার যিপার টেনে খুলল নিশাত । কুঁচকে গেল নাক । মরা লাশের গা থেকে পচা গন্ধ আসছে । লোকগুলো গ্লোবাল জিহাদের টেরোরিস্ট ।

‘এবার বুঝলাম,’ বলল রানা । ‘ওদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে দোষ ।’

স্যাটালাইট মাইক চালু করল ও ।

‘কেভিন, তোমার সপ্তের মেরিনদের সতর্ক থাকতে বলো। জাহাজের মেইন হোল্ডে আরও আফ্রিকান সৈনিক থাকবে। তারা সাইলো পাহারা দিচ্ছে। সরি, কেভিন, লড়াই এখনও শেষ হয়নি। ওই সৈনিকদের পেরিয়ে তোমার স্যাটালাইট আপলিঙ্ক নিয়ে যেতে হবে মিসাইলের কন্ট্রোল কন্সোলের ষাট ফুটের ভেতর, নইলে আমি কিছুই ডিসআর্ম করতে পারব না।’

‘বুঝলাম,’ বলল কেভিন। হারিয়ে গেল সিগনাল।

‘আমাদের হাতে সামান্য সময়,’ বলল নিশাত। কুয়াশার পাশে ব্রিজের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ খুঁজছে পেরোনভকে। কুয়াশার কাছে জানতে চাইল, ‘লোকটাকে দেখছেন?’

‘না। ইঁদুরটা গর্তে ঢুকেছে,’ বলল কুয়াশা। ‘ওর টার্গেট হয়তো অ্যাব্রাম অ্যামনন।’

ইঠাৎ কানের ভিতর জোরালো স্বরে বলে উঠল রঘুপতি: ‘বস্, মিস্টার রানা, নতুন কন্ট্যাক্ট পেয়েছি, দ্রুত আসছে। আপনাদের সুপারট্যাক্সারের দিকে। কোনও ধরনের বড় কাটার। দেখে মনে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ কোস্ট গার্ড।’

জানালার সামনে পৌঁছে গেল রানা, দূরে দেখতে পেল বড়সড় সাদা একটা জাহাজ। ওটা আসছে স্টারবোর্ডের দিকে।

ভীষণ শুকিয়ে গেছে গলা, টের পেল রানা।

ইজরায়েলি ট্রুপ, নাইজেরিয়ান ডেথ স্কোয়াড, রাশান বাউন্টি হান্টার— এসব তথ্য হজম করেই ভাবছিল এরপর কী করবে, এখন হাজির হচ্ছে ফ্রেঞ্চ মেরিটাইম পুলিশ!

‘না, ওটা কোস্ট গার্ডদের জাহাজ নয়,’ নাইট ভিশন বিনকিউলারে চোখ রেখেছে কুয়াশা।

পরীক্ষার দেখছে বড়সড় কাটার জাহাজটা মস্ত বড় ঢেউ চিরে আসছে— বো-টা ছুরির মত চোখা, দীর্ঘ ফোরডেকে কামান,

হুইল হাউসটা কাঁচে ঘেরা। হুইলহাউসের জানালার কাঁচে ছলকে
লেগেছে রক্ত।

হুইলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র লোক।

‘ওই জাহাজ নিয়ে আসছে ডেভিড এন. হেব্রিক,’ বলল
কুয়াশা।

চট করে রানা আরেকবার ঘড়ি দেখল।

পাঁচটা আটত্রিশ।

সাত মিনিট পর লঞ্চ করা হবে মিসাইল।

‘আরও বাউন্টি হাণ্টার,’ বিড়বিড় করল রানা। পরক্ষণে
বলল, ‘রঘুপতি, ওদেরকে ঠেকাতে পারবে?’

‘না, মিস্টার রানা। আমার কোনও মিসাইল অবশিষ্ট নেই।’

‘বুঝলাম,’ ঝড়ের গতিতে ভাবতে শুরু করেছে রানা। কয়েক
মুহূর্ত পর বলল, ‘ঠিক আছে, রঘুপতি, আগের ইন্ট্রাকশন
অনুযায়ী কাজ করো। আমরা যদি সঠিক সময়ে মিসাইল
ডিসআর্ম করতে না পারি, তোমার সাহায্য নিয়ে সরে যেতে
হবে।’

‘জী, মিস্টার রানা।’

ঘুরে দাঁড়াল রানা। ভাবছে, কিন্তু বুঝে উঠছে না কী করবে।

সব ঘটতে শুরু করেছে বড় দ্রুত। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে
যাচ্ছে পরিস্থিতি। ডিসআর্ম করতে হবে মিসাইল, জাহাজে
উঠেছে ইজরায়েলিরা, নাইজেরিয়ান ট্রুপ্‌স্‌, হাজির হয়েছে রাশান
আর ব্রিটিশ বাউন্টি হাণ্টাররা...

‘ভাবো, রানা! ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো!’ মনে মনে বলল
রানা। কয়েক সেকেন্ড পর মনস্থির করল। নিজেকে জিজ্ঞেস
করল, ‘এসবের ভেতর দিয়ে কী পেতে চাও তুমি? ...পাঁচটা
পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগেই মিসাইল ডিসআর্ম করতে চাই। আর
সবকিছু জাহান্নামে যাক!’

ব্রিজের পিছনে এলিভেটোরের উপর চোখ পড়ল ওর।
'আমরা হোল্ডে নামছি,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। চট করে
দেখে নিল ঘড়ি: পাঁচটা উনচল্লিশ।

দশ

নিউ ইয়র্ক বে।

স্থানীয় সময় এগারোটা উনচল্লিশ মিনিট।

ঝকমকে রোদেলা সকালে সুপারট্যাঙ্কারের ফোরডেকে
ডাইভ দিয়ে কাভার নিল খবির ও তার সঙ্গীরা।

হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়ল খবির ডেক হ্যাচের উপর। ওখান
থেকে নামল দীর্ঘ মই বেয়ে।

নীচে প্রায় অন্ধকার।

খবিরের পিছনে আসছে মেরিন এক্সোর্টস্।

মেঝেতে নেমে এসেই চট করে চারপাশ দেখে নিল খবির।

প্রকাণ্ড গুহার মত হোল্ড। জায়গাটা দৈর্ঘ্যে হবে কমপক্ষে
তিন শ' গজ। অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে চুরুণ্ট
আকৃতির মিসাইল সাইলোগুলো। যেন মস্ত সব পিলার ধরে
রেখেছে ছাত।

একেবারে শেষ সাইলোর সামনে ব্যারিকেড তৈরি করেছে
সশস্ত্র একদল কৃষ্ণ বর্ণের আফ্রিকান কমাণ্ডো। ব্যারিকেড মজবুত
করবার জন্য ব্যবহার করেছে স্টিলের ক্রেট ও ফোর্ক-লিফট।

ইংলিশ চ্যানেল।

পাঁচটা উনচল্লিশ।

এলিভেটোরের দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল সুপারট্যাঙ্কারের মেইন হোল্ড।

অস্ত্র বাগিয়ে বদ্ধ খুপরি থেকে বেরিয়ে এল রানা, কুয়াশা ও নিশাত।

মিসাইল হোল্ড অবিশ্বাস্য রকমের প্রকাণ্ড— পর পর তিনটা ফুটবল মাঠ জুড়ে দিলেও জায়গা রয়ে যাবে। জাহাজের ফোরডেকের নীচে সামনের অর্ধেক জায়গা জুড়ে লিয়ার্ড মিসাইলের সাইলো: হাই রিএনফোর্সড টাইটেনিয়াম সিলিঙার। ভিতরে রয়েছে মানব সৃষ্ট সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র।

এবং জাহাজের সামনের দিকে চলছে তুমুল লড়াই।

শেষ দুই মিসাইল সাইলোর সামনে বাঙ্কার করেছে নাইজেরিয়ান কমাণ্ডোরা। কাভার করছে মিসাইল কন্ট্রোল কন্সোল— ডেক থেকে দশফুট উপরে স্টিলের স্ট্রাট দিয়ে তৈরি উঁচু প্ল্যাটফর্ম। মিসাইল ডিসআর্ম করতে হলে ওই জায়গার ষাট ফুটের ভিতর পৌঁছুতে হবে রানাকে।

খুবই মজবুত ব্যারিকেড করেছে নাইজেরিয়ানরা। ঝড়ের মত গুলি করছে মেশিনগান ব্যবহার করে, দরকার পড়লে ইজরায়েলি হামলাকারীদের উদ্দেশে গ্রেনেডও ছুঁড়ছে।

বুলেট ও গ্রেনেড লাগছে সাইলোর গায়ে, কিছুই হচ্ছে না পুরু টাইটেনিয়ামের।

ওই রণক্ষেত্র এবং রানার মাঝে রয়েছে অসংখ্য জিনিস: শিপিং কন্টেইনার, মিসাইল স্প্যার পার্টস্ ইত্যাদি। এমন কী দুটো হলদে মিনি-সাবমেরিনও দেখল রানা। সিলিং ক্যাটওয়াক থেকে নেমে আসা শেকলে ঝুলছে ও-দুটো।

চিনতে পারল রানা।

মডিফায়েড এএসডিএস।

অ্যাডভান্সড সিল ডেলিভারি সিস্টেম। সঙ্গে কাঁচের গম্বুজের মত হেমিস্ফেরিক ককপিট। অগভীর সাগরে নামে, স্যাবোটাজ করা হয়নি তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বা ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিনের খোল পরীক্ষা করে ইউএস নেভি। নোয়া'য শিপ-লিয়ার্ড প্রজেক্টে ব্যবহার করবার জন্য ওগুলো তৈরি করা হয়েছে।

চট করে ঘড়ি দেখে নিল রানা।

পাঁচটা চল্লিশ মিনিট।

একবার ইশারা করল রানা। ছুটতে শুরু করেছে। কুয়াশা ও নিশাত ওর পাশেই চলল। কুঁজো হয়ে খরগোশের মত ছুটছে ওরা। নানান সাপ্লাই জিনিসের ভিতর দিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে। চোখ রেখেছে যুদ্ধের উপর।

একইসময়ে জানের তোয়াক্কা না করে আক্রমণাত্মক হামলা শুরু করল ইজরায়েলিরা।

ডানদিক দিয়ে এগুচ্ছে তাদের কয়েকজন। নাইজেরিয়ানদের গুলি আকর্ষণ করছে। এই সুযোগে বামদিকের লোকগুলো শত্রু ব্যারিকেড লক্ষ্য করে পরপর তিনটে রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড ছুঁড়ল।

মিসাইল হোল্ডের আকাশে ছুটে গেল গ্রেনেডগুলো... লেজে সাদা ধোঁয়ার মেঘ। একইসঙ্গে গেল তিন বোমা, লাগল নাইজেরিয়ান ব্যারিকেডে।

ফলাফল হলো নদীর পোক্ত বাঁধ ভেঙে পড়বার মতই।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আঘাতে পলকা পুতুলের মত বাতাসে ভেসে উঠল নাইজেরিয়ান কমাণ্ডেরা। আতঁচিৎকার করছে কয়েকজন। অন্যরা পুড়ে খাক হয়ে গেছে।

ঝড়ের গতিতে সামনে বাড়ল ইজরায়েলিরা, কোনও দয়া না

দেখিয়ে খুন করতে লাগল নাইজেরিয়ান কমান্ডোদেরকে। গুলি করা হচ্ছে আহতদের মাথায় মাঘল ঠেকিয়ে।

ওই একইসময়ে হোল্ডের স্টারবোর্ডের দেয়ালে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে খুলে যেতে লাগল প্রকাণ্ড স্টিলের একটা লোডিং ডোর। ওটাকে উপরে তুলছে রানারগুলো।

জোরালো ধুম আওয়াজ তুলে পুরো খুলে গেল মস্ত কবাট। আর সাগরের দিক থেকে ঠেলে দেয়া হলো স্টিলের বোর্ডিং প্লাঙ্ক। ষোড়শ শতাব্দীর জলদস্যুরা এভাবেই গ্যালিয়নে উঠে আসত।

চোরাই কোস্ট গার্ড জাহাজ থেকে বুটের ধূপধাপ আওয়াজ তুলে হোল্ডে এসে ঢুকল কন্টিনেন্টাল সোলজার বাউন্টি হান্টার দলের ৬৬ নম্বর ইউনিটের সদস্যরা। হাতের মেটালস্টর্ম রাইফেলগুলো আগুন উগলে দিতে শুরু করেছে।

চেয়ে আছে রানা: ৬৬ নম্বর ইউনিটের বাউন্টি হান্টাররা সংখ্যায় কমপক্ষে বিশজন, তাদের গুলিবর্ষণের সামনে কচুকাটা হতে লাগল ইজরায়েলি সায়ারেত তিযামহিমের সদস্যরা। এইমাত্র মিসাইল কন্ট্রোল কন্সোল দখল করেছিল তারা।

উঁচু কন্সোল প্ল্যাটফর্মের সামনে ছোট অর্ধচন্দ্র তৈরি করল লোকগুলো, প্রত্যেকে চেয়ে আছে জাহাজের পিছনদিক লক্ষ্য করে, যন্ত্রের মত গুলি করছে উযি ও এম-১৬ রাইফেল দিয়ে ৬৬ ইউনিটকে লক্ষ্য করে।

দুঃসাহসী লোকগুলোর দেয়া নিরাপত্তা নিয়ে স্টিলের প্ল্যাটফর্ম বেয়ে উঠে গেল এক লোক।

রানা ধারণা করল, এ লোকই আব্রাম অ্যামনন। সোজা কন্সোলের সামনে চলে গেল সে, হাতের ব্রিফকেস থেকে বের করল টাচলক-৯ ডিসআর্ম ইউনিট।

‘হারামজাদা ইজরায়েলিরা,’ তিক্ত স্বরে বলল নিশাত। ‘আর

সব তো চুরি করেই, এমন কী অন্য দেশের টেকনোলজিও হজম করে ফেলে।’

‘যা করছে করুক,’ বলল রানা। ‘দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশের হয়ে কাজ করছে এখন। আমরা রক্ষা করতে চাইব সায়ারেত তিয়ামহিমের সদস্যদেরকে। ওরা নজর রাখবে অ্যামননের ওপর।’

আরেকবার হাতঘড়ি দেখল রানা।

পাঁচটা একচল্লিশ মিনিট।

একটা মিসাইল সাইলোর আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। ল্যাপটপের মত করেই টাচলক ইউনিট কোলে নিয়েছে অ্যাব্রাম অ্যামনন, স্ক্রিন থেকে বেরুচ্ছে আলো। টাচস্ক্রিনের দিকে চেয়ে আছে লোকটা। ডানহাতের আঙুলগুলো নেড়েচেড়ে নিল। বুঝতে পারছে, যে-কোনও সময়ে শুরু হবে ডিসআর্ম সিকিউয়েন্স।

মিসাইল সিস্টেম ডিসআর্ম করবে অ্যামনন, ভাবল রানা। সামান্যতম হিংসাও এল না ওর মনে। ভাবছে, সেক্ষেত্রে কোনও ঝামেলা ছাড়াই সরে যাব।

পরক্ষণে চমকে গেল রানা। দেখল, মিসাইল হোল্ডের উপর রাফটারে অ্যামননের কসোল প্ল্যাটফর্মের পিছনে হাজির হয়েছে তিন ছায়ামূর্তি।

এদেরকে দেখতে পায়নি সায়ারেত তিয়ামহিমের সদস্যরা। ডেভিড এন. হেঞ্জিকের দলের দিকে গুলি পাঠাতে ব্যস্ত।

‘না...’ ফিসফিস করল রানা। ‘না... না...’

যিপলাইন ব্যবহার করে মাকড়সার মত নেমে এল ওই তিন ছায়ামূর্তি, গতি অবিশ্বাস্য।

পেদেরোনভ এবং তার কোবরা কমাণ্ডেরা।

জাহাজের ফোরডেকে বো-র কাছের এক হ্যাচ ব্যবহার করে নেমে এসেছে।

কাভার থেকে ছিটকে সরল রানা, গোলাগুলির আওয়াজের ভিতর অনর্থক, তবুও গলা ফাটিয়ে চেষ্টা, ‘তোমার পিছনে দেখো!’

রানার কথাটা শুনতে পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখাল অ্যামননকে রক্ষা করা কমাগোরা।

গুলি এল রানাকে লক্ষ্য করেই।

এমন কী অ্যামননও মুখ তুলে চাইল। আবারও মনোযোগ দিতে গেল ডিসআর্ম সিকিউয়েন্স-এ।

যেভাবে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল রানা, তার তিনগুণ গতি নিয়ে বাঁপিয়ে পড়ল ও সাইলোর পিছনে। পরক্ষণে কাঁকড়ার মত চার হাত-পা ব্যবহার করে আবারও উঁকি দিল ওদিকে।

ওই একইসময়ে উঁচু প্ল্যাটফর্মে ব্যস্ত অ্যামননের কয়েক গজ পিছনে আস্তে করে নেমে এল তিন কোবরা কমাগো।

চেয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারল না রানা, হতবাক। ইজরায়েলিরা গুলি পাঠাচ্ছে এদিকে। অস্ত্রের মাযলে দপদপ করছে আগুন। নিঃশব্দে সামনে বাড়ল মিখাইল পেদরোনভ, কোমরের খাপ থেকে নিয়েছে কসাক ফাইটিং সোর্ড, এক সেকেণ্ড পর অ্যামননের ঘাড়ের পিছনে নেমে এল ক্ষুরধার তলোয়ার।

ওই মুহূর্তে বাউন্টি লিস্টের শেষতম জীবিত শিকার হয়ে উঠল মাসুদ রানা। পৃথিবীর একমাত্র মানুষ, যে ডিসআর্ম করতে পারবে টাচলক-৯ মিসাইল সিকিউরিটি সিস্টেম।

অ্যামননের কাঁধ থেকে খসে পড়ল মাথা, তখনও ডিসআর্ম সিকিউয়েন্স চালুই করতে পারেনি।

টোক গিলল রানা, ব্যাঙের ডাকের মত শোনাৎ ওর কণ্ঠ: ‘এবার?’

সায়ারেত তিয়ামহিমের এক সদস্য ঘাড় ফিরিয়ে চাইল, পরক্ষণে মস্ত হাঁ করল সে। এইমাত্র ধূপ করে কসোলের সামনের

মেঝেতে পড়েছে মুণ্ডুহীন অ্যামননের ধড়। কলকল করে গড়াতে শুরু করেছে তাজা রক্ত। ইজরায়েলি কমাণ্ডো দেখল, এক লোক রাকস্যাকে পুরে ফেলেছে অ্যামননের মাথা। পরক্ষণে রিট্র্যাক্টবল যিপলাইন ব্যবহার করে সাঁই করে উঠে গেল হ্যাচের দিকে।

টাশ্শ্ টাশ্শ্ আওয়াজ তুলল দুটো অস্ত্র। অন্য দুই কোবরা কমাণ্ডো গুলি করেছে ইজরায়েলি ট্রুপারদের মুখের উপর। ওই একইসময়ে ৬৬ ইউনিটের হেণ্ডিকের লোক উল্টো দিক থেকে উড়িয়ে দিল আরও দুই সায়ারেত তিয়ামহিম সদস্যকে।

দু'দিক থেকে গুলির মুখে পড়ে অসহায় হয়ে গেল ইজরায়েলিরা। তাদের শত্রুরা প্রফেশনাল বাউন্টি হান্টার।

সায়ারেত তিয়ামহিম সদস্যদের অবশিষ্ট কয়েকজন খেয়াল করেছে অ্যামননের লাশ ফেলে উপরে রওনা হয়েছে কোবরা কমাণ্ডোরা। দ্বিধার ভিতর পড়ে এবং হেণ্ডিকের দলের তুমুল গোলাগুলিতে ফর্মেশন নষ্ট হয়ে গেল ইজরায়েলিদের।

কচুকাটা হলো তারা।

দেখতে না দেখতে তাদের সামনে পৌঁছে গেল ৬৬ ইউনিট। আহতদেরকেও ছাড়া হলো না, কয়েক সেকেণ্ডে শেষ হয়ে গেল ইজরায়েলি ফোর্সের শেষ সৈনিকও।

সাইলোর আড়াল থেকে চেয়ে আছে রানা। চট করে দেখে নিল ঘড়ি।

পাঁচটা বেয়াল্লিশ মিনিট।

ব্যারিকেডের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ডেভিড এন. হেণ্ডিক। তার ভাবচক্রর অন্যরকম হয়ে উঠল। যেন শত্রু ব্লকেড জয় করেছে এক জেনারেল। সিলিঙের দিকে আঙুল তাক করল সে। ওদিক দিয়েই রিট্র্যাক্টবল যিপলাইন ব্যবহার করে বেরিয়ে গেছে মিখাইল পেরোনভ এবং তার দুই সঙ্গী। সঙ্গে নিয়ে গেছে মহামূল্যবান অ্যামননের মাথা।

কোবরা কমাণ্ডোরা পৌছে গেছে সিলিঙের কাছে, পাশেই চওড়া একটা কার্গো হ্যাচ।

হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে বৃষ্টি ভিতর ফোরডেকে পৌছে গেল পেরোনভের দুই সঙ্গী, একজনের হাতে কাটা মাথার ব্যাগ। দুই সেকেণ্ড পর টেনে তুলতে চাইল নেতাকে।

তখনই মেশিনগানের শতখানেক গুলি খেয়ে বাঁঝরা হলো। ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেয়েছে, ছিটকে বেরোতে লাগল রক্তের ঝর্ণা।

৬৬ ইউনিটের একটি উপদল বৃষ্টির ভিতর অপেক্ষা করছিল। এমন হতে পারে তা আগেই ধারণা করেছিল ডেভিড এন. হেঞ্জিক, আগে ভাগেই ফোরডেকে রেখেছে দ্বিতীয় টিম।

অ্যামননের মাথার ব্যাগ পড়েছে ডেকে, কাটা পড়া ঘুড়ির পিছনে ছুটন্ত বাচ্চা ছেলেদের মত ছুটে এল ৬৬ ইউনিটের সাব-টিম। সামনের লোকটা খপ করে তুলে নিল সাধের ধন।

শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি, একাকী পেরোনভ লুকিয়ে পড়ল ফ্লোর লাইনের নীচে। শরীরে দোল দিয়ে পৌছে গেল কাছের ক্যাটওয়াকে। অনেক নীচে মিসাইল হোল্ড। কয়েক সেকেণ্ডে ছায়ার ভিতর মিলিয়ে গেল সে।

মিসাইল হোল্ডের পরিস্থিতি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে রানার কাছে।

মাত্র তিন মিনিট বাকি, এরপর রওনা হবে নিউক্লিয়ার মিসাইল। আব্রাম অ্যামনন শেষ, কন্ট্রোল কন্সোল দখল করে নিয়েছে হেঞ্জিকের লোক। সংখ্যায় বিশজন। সঙ্গে মেটালস্টর্ম রাইফেল!

এদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে হবে, ভাবছে রানা। কুয়াশার দিকে চাইল। ‘রঘুপতির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। মাত্র ওই একটা উপায়ই আছে।’

থ্রোট মাইকে বলল কুয়াশা, ‘রঘুপতি। বি প্ল্যানের কী অবস্থা?’

‘বস্, আপনাদের কাছেরটা পেয়েছি। বিশাল আকার। এক শ’ গজ সামনে আছি। ইঞ্জিন ঠিকভাবেই চলছে। তাক করেছি ঠিক আপনাদের দিকেই।’

এগারো

ঝোড়ো হাওয়ার ভিতর এমভি লোটারের এক শ’ গজ দূরে পৌঁছে গেছে আরেকটি বিশাল জাহাজ, এখন ওটার হেলমে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুয়াশার রোবট রঘুপতি।

শারবার্গে কার্গো নামাবার জন্য চ্যানেলে অপেক্ষা করছিল এক লাখ দশ হাজার টনি কন্টেইনার শিপ— এমভি হ্যারিয়েটা। অলস গতিতে চলছিল ইঞ্জিন। তখনই ফোরডেকে নেমে এল কালো শকুন নিয়ে রঘুপতি।

এখন জাহাজে রঘুপতি ছাড়া কেউ নেই। সেইলিং ক্রুরা বুদ্ধিমান লোক, অস্ত্র হাতে দেখেছে ভয়ঙ্কর লোকটাকে, এমন এক লোক, যে ইচ্ছা করলে যেকোনো খুশি চরকির মত মাথা ঘোরাতে পারে! এরপর আর দেরি করেনি ক্রুরা, ঝটপট লাইফবোট সাগরে নামিয়ে পালিয়ে গেছে। এই মুহূর্তে দুটো এম-১৬ রাইফেল হাতে ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে রঘুপতি।

‘এবার কী করতে হবে, বস?’ জানতে চাইল রেডিয়োতে।

পরিস্থিতি বুঝে নিতে চাইছে রানা।

মিসাইল ডিসআর্ম করতে না পারলে রঘুপতিকে ব্যবহার করাই ছিল শেষ উপায়। ডুবিয়ে দিতে হবে সুপারট্যাঙ্কার, তা হলে মিসাইল লঞ্চ করতে পারবে না ম্যাজেস্টিক-১২। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য জাহাজগুলোর মিসাইল ঠেকাতে পারবে না ওরা।

চট করে একবার কন্ট্রোল কন্সলের দিকে চাইল রানা। পরক্ষণে দেখল ব্যারিকেড। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল শীতল একটা অনুভূতি।

সরাসরি ওর দিকেই চেয়ে আছে ডেভিড এন. হেঞ্জিক। ওকে দেখে ফেলেছে লোকটা।

চওড়া হাসি দিল শয়তানটা।

‘রঘুপতি,’ বলল রানা, ‘গুঁতো দাও!’

ঘড়ি দেখিয়ে চলেছে: ১৭:৪২:০৫...

ব্যারিকেডের পিছন থেকে ছিটকে এল হেঞ্জিকের লোক, ছুটতে শুরু করেছে রানাদেরকে লক্ষ্য করে। আড়াল নিচ্ছে মিসাইল সাইলোর মাঝে। দপদপে আগুন বেরোচ্ছে মেটালস্টর্ম রাইফেলের মাথল থেকে।

রানার ইশারায় রওনা হলো নিশাত ও কুয়াশা। পৌঁছে গেল স্টারবোর্ডের খোলা কার্গো ডোরের পাশে। কাছেই একটা লাইফবোট।

‘উঠে পড়ুন!’ গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল রানা।

একইসঙ্গে লাফ দিয়ে লাইফবোটে উঠল ওরা। উঠে বসেই গুলি শুরু করল শত্রুদের লক্ষ্য করে।

অনেক কাছে চলে এসেছে ৬৬ ইউনিটের লোক।

যন্ত্রের মত গুলি করছে রানা, কুয়াশা ও নিশাত।

রঘুপতি আসা পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে হবে।

ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে রাউন্টি হান্টাররা।

‘রঘুপতি,’ গম্ভীর সুরে ডাকল কুয়াশা। ‘কোথায়...’

আর তখনই অবিশ্বাস্যভাবে হাজির হলো রঘুপতি ।

যে বিকট মড়মড় আওয়াজ শুরু হলো, তাতে মনে হলো
ভেঙে পড়ছে গোটা পৃথিবী ।

ওই আওয়াজের পর পরই ধাতুর সঙ্গে ধাতুর জোর সংঘর্ষের
শব্দ শুরু হলো ।

তালা লেগে গেল কানে ।

ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেয়েছে প্রকাণ্ড দুই জাহাজ । লাফিয়ে উঠেছে
ইংলিশ চ্যানেলের এদিকের সাগর । ঝমঝম বৃষ্টির ভিতর দৃশ্যটা
অকল্পনীয় মনে হলো রানার ।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুটো একহাজার ফুট দীর্ঘ জাহাজ
ধাক্কা দিয়েছে একে অপরকে । একেকটার ওজন এক লাখ
টনেরও বেশি ।

সুপারট্যাঙ্কার এমভি লোটার্সের পোর্টে গুঁতো দিয়েছে
রঘুপতির চোরাই জাহাজ এমভি হ্যারিয়েটা । ছুরির মত ইম্পাত
কাটছে চোখা বো । যেন মস্ত ব্যাটারিং র্যাম ।

কুঁচকে ভিতরে ঢুকল লোটার্সের প্লেট । মাঝে তৈরি হলো বড়
বড় ফাটল । লাফিয়ে জাহাজে ঢুকল সাগর ।

ঘুমি খাওয়া বক্সারের মতই থরথর করে কাঁপছে
সুপারট্যাঙ্কার এমভি লোটার্স । দুলতে শুরু করেছে ভীষণভাবে ।

প্রথম প্রচণ্ড ধাক্কাই ভয়ঙ্করভাবে কাত হয়েছে স্টারবোর্ডে,
হুড়মুড় করে জাহাজে ঢুকল সাগরের পানি । পরক্ষণে
নাটকীয়ভাবে পোর্টে কাত হলো এমভি লোটার্স, যেন হুমড়ি
খেয়ে পড়বে সাগরের বুকে । ডুবতে শুরু করেছে জাহাজ ।

এমভি লোটার্সের মিসাইল হোল্ডে যা ঘটছে, দেখলে হাঁ হয়ে
যেতেন নুহ নবী ।

বজ্রপাতের আওয়াজ চলছে জাহাজের ভিতর ।

এমন কী রানাও বোঝেনি কেমন ভয়ানক হবে সংঘর্ষ । এখন

চোখের সামনে দেখল, পোর্টের দেয়াল চিরে ছোরার মত পড়পড় করে ঢুকছে হ্যারিয়েটার চোখা বো।

প্রচণ্ড চাপ খেয়ে কাত হয়ে গেছে গোটা স্টারবোর্ড।

ছিটকে পড়েছে সবাই।

আচমকা প্রকাণ্ড সব ফাটল গলে ভিতরে ঢুকল সাগরের বিপুল পানি।

জোয়ারের দশফুটি ঢেউ ঢুকছে জাহাজে। মুহূর্তে তলিয়ে গেল বেশ ক'জন ৬৬ ইউনিটের বাউন্টি হান্টার। ঢেউয়ের চাপড় খেয়ে ভেসে উঠল আস্ত ফোর্কলিফট, কার্গো কন্টেইনার এবং মিসাইল পার্টস।

হুড়মুড় করে রানাদের লাইফবোটের তলে পৌঁছল সাগরের ঢেউ। মাউন্ট থেকে বোটকে তুলে নিল অনায়াসেই। একইসময়ে ডেভিট থেকে বোট খুলে দিল রানা, চালু করল ইঞ্জিন।

কয়েক সেকেন্ডে তলিয়ে গেল হোল্ডের মেঝে, দ্রুত বাড়ছে পানির গভীরতা।

বিপুল পানি ঢুকেছে বলে পোর্টে গড়িয়ে গেল জাহাজ। ক্রমেই বাড়ছে ইস্পাতের প্লেটের ফাটল। তিরিশ ডিগ্রি কাত হলো এমভি লোটাস।

পানি কেটে রওনা হয়েছে রানাদের মোটোরাইষ্ড লাইফ-বোট। আরও কাত হতে শুরু করেছে চারপাশের হোল্ড।

ঘড়ি অনুযায়ী: ১৭:৪২:২৯।

পোর্টের দিকে চেয়ে অদ্ভুত দৃশ্য দেখল রানা।

এখনও এমভি লোটাসের বুকে গেঁথে আছে এমভি হ্যারিয়েটা— গলগল করে পেটে পুরছে সুপারট্যাঙ্কার প্রচুর পানি। বামে কাত হয়ে ভাসছে। যেন তার স্তনে মুখ গুঁজেছে হ্যারিয়েটা।

পেটের ভিতর পানির পরিমাণ আরও বাড়তেই হ্যারিয়েটার

বো-টাকে সাগরে চুবিয়ে দিল এমভি লোটার। কয়েক মুহূর্ত পর
নিজেরই বেশিরভাগ অংশ তলিয়ে গেল, জেগে রইল শুধু দীর্ঘ
ফোরডেক ও ব্রিজ টাওয়ার। হেলে পড়েছে তিরিশ ডিগ্রি।

টেউয়ের নীচে তলিয়ে গেছে হ্যারিয়েটার বো।

কাউকে বলতে হয়নি কী করতে হবে, নিজেই বুঝে গেছে
রঘুপতি। ব্রিজ থেকে বেরিয়ে ফোরডেকে ছিটকে গিয়ে উঠল
কালো শকুনের ককপিটে। কয়েক সেকেন্ড পর বৃষ্টি ঝরা আকাশে
উঠল জেট বিমান।

পানিভরা লোটারের হোল্ডে গতি তুলেছে রানাদের লাইফবোট।

১৭:৪৩:৩০...

হেলে পড়া মিসাইল সাইলো এড়িয়ে উচ্ছল টেউয়ের ভিতর
দিয়ে তীরের মত ছুটছে রানাদের বোট। পিছনদিকে বসেছে
কুয়াশা ও নিশাত, গুলি করছে ভাসমান শত্রুদের লক্ষ্য করে।

রানার মনে হলো, বিদ্যুৎবেগে স্পিডবোট নিয়ে অর্ধ নিমজ্জিত
জঙ্গলে দূরে কোথাও চলেছে।

দুই জাহাজে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের পর ডেভিড এন. হেপ্টিক এবং
তার বেশিরভাগ লোক সরে গেছে হোল্ডের স্টারবোর্ডে—
ওদিকটা উঁচু। এখনও তলিয়ে যায়নি।

সরাসরি মিসাইল হোল্ডের কন্ট্রোল কন্সলের দিকে ছুটছে
রানাদের লাইফবোট।

১৭:৪৩:৪৭...

১৭:৪৩:৪৮...

১৭:৪৩:৪৯...

অশান্ত পানিতে বাঁক নিল রানার বোট, পিছনে বসে শত্রুদের
দিকে গুলির পর গুলি ছুঁড়ে কুয়াশা ও নিশাত। পানিতে সাঁতার
কাটতে গিয়ে অস্ত্র তাক করতে পারছে না ৬৬ ইউনিটের

কয়েকজন, মারা পড়ছে গুলি খেয়ে।

পিছনে লাশ রেখে এগিয়ে চলেছে রানাদের লাইফবোট।

উঁচু কন্ট্রোল কন্সলের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। হেলে দাঁড়িয়ে আছে ওয়ায়ার ফ্রেমের কন্ট্রোল কন্সল। পানি-সমতল থেকে মাত্র একফুট উপরে।

‘আমাকে কাভার দিন!’ চেষ্টা করে জানাল রানা। লাইফবোটের ডেক থেকে দেখল কন্সলের আভ্যন্তরীণ ডিসপ্লে স্ক্রিন। লাল সংখ্যা টিকটিক করে নীচে নামছে। প্রতি সেকেন্ডের জন্য এক শ’ মিলিসেকেন্ড দেখিয়ে চলেছে।

মিসাইল লঞ্চিংয়ের জন্য চলছে কাউন্টডাউন:

০০:০১:০৯.৮৭...

০০:০১:১০.৮৬...

০০:০১:০৯.৮৫...

সময় পেরিয়ে চলেছে বিদ্যুৎবেগে।

ফ্রেঞ্চ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে মৃত ডিজিএসই এজেন্টের কাছ থেকে পাওয়া টাচলক-৯ ইউনিট পকেট থেকে বের করল রানা— ওটা ছিল ভেস্টে ওয়াটারপ্রুফ পাউচের ভিতর।

আবারও আলোর মুখ দেখল ওই ডিসপ্লে।

বিপ্ আওয়াজ তুলে স্ক্রিনে ভেসে উঠল মেসেজ:

ফাস্ট প্রটোকল (প্রক্সিমিটি): স্যাটিসফাইড.

ইনিশিয়েট সেকেন্ড প্রটোকল।

আগের মতই দেখা দিল সাদা বৃত্ত, টিপটিপ করতে শুরু করেছে।

প্রতিটি বৃত্ত স্পর্শ করছে রানা।

০০:০১:০২...

০০:০১:০১...

০০:০১:০০...

হঠাৎ করেই বেদম হোঁচট খেল এমভি লোটাস। পুরো সুপারট্যাঙ্কার ভাসছে এমভি হ্যারিয়েটার বো-র উপর ভর করে। পিছলে নেমে যেতে শুরু করেছে এই জাহাজ!

প্রস্তুত ছিল না বলে একটা সাদা বৃত্ত স্পর্শ করতে পারল না রানা।

বিঁপ আওয়াজ ছাড়ল ইউনিট:

সেকেণ্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):
ফেইল ডিসআর্ম অ্যাটেম্পট।
রেকর্ডেড।

থ্রি ফেইল্ড ডিসআর্ম অ্যাটেম্পট উইল
রেজাল্ট ইন ডিফল্ট ডেটোনেশন।

সেকেণ্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):
রি-অ্যাকটিভেটেড।

কাউন্ট ডাউনের দিকে চেয়ে ঢোক গিলল রানা।

নতুন উদ্যমে কাজে নামল।

ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সুপারট্যাঙ্কার এমভি লোটাস।

রানা টের পেল, ওর বুটের পাশে চাপড় দিচ্ছে সাগরের ঢেউ।

টাচলক-৯ ইউনিটের স্ক্রিনে আঙুল স্পর্শ করছে রানা, ওদিকে স্টারবোর্ডের উঁচু জায়গায় ৬৬ ইউনিটের লোকদের লক্ষ্য করে

গুলি করছে কুয়াশা।

এক পশলা গুলি ওদিকে পাঠাবার পর হঠাৎ দৃশ্যটা দেখল ও, চমকে গিয়ে বলল, ‘এহ্-হে!’

‘কী হলো?’ পাশ থেকে জানতে চাইল নিশাত।

‘এবার যে-কোনও সময়ে তলিয়ে যাবে স্টারবোর্ডের কার্গো ডোর,’ বলল কুয়াশা।

ঠিকই বলেছে।

বামদিকে এমভি লোটাস কাত হয়ে পড়ায় স্টারবোর্ডের প্রকাণ্ড কার্গো ডোরওয়ে এতক্ষণ পানি-সমতল থেকে উপরে ছিল।

কিন্তু উচ্চতা বাড়ছে পানির, এবার তলিয়ে যাবে ওই দরজা। তার বড় কারণ, ওদিক থেকেই হুড়মুড় করে হোল্ডে ঢুকবে সাগরের বিপুল পানি। টুপ করে ডুববে জাহাজ।

‘মিস্টার কুয়াশা!’ সতর্ক করল নিশাত। ‘ডানদিক দেখুন!’

বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল কুয়াশা।

ডানদিকে হেণ্ড্রিকের ছয়জন রাউন্টি হান্টার পানি ছেড়ে উঠে পড়েছে দুই মোটোরাইয়ড লাইফবোটে।

সোজা রওনা হয়ে গেল কুয়াশাদের লক্ষ্য করে।

‘রানা!’ গলা ছাড়ল কুয়াশা, ‘তোমার কাজ শেষ হলো?’

‘প্রায়...’ পাল্টা চেষ্টা রানা। চোখ স্ক্রিনে।

০০:০০:৫২...

০০:০০:৫১...

০০:০০:৫০...

স্টারবোর্ডের নিমজ্জিত এলাকায় সরে গেল ৬৬ ইউনিটের দুই লাইফবোট, তুলে নিল ডেভিড এন. হেণ্ড্রিক এবং অবশিষ্ট লোকদের।

সবমিলে ষোলোজন তারা।

রানা এবং মিসাইল কন্ট্রোল কন্সোল লক্ষ্য করে তেড়ে এল
দুই বোট।

নতুন উদ্যমে গুলি ছুঁড়তে লাগল কুয়াশা ও নিশাত।

পানির উপর দিয়ে রাজহংসীর মত তরতর করে আসছে ৬৬
ইউনিটের দুই লাইফবোট। এড়িয়ে যাচ্ছে হেলে যাওয়া মিসাইল
সাইলো। গুলি করছে শত্রুদের উদ্দেশে।

এদিকে নিজ জগতে ডুবে আছে রানা। ঝড়ের মত স্পর্শ করছে
সাদা ও লাল বৃত্ত।

০০:০০:৪২...

০০:০০:৪১...

০০:০০:৪০...

হঠাৎই শেষ সাদা বৃত্ত স্পর্শ করল রানা, বদলে গেল স্ক্রিনের
দৃশ্য:

সেকেণ্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):

স্যাটিসফায়েড।

থার্ড প্রটোকল (কোড এন্ট্রি):

অ্যাকটিভ।

প্লিয এন্টার অথোরাইজ্

ডিসআর্ম কোড।

‘ঠিক আছে,’ বিড়বিড় করল রানা। ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড
চাইছে ওর কাছে। সপ্তম মার্সেন প্রাইম এখনও ওর তালুতে
লেখা: ৪,৩১,১২,৬০৯।

সংখ্যাগুলো টাচলক ইউনিটের নিউম্যারিকাল কিপ্যাডে তুলে
দিতে লাগল রানা। এমনসময় হঠাৎ করেই ওকে নিয়ে রওনা

হয়ে গেল পায়ের নীচের ডেক!

বিপ্!

জোরালোভাবে আপত্তি তুলল স্কিন:

ফার্স্ট প্রটোকল (প্রস্ক্রিমিটি): ফেইলড.

অল প্রোটোকলস রি-অ্যাকটিভেটেড.

‘আরেহ্!’ ঝট্ করে ঘুরে কুয়াশার দিকে চাইল রানা। মিসাইল কন্সোল থেকে তীরের মত বোট সরিয়ে নিয়েছে বৈজ্ঞানিক। স্টার্নে ৬৬ ইউনিটের দুই বোট লক্ষ্য করে গুলি করতে ব্যস্ত নিশাত।

মিসাইল সাইলোগুলোর মাঝ দিয়ে ঐক্যেবঁকে ছুটছে রানাদের বোট।

‘দুঃখিত, রানা,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল কুয়াশা। ‘উপায় ছিল না। ওখানে থাকলে এতক্ষণে মারা পড়তাম আমরা।’

‘বুঝেছি!’ রাগ সামলে নিতে চাইল রানা। ‘কিন্তু আবারও ওই কন্সলের ষাট ফুটের ভেতর যেতে হবে! অথচ হাতে দশ সেকেন্ড আছে কি না কে জানে! কমপক্ষে পঁচিশ সেকেন্ড লাগবে রেসপন্স প্যাটার্ন কমপ্লিট করতে!’

ওদের দ্রুতগামী বোটের চারপাশের পানি ছলকে ডুব দিচ্ছে অসংখ্য বুলেট।

০০:০০:৩৬...

০০:০০:৩৫...

০০:০০:৩৪...

হঠাৎ করেই টোকা খাওয়া ক্যারামের গুলির মত আরেকদিকে রওনা হলো কুয়াশা, তারই ফাঁকে বলল, ‘কতটা কাছে যেতে হবে তোমাকে?’

‘ষাট ফুট!’

‘ঠিক আছে!’

ওদের কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ আওয়াজে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট। মিসাইল সাইলোর গায়ে লেগে ছিটকে যাচ্ছে বিঙ্গ শব্দে।

বোট ঘুরিয়ে নিয়েছে কুয়াশা, তৈরি করছে বড় বৃত্ত। আবারও ফিরছে ইস্পাতের দ্বীপ লক্ষ্য করে। দূরে দেখা গেল কন্ট্রোল কন্সোল। সাইলোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছে বোট।

০০:০০:২৮...

০০:০০:২৭...

০০:০০:২৬...

আবারও বিপ আওয়াজ ছাড়ল রানার স্ক্রিন:

ফাস্ট প্রটোকল (প্রক্সিমিটি): স্যাটিসফাইড.

ইনিশিয়েট সেকেন্ড প্রটোকল।

শুরু হয়েছে লাইট-রেসপন্স ডিসপ্লে।

এবার স্ক্রিন স্পর্শ করতে হবে রানাকে।

পিছনে লেগে আছে ৬৬ ইউনিটের দুই বোট। বৃষ্টির মত পিছনে গুলি করছে নিশাত।

একহাতে বোট চালাচ্ছে কুয়াশা, অন্যহাতের অস্ত্র থেকে গুলি করছে। মনে রেখেছে, কন্ট্রোল কন্সোলের ষাট ফুটের ভিতর থাকতে হবে।

০০:০০:১৭...

০০:০০:১৬...

০০:০০:১৫...

কিন্তু কুয়াশা বৃত্ত তৈরি করছে দেখেই বুঝে গেছে হেড্রিকের

দুই লাইফবোটের পাইলট। তারা ফাঁদে ফেলতে চাইল শত্রু-
বোটকে।

বৃত্তের উল্টো দিক লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেছে একটা বোট,
অন্যটা সোজা তেড়ে এল রানাদের দিকে।

বর্তমান পরিস্থিতি কী জানেও না রানা, ঝড়ের মত চলছে
ওর আঙুল।

সাদা-লাল-সাদা-সাদা...

টিপটিপ আওয়াজ তুলছে স্ক্রিন।

০০:০০:১২...

০০:০০:১১...

০০:০০:১০...

৬৬ ইউনিটের প্ল্যান বুঝেছে কুয়াশা। এগিয়ে আসা বোটের
ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে গুলি শুরু করল ও।

টাশ্শ্! টাশ্শ্! টাশ্শ্!

তিনটা গুলি মোটেও লক্ষ্যভেদ করতে পারল না।

০০:০০:০৯...

০০:০০:০৮...

০০:০০:০৭...

ঝড়ের মত চলছে রানার আঙুল। বাম থেকে ডানে, ডান
থেকে বামে স্পর্শ করছে বৃত্ত।

তেড়ে আসা বোটের এক লোককে গঁথে ফেলেছে নিশাত।
কিন্তু তখনই আহত বাঘের মত গর্জন ছাড়ল ও। উত্তপ্ত বুলেট
বিঁধেছে ওর কাঁধে।

০০:০০:০৬...

০০:০০:০৫...

০০:০০:০৪...

মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে রানাদের বোটের সঙ্গে দ্বিতীয়

শত্রুবোটের। এখনও ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে গুলি করছে
কুয়াশা।

টাশ্শ্! টাশ্শ্! টাশ্শ্! টাশ্শ্!

মিস... মিস... মিস... লেগেছে!

০০:০০:০৩....

স্টিয়ারিং হুইলের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ড্রাইভার, মৃত।
বাঁক নিয়ে আরেকদিকে রওনা হয়েছে ওই বোট। কুয়াশা
কম্পোলের ষাট ফুটের ভিতর রাখছে নিজের বোটকে।

০০:০০:০২...

০০:০০:০১...

রানার আঙুলের নড়াচড়া সামান্য বদলে গেল। বৃত্ত স্পর্শ না
করে টাইপ করছে...

০০:০০:০০

কুয়াশা বুঝে গেল, দেরি হয়ে গেছে ওদের।

অবশ্য কম্পোলে থেমে গেছে কাউন্টডাউন:

০০:০০:০৭

ঠিকই যিরো পর্যন্ত গুণেছে ঘড়ি। কিন্তু আগেই ইউনিভার্সাল
ডিসআর্ম কোড এন্ট্রি করেছে রানা।

ক্ষিনে এখন লেখা:

থার্ড প্রটোকল (কোড এন্ট্রি): স্যাটিসফাইড.

অথোরাইজ্ ডিসআর্ম কোড

এন্টার্ড.

মিসাইল লঞ্চ অ্যাবোর্টেড.

মস্ত স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা। কোনও মিসাইল রওনা হয়নি।
লগুন, প্যারিস ও বার্লিন নিরাপদ।

কিন্তু এদিকে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে স্টারবোর্ডের প্রকাণ্ড দরজা!

জোরালো হুউউস্‌স্‌! আওয়াজ ছাড়ল দরজা।

যেন হাজার হাজার অজগর শ্বাস ফেলল কানের ভিতর।

ফ্লাডগেটের মত কাজ করছে ওই মস্ত দরজা, লাফিয়ে ভিতরে ঢুকল বিপুল পানি, যেন আস্ত সাগর ঢুকে এল ভিতরে।

রানাদের দিকে তেড়ে এল উঁচু জলপ্রাচীর। বানের মত আসছে। এবার গিলে ফেলবে সবাইকে।

ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর।

শরীর মুচড়ে সোজা হলো গোটা সুপারট্যাঙ্কার। স্টারবোর্ডে প্রচুর পানি ঢুকতেই ঝটকা দিয়ে সিধে হয়েছে জাহাজ। পোর্টসাইড ও স্টারবোর্ড— দু'পাশ দিয়েই ঢুকছে সাগর।

জাহাজ সিধে হতেই আরেকটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল: হ্যারিয়েটার বো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুপারট্যাঙ্কার। কিন্তু ওই জাহাজের বো ভাসিয়ে রেখেছিল এমভি লোটারসকে, এবার আর কোনও অবলম্বন রইল না সুপারট্যাঙ্কারের।

ইংলিশ চ্যানেলের গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল এমভি লোটারস।

মিসাইল হোল্ডে লাইফবোটে বসে হাজারো আওয়াজ শুনল রানা, কুয়াশা ও নিশাত। কানে তালুা লেগে গেল। হোল্ডে বজ্রের মত গর্জন ছাড়ছে যেন জলপ্রপাত। বিকট প্রতিধ্বনি শুরু হলো ফাঁকা জাহাজের ভিতর। ঢেউ আছড়ে পড়ছে স্টিলের দেয়ালে। হোল্ডের পানিতে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণি।

অকল্পনীয়ভাবে বাড়ছে পানির উচ্চতা।

রানার মনে হলো, ওদের মাথার উপর নেমে আসছে সিলিং।

কয়েক সেকেণ্ডে প্রকাণ্ড মিসাইল সাইলোর মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গেল ওদের বোট। বিশফুট উপরে ছাত থেকে

ঝুলছে স্টিলের ক্যাটওয়াক ।

এদিকে স্টারবোর্ডের দরজা তলিয়ে যেতেই ধাওয়া বাদ দিয়ে কাছের মই লক্ষ্য করে রওনা হয়েছে ডেভিড এন. হেব্রিক এবং তার লোক, উঠবে হোল্ডের ছাতে ।

‘যোগ্য লোক,’ মন্তব্য করল কুয়াশা, ‘হেব্রিক ফোরডেকে উঠতে চাইছে । কাভার করবে প্রতিটি হ্যাচ । অপেক্ষা করবে । আমরা বেরুলেই... অথচ আমাদেরকে ওই পথে যেতেই হবে ।’

‘হয়তো অন্য পথে বেরোতে পারব,’ বলল রানা । ‘এই মুহূর্তে প্রথম কাজ: জাহাজ থেকে সরে যাওয়া । নিরাপদ কোথাও থেমে ডিসআর্ম করব আমেরিকার শহরের দিকে তাক করা মিসাইল ।’

পকেট থেকে পাম পাইলট বের করল রানা, দেখে নেবে কোন্ নোয়া’য শিপ থেকে মিসাইল লঞ্চ করা হবে ।

আগে যেসব ডকুমেন্ট দেখেছিল, সেগুলো আবারও বের করল পাম পাইলটের স্ক্রিনে ।

বেছে নিতে চাইল সংক্ষিপ্ত লঞ্চ লিস্ট ।

কিন্তু বেরোল বিস্তারিত তালিকা ।

পরিচিত তিন জাহাজ ও জিপিএস লোকেশন দেখল রানা ।

তালিকায় লেখা:

সোর্স শিপ

ডেলিভারি সিস্টেম

ডাব্লিউএইচ

অরিজিন টার্গেট

টাইম

লোটার

বাউন্টি হান্টার্স-২

১৬৫

শাহাব-এস টিএনএবি

৫৬০১.০১ ০০০০১.৬৪

৫০০০২.০০ ৫২৩১.০০

১১.৪৫

সেইম

৩৫৭০১.২০ ০৪২১-০১

৫০০২.০০ ৪৯০০.২৪

১১.১৫

সেইম

৩৫৭০১-২০ ১২৩১৩-১৫

৫০০০২ ৫৩৫৮.৭৪

১১.৪৫

কর্পোরেশন

সেইম

২৮৭৪৪-০৫ ২৬৭৪৩-১৭

৪১০৫-৫৪ ৪১০৩.৬৪

১২.০০

সেইম

২৭৭৪৩-০৪ ২৬২৪১-০৪

৪১০৫-৫এস ৩৬৩৬-৬০

১২.০০

রুবল

টেক'ও-ডং-২ এন-৮ এনএফএল

১৬৬

রানা-৪৩৪

৩২২২২-বি৩ ২৩২২২-৬৯

৩৭৪৪-৭৬ ৩৭৪৫-৬৫

১২.১৫

সেইম

২৩২২২-৬৩ ২৪২৩০-৫০

৩৭৩৪-৭৫ ৩৪৩৩-০২

১২.১৫

সেইম

২৩১৫৭-০৬ ২৩১৫৬.৫০

৩৭৪৫-৭৪ ৪১৩১-৫১

১২.১৫

হোপ

স্কাই হর্স-৩ ডাব্লিউ ৮৮

১১১০০-০১ ১১৬২২১.৬০

২৩২৭-০১ ৪০০১-০০

১২.১৫

(টাইওয়ান স্ট্রাইটস) (বেইজিং)

সেইম

১১১০০-০১ ১১৪৪৫-৭০

২৩২৮-০০ ২২৪৩-২৮

১২.৩০

(টাইওয়ান স্ট্রাইটস) (হংকং)

বাউন্টি হাণ্টার্স-২

১৬৭

ঘৌরি-১১

০৭৭২৫-০৫ ২৩২৭-০১

২৩২৭.০১ ২৯৫৮.০৬

১২.৪৫

(অ্যারাবিয়ান সি) (নিউ দিল্লি)

অগ্নি-১১

০৭০৪০.৪৪ ০৭৩৩২-৬১

২৩২৭-০০ ৩২৩০-৫১

১২.৪৫

(অ্যারাবিয়ান সি) (ইসলামাবাদ)

পরবর্তী জাহাজ এমভি করপোরেশন। দুপুর বারোটোর সময় ২৮৭৪৪-০৫, ৪১০৫-৫৪ জিপিএস কো-অর্ডিনেটস্ থেকে আকাশে উঠবে মিসাইল।

জাহাজটা আছে নিউ ইয়র্কের উপকূলে, মনে পড়ল রানার।

কিন্তু কী যেন সমস্যা আছে এ তালিকায়, খেয়াল করে আগে দেখেনি।

না, এটা খবিরের পাঠানো আগের সেই তালিকা নয়।

বদলে গেছে কিছু।

স্কিনে আরেকটা তালিকা আনল রানা।

এই তালিকায় যোগ করা হয়েছে জাহাজের নতুন মিসাইলের নাম। লক্ষ্য করা হবে কয়েক ধরনের ব্যালিস্টিক মিসাইল। কোনও কোনওটা কমপক্ষে দুই ঘণ্টা পর রওনা হবে।

আরেকটা তফাৎ রয়েছে।

তাইওয়ানি এবং ইজরায়েলি মিসাইলে যোগ করা হয়েছে
আমেরিকান নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড— ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ডাব্লিউ-
৮৮...

পাশের পানিতে একপশলা বুলেট নামতেই চমকে গেল
রানা। মুখ তুলল, সিলিঙে ওঠা এক মইয়ের পাশে বোট এনেছে
কুয়াশা। কিছুক্ষণ আগেও ওই ছাত ছিল আশি ফুট উপরে।
এখন বড়জোর সতেরো ফুট উপরে ছাত। দ্রুত বাড়ছে পানির
উচ্চতা।

কিন্তু ক্যাটওয়াকের ষাট গজ দূরে দু'দিক থেকে তেড়ে
আসছে চারজনের ৬৬ ইউনিটের দুটো দল। সিলিঙের হ্যাচ খুলে
আবারও নেমে এসেছে তারা, গুলি করতে করতে তেড়ে
আসছে। রানাদের বোটের চারপাশের গার্ডারে বিঙ্গিং! বিঙ্গিং!
শব্দে ছিটকে আরেকদিকে ছুটছে বুলেট।

‘ডেকে উঠব সেজন্য অপেক্ষা করেনি, তোমার মাথা পাওয়ার
জন্যে ধাওয়া করছে,’ বলল কুয়াশা।

‘মই বেয়ে উঠুন, স্যার,’ তাড়া দিল নিশাত। হাত ধরে দাঁড়
করিয়ে দিল রানাকে। ‘কমপিউটার পরে দেখবেন!’

রানা মই বেয়ে উঠতে শুরু করতেই নিজের দেহ দিয়ে
কাভার করল নিশাত। গুলি লাগতে দেবে না রানার গায়ে।

রানার পর পর মই বেয়ে উঠতে লাগল নিশাত। পিছনে
কুয়াশা। একহাতে উঠছে ওরা, অন্যহাতে গুলি করছে শত্রু লক্ষ্য
করে। উঠে পড়ল ওরা ক্যাটওয়াকে। চারপাশে অসংখ্য ফুলকি
তৈরি করে ছিটকে যাচ্ছে বুলেট।

ক্যাটওয়াকে কাভারিং পজিশন পেয়ে গেল নিশাত। ওর
দিকে পিঠ রেখে শত্রুদের দিকে গুলি ছুঁড়ল কুয়াশা ও রানা।

চারপাশে বিঙ্গিং! বিঙ্গিং! আওয়াজ।

নানাদিকে ছিটকে যাচ্ছে বুলেট।

স্টার্নের দিক থেকে ছুটে আসা ৬৬ ইউনিটের লোক লক্ষ্য করে গুলি করছে রানা ও কুয়াশা, কিন্তু হঠাৎ করেই ফুরিয়ে গেল রানার অস্ত্রের ম্যাগাজিন।

‘আসলেই কোথাও যেতে চাও, রানা?’ গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল কুয়াশা।

‘হ্যাঁ, চাই,’ বলল রানা। ‘এমন কোথাও, যেখানে স্থির হয়ে বসে ডিসআর্ম করতে পারি সব মিসাইল।’

‘তা হলে আগে এই পোড়া জাহাজের মরণফাঁদ থেকে বেরুতে হবে। এদিকে দেখো!’ হঠাৎ করেই ডানদিকে ঘুরেই ছুট লাগাল কুয়াশা। ক্যাটওয়াকের টি-জাংশনে ছোট এক মেইনটেন্যান্স শ্যাক পেরিয়ে গেল। সামনেই দুই হলদে রঙের মিনি-সাবমেরিন। ছাত থেকে শিকলে ঝুলছে ও-দুটো।

ক্যাটওয়াকের মতই এখন আর অনেক উপরে নেই সাবমেরিন দুটো। পানি-সমতল থেকে ষোলো ফুট উপরে। দুই সাবমেরিনকে উপর থেকে ঘিরেছে ঢাকনি। ৬৬ ইউনিটের খুনিদের কাছ থেকে অনেকটা কাভার দিচ্ছে রানাদেরকে ওই ঢাকনি।

পিছলে নানাদিকে ছুটছে বুলেট।

রানা-কুয়াশার পনেরো গজ পিছনে টি-জাংশনে মেইনটেন্যান্স শ্যাকের সামনে পৌঁছে গেছে নিশাত। এখনও ৬৬ ইউনিটের বাউন্টি হাণ্ডারদেরকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করছে। মাত্র বিশগজ দূরে লোকগুলো। রানাদের দিকেও ওই একই দূরত্বে পৌঁছে গেছে তাদের দ্বিতীয়দল।

রানা দেখল, মিনি-সাবের দিকে এগুতে চাইল নিশাত, কিন্তু পারল না। বাধা হয়ে দাঁড়াল অসংখ্য বুলেট।

মেইনটেন্যান্স শ্যাকের ভিতর ঢুকে আড়াল নিল নিশাত।

ও আর এদিকে আসতে পারবে না, মনটা ভীষণ ছোট হয়ে

গেল রানার। ‘আপা!’ থোট মাইকে ডাকল।

‘ভাইডি, চলে যাও,’ রেডিয়োতে বলল নিশাত।

মেটালস্টর্ম বুলেট ঝাঁঝরা করতে শুরু করেছে শ্যাক।

নিশচয়ই চোখের আড়ালে সরে যেতে চাইছে নিশাত, ভাবল রানা। নিশচয়ই গুলি লেগেছে।

না, আবারও দরজায় দেখা দিল নিশাত। ঝড়ের মত গুলি করছে, পর পর দুই বাউন্টি হান্টারকে নরকে পাঠিয়ে দিল। ‘রানা! আমি চলে যেতে বলেছি!’ ধমকের সুরে বলল রেডিয়োতে।

‘না, আপা, আপনাকে ফেলে যাব না!’ পাল্টা জানাল রানা।

‘খবরদার! বলছি যাও!’ আরেক দফা গুলি ছুঁড়ল নিশাত। আগেই লুকিয়ে পড়েছে ৬৬ ইউনিটের লোক।

‘সম্ভব না, আপা!’

‘যাও, ভাইডি,’ ভেজা স্বরে বলল নিশাত। ‘আমার মত বুড়ি মেয়েলোকের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লাখ লাখ মানুষকে বাঁচানো।’ শ্যাকের ভিতর থেকে রানার দিকে চেয়ে আছে নিশাত। ‘তোমাকে বাঁচতে হবে, ভাইডি! আমার কাজ আমাকে করতে দাও! যাও, আর দেরি কোরো না, যাও! যাও! যাও!’

রানা কিছু বলবার বা করবার আগেই দেখল, ভয়ানক সাহস নিয়ে আত্মহত্যার পথে পা বাড়াল নিশাত।

জানালার সামনে সিধে হয়ে দাঁড়াল ছয় ফুটি নিশাত, বিকট এক হুঙ্কার ছেড়ে দু’হাতের দুই অস্ত্র থেকে গুলি শুরু করল দু’দিকের ৬৬ ইউনিট সদস্যদের লক্ষ্য করে।

নিজেদের অবস্থানে থমকে গেল লোকগুলো। এ ধরনের সাহসিকতার সঙ্গে পরিচিত নয়। তাদের সামনের লোকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল বুলেটের আঘাতে। বুক থেকে ছিটকে বেরোল ঝর্নার মত রক্ত। রানা ও কুয়াশাকে সরে যাওয়ার সুযোগ করে

দিয়েছে নিশাত ।

‘রানা, জলদি!’ ধমকের সুরে বলল কুয়াশা, টিপে দিয়েছে সাবের উপরের হ্যাচ বাটন । সড়াৎ করে খুলে গেল গোল হ্যাচ । ‘নিশাতের আত্মত্যাগকে কিছুতেই বৃথা হতে দিয়ো না!’

পা গলিয়ে হ্যাচে ঢুকতে গিয়েও নিশাতের দিকে চাইল রানা, টের পেল ভিজে গেছে চোখের পাতা ।

দু’দিক থেকে তুমুল গুলির তোড়ে পিছাতে হচ্ছে নিশাতকে ।

‘বিদায়, আপা,’ বিড়বিড় করল রানা ।

মেটালস্টর্ম রাইফেলের অসংখ্য বুলেট বুকে নিয়ে ছিটকে পড়ল নিশাত । বুলেটের আঘাতে কুঁকড়ে যাচ্ছে চেস্ট আর্মার । তবুও ঝট করে উঠে বসল ও, টলছে ভীষণ, আর গুলি করতে পারল না । হাঁ হয়ে গেল মুখ, হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গেল দৃষ্টি—

• ধূপ করে পড়ল মেঝেতে ।

আগ্নেয়াস্ত্রের ধোঁয়া ও উড়ন্ত কাঁচের ভিতর পড়ে রইল, বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা ।

শ্যাকের জানালা দিয়ে আর ওকে দেখতে পেল না রানা ।

৬৬ ইউনিটের দুই দল লোক শেষ করে দিয়েছে মস্ত সাহসী এক নরম মনের মেয়েকে, যে কি না রানার দলের সবার দেখভাল করত দক্ষ নার্সের মত করে ।

একইসময়ে মেইনটেন্যান্স শ্যাক লক্ষ্য করে রকেট লঞ্চ করল ৬৬ ইউনিটের দুই দল ।

নিশাতের ছোট্ট ঘরে গিয়ে নামল দুই রকেট ।

বুম্! আওয়াজ তুলল দুই বোমা ।

চারদিকে ছিটকে গেল চার দেয়াল ।

বিস্ফোরিত হয়েছে সবই ।

রইল শুধু মসৃণ মেঝে ।

চোদ্দ ফুট নীচে কলকল করে বাড়ছে পানি ।

সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল রানা, কিন্তু
ঠেলে ওকে ভিতরে পাঠাল কুয়াশা।

‘না, রানা! আমাদেরকে যেতে হবে!’ গুলির আওয়াজের
উপর দিয়ে শোনা গেল ওর কড়া স্বর।

আরেক ধাক্কায় রানাকে সাবমেরিনে ঢুকিয়ে দিল কুয়াশা।

কিন্তু সাবমেরিনের মেঝেতে পা স্পর্শ করবার আগেই রানা
দেখল, সরাসরি ওর মুখ লক্ষ্য করে আসছে তলোয়ারের ক্ষুরধার
ফলা।

হতবাক রানার রিফ্লেক্স কাজ করল।

ঝট্ করে খালি এইচঅ্যাওএইচ পিস্তল তুলে ঠেকাতে চাইল
তলোয়ার। জোরালো ঠং আওয়াজ উঠল ইস্পাতে ইস্পাতে। ওর
পিস্তলের ট্রিগার গার্ডে লেগেছে ফলা, গলার এক ইঞ্চি দূরে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাশান মেজর মিখাইল পেদরোনভ!

হাতে খাটো ফলার কসাক তলোয়ার। চোখ ভরা ঘৃণা।

‘ভুল জায়গায় লুকাতে এসেছ,’ দাঁতে দাঁত চেপে বলল
মেজর।

রানা নড়ে উঠবার আগেই দেয়ালের দুটো বাটন টিপে দিল
সে।

প্রথমটা ইন্টারনাল হ্যাচ বাটন।

ভূটশ্ আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল স্টিলের দরজা।

দ্বিতীয় সুইচ ‘এএসডিএস’ রিলিজ বাটন।

রানা টের পেল, হঠাৎ খালি হয়ে গেছে ওর তলপেট।

শিকল থেকে খসে পড়েছে মিনি-সাবমেরিন। চোদ্দ ফুট
উপর থেকে পড়তেই চারপাশে ছিটকে গেল পানি।

‘কী ব্যাপার!’ অবাক সুরে বলল কুয়াশা। ‘কী হচ্ছে?’

মাত্র এক সেকেণ্ড আগে রানাকে ঠেলে হলদে সাবমেরিনে
ভরছিল ও, দেখল বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাচ, পরক্ষণে গোটা জলযান

ধুপ্ করে গিয়ে পড়ল পানির ভিতর!

কুয়াশার চারপাশের গার্ডারে লেগে পিছলে যাচ্ছে ৬৬
ইউনিটের হাইপারচার্জড্ বুলেট।

মেইনটেন্যান্স শ্যাক পেরিয়ে ছুটছে লোকগুলো ওর দিকেই।
উঠে পড়ল সাবমেরিন ক্যাটওয়াকে।

বাধ্য হয়ে একমাত্র কাজটিই করল কুয়াশা। ডাইভ দিয়ে
পড়ল দ্বিতীয় সাবমেরিনের গায়ে। ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট
চারপাশ দিয়ে।

প্রাণ বাঁচাতে লড়ছে রানা ও পেরোনভ।

কোনও নিয়ম মানছে না কেউ।

এখন কাজে আসবে না কোনও কৌশল।

রাস্তার ছেলেদের মারামারির মতই লড়াই চলছে।

মিনি-সাবমেরিনের বদ্ধ জায়গায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ওরা, লাথি
দিচ্ছে, ঘুষি মারছে পরস্পরের অণুকোষ লক্ষ্য করে।

রানার হাতের অস্ত্র খালি, কিন্তু পেরোনভের কসাক
তলোয়ার অন্য জিনিস।

সেকারণেই সাবমেরিন পানিতে পড়তেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে
রানা। পেরোনভের কজির উপর নামিয়ে এনেছে পিস্তলের
বাঁট।

রাশান তার তলোয়ার ছেড়ে দিতেই শুরু হয়েছে কুস্তি।

আগুন জ্বলছে রানার হৃদয়ে, এইমাত্র হারিয়ে বসেছে তার
প্রিয় আপাকে। ভয়ঙ্কর জেদ কাজ করছে ওর মনে।

এদিকে খুন করতে ভালবাসে সাইকোপ্যাথ পেরোনভ।

একে অপরকে ছিটকে ফেলছে সাবমেরিনের দেয়ালে। মনে
বিষ, প্রতিটি আঘাতে রক্ত বের করছে শত্রুর।

এক ঘুষিতে পেরোনভের চোয়ালের হাড় ভেঙে দিল রানা।

রানার নাকের হাড় ভাঙল পেরোনভ । তার আরেকটা ঘুষি
খসিয়ে দিল ওর ইয়ারপিস ।

নিখুঁতভাবে রানাকে ট্যাকল করল পেরোনভ, ছিটকে
ফেলল সাবমেরিনের কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ।

চাপ পড়েছে কোনও বাটনে, সঙ্গে সঙ্গে ডুবতে লাগল মিনি-
সাব ।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে নিজেকে সরিয়ে আনল রানা,
তারই ফাঁকে দেখল ব্যালাস্ট বাটন অন হয়েছে ।

গভীরে রওনা হয়েছে এএসডিএস ।

হঠাৎ করেই পানির নীচে ডুব দিল সাবমেরিন । দু'দিকের
দুই হেমিস্ফেরিক গম্বুজ দিয়ে রানা দেখল, তলিয়ে গেছে গোটা
মিসাইল হোল্ড ।

চারপাশ বড় নীরব ।

যেদিকে চোখ যায়, শুধু গাঢ় নীল ।

জাহাজের মেঝে, মিসাইল সাইলো, মৃতদেহ— সবই
সাগরের নীচে ।

স্টারবোর্ডে কাত হয়েছে এমভি লোটাস । কমপক্ষে বিশ
ডিগ্রি হেলে পড়েছে মেঝে ।

সাবের মেঝে থেকে তলোয়ার কুড়িয়ে নিয়েছে পেরোনভ ।

ধীর গতিতে নেমে চলেছে মিনি-সাবমেরিন ।

আবারও পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা ।

একপাশ থেকে তলোয়ার চালিয়েছে রাশান মেজর ।

তলোয়ার নেমে আসবার সময় খপ করে পেরোনভের কজি
ধরে ফেলল রানা ।

ভোঁতা আওয়াজ শুনল ওরা । মিসাইল হোল্ডের মেঝেতে
নেমেছে এএসডিএস । জাহাজের হেলে পড়া মেঝেতে নেমে
স্টারবোর্ডের কার্গো দরজার দিকে রওনা হয়েছে সাবমেরিন ।

বাঁকা হয়ে গেল রানার দুনিয়া ।

বেকায়দাভাবে সাবমেরিন রওনা হতেই পা পিছলে ভারসাম্য হারাল রানা ও পেরোনভ, পড়ে গেল মেঝেতে ।

এমভি লোটারের ডোরওয়াটে পৌঁছে গেছে সাবমেরিন ।
পরক্ষণে খসে পড়ল খোলা সাগরে ।

ছোট্ট হলদে সাবমেরিন নামতে লাগল সাগর-তল লক্ষ্য করে ।
নীচে ইংলিশ চ্যানেলের কালো জল, মাথার উপর এমভি লোটার ।

মাথার উপরে যেন প্রকাণ্ড কোনও মহাকাশযান ।

অথবা মস্ত নীল তিমি, চাপা দেবে সামান্য কোনও পোকাকে !

ধীরে নামছে সুপারট্যাঙ্কার ।

কিন্তু ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরা, ফলে এক্সপ্রেস এলিভেটরের মতই নেমে চলেছে মিনি-সাবমেরিন ।

আঁরও কিছু ঘটছে ।

খাড়াভাবে নামতে লাগল হলদে সাবমেরিন ।

ইংলিশ চ্যানেলের গড় গভীরতা এক শ' বিশ মিটার ।
অবশ্য, এখানে শারবার্গের সাগরের গভীরতা মাত্র এক শ' মিটার ।
এই সামান্য দূরত্ব পেরোতে বেশিক্ষণ লাগবে না খুদে সাবমেরিনের ।

প্রায়াক্ষকার পরিবেশে লড়ছে রানা ও পেরোনভ । মিনি-সাবের ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে আসছে নীলচে ভুতুড়ে আলো ।

‘শালা, তোকে খুন করব, তারপর কেটে নেব তোর মাথা!’
গর্জে উঠল পেরোনভ । রানার হাত থেকে ঝটকা দিয়ে ছুটিয়ে নিতে চাইছে তলোয়ার ধরা হাতের কর্জি ।

এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে স্ট্যাণ্ডার্ড মুভ নিয়েছে দু’জন ।
কিন্তু এবার মেরিনদের বলা ‘দ্য লেকটার মুভ’ ব্যবহার করতে

চাইল পেরোনভ। সভ্য মানুস ওভাবে লড়ে না।

বড় বড় দাঁত দিয়ে রানার গাল কামড়ে ধরতে চাইল সে।

চমকে গিয়ে ঝট করে মুখ পিছিয়ে নিল রানা। এ সুযোগটাই আশা করছিল পেরোনভ— ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল তলোয়ারের কজি। সাঁই করে তলোয়ার চালান রানার ঘাড় লক্ষ্য করে। কিন্তু ঠিক তখনই সাগরের তলে পৌঁছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সাবমেরিন। ধূপ করে মেঝের উপর আছাড় খেল দু'জন।

বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল ওরা।

লাফিয়ে সামনে বাড়ল পেরোনভ, একপাশ থেকে চালিয়েছে তলোয়ার। ওই একইসময়ে সামনে বেড়েছে রানা, ঢুকে পড়েছে পেরোনভের দুর্গে। ইউটিলিটি ভেস্ট থেকে ধাতব কী যেন নিয়েছে, ঝট করে ঢুকিয়ে দিয়েছে রাশানের মুখের ভিতর!

অবাক হওয়ারও সময় পেল না মিখাইল পেরোনভ, মাত্র বুঝতে শুরু করেছে, দ্বিধা না করেই কাছে চলে এসেছে শত্রু।

মাউন্টেনিয়ারিং পিটন অ্যাক্টিভেট করল রানা। চট করে সরিয়ে নিল নিজের মুখ। দৃশ্যটা দেখতে চায় না।

জোরালো স্ল্যাপ! আওয়াজ তুলল পিটন। ভয়ঙ্কর ঝটকা দিয়ে খুলে গেল কাঁকড়ার পায়ের মত দাঁড়া। পেয়েও গেল আঁকড়ে ধরবার মত জায়গা— গাঁথে গেল পেরোনভের উপর এবং নীচের চোয়ালে।

কী ঘটল, ভালভাবে দেখল না রানা, কিন্তু শুনল পরিষ্কার।

অসুস্থকর কড়াৎ আওয়াজ তুলে বুকের দিকে নামল পেরোনভের নীচের চোয়াল। কিন্তু ওটার এতটা নীচে আসবার কথা নয়।

ঘুরে রানা দেখল, ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে পেরোনভের মুখের। খুলে গেছে নীচের চোয়াল, ভেঙেও গেছে। উপরের

চোয়ালে আরও বেশি ক্ষতি করেছে পিটন। কয়েকটা দাঁড়া
আঁচড় কেটেছে পেরোনভের মগজে।

হঠাৎ করেই থমকে গেছে লোকটা, থরথর করে কাঁপছে
গোটা দেহ।

দু'হাঁটুর উপর ভর দিয়ে ধুপ্ করে বসে পড়ল রাশান
মেজর।

অনায়াসেই তার তলোয়ারটা নিল রানা, সিধে হয়ে দাঁড়াল
শত্রুর সামনে।

পিটপিট করে ওকে দেখছে পেরোনভ।

রানার ক্ষিপ্ত মন চাইল কেটে নেবে মেজরের মাথা। ওই
কাজই করে লোকটা অন্যদের প্রতি।

কিন্তু তলোয়ার তুলল না রানা।

বুঝে গেছে, চাইলেও এ কাজ করতে পারবে না।

দু'হাঁটুর উপর ভর করে টলছে পেরোনভ, আরও কয়েক
সেকেণ্ড ওভাবে বসে রইল, তারপর দড়াম করে মুখ খুবড়ে পড়ল
মেঝেতে। মস্ত হাঁ করা মুখ থেকে গলগল করে বেরোল রক্ত।

লড়াই শেষ।

আবারও খুলে যাওয়া ইয়ারপিস কানে আটকে নিল রানা।
শুনল কুয়াশার কণ্ঠ, 'রানা! সাড়া দাও! তুমি কি বেঁচে আছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রানা। 'সাগরের নীচে। আপনি কোথায়?'

'অন্য সাবমেরিনে। তোমার সাবমেরিনের বাইরের বাতি
জ্বালো।'

তাই করল রানা।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল কুয়াশা।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

জবাব দিল না কুয়াশা, পাঁটা জানতে চাইল, 'সাবমেরিনে
পাওয়ার আছে?'

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে কয়েকটি বাটন টিপল রানা। চাপু ধলো
না ইঞ্জিন। ‘অক্সিজেন আছে, কিন্তু প্রপালশানের উপায় নেই।
কেন, আপনি নেমে আসতে পারবেন না? হয়তো সরিয়ে নিতে
পারবেন আমাকে?’

‘ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না।’

‘ঠিক সময় মানে? সমস্যা কী?’

‘বিশাল... আ... সমস্যা...’

‘সমস্যাটা কী খুলে বলুন।’

‘উপরের দিকে তাকাও।’

সাবমেরিনের গম্বুজের ভিতর দিয়ে উপরে চাইল রানা।

এবার সব পরিষ্কার দেখল।

নেমে আসছে প্রকাণ্ড সুপারট্যাঙ্কারের খোল!

যেন চাঁদের মস্ত এক টুকরো!

সোজা আসছে ওর দিকেই!

টোক গিলল রানা। বুঝে গেছে, ওর সাবমেরিনের উপর
চেপে বসবে এক লক্ষ দশ হাজার টনি সুপারট্যাঙ্কার।

এতই বড়, নেমে আসবার সময় সাগরে তৈরি করছে
কম্পন।

র্-র্-র্-র্-র্-র্-র্ শব্দটা ভীষণ ভীতিকর।

‘আগে কখনও এই দৃশ্য দেখিনি,’ বিড়বিড় করল রানা। চট্
করে মাইকে বলল, ‘কুয়াশা?’

‘ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না,’ হতাশ স্বরে বলল
বৈজ্ঞানিক।

ডানে-বামে চাইল রানা।

কোনও উপায় খুঁজতে হবে। সাঁতার কেটে জাহাজের আওতা
থেকে বেরোতে পারবে না। ওই মাল এক হাজার ফুট লম্বা,
চওড়ায় দুই শ’ ফুট।

এবার চিঁড়ে চ্যাপ্টা হবে ও!

বাঁচবার উপায় নেই!

কিন্তু মৃত্যুর আগে একটা কাজ করতে পারে। সেটা হবে মস্ত একটা অর্জন।

ইংলিশ চ্যানেলের তলে স্যাটালাইট মাইক চালু করল রানা।

‘খবির! নিউ ইয়র্কে তোমার অবস্থা কী?’

‘দখল করে নিয়েছি করপোরেশন। মারা পড়েছে শত্রুরা। এখন আমাদের হাতে কন্ট্রোল কন্সোল। ওটার সঙ্গে স্যাটালাইট আপলিঙ্ক যোগ করে দিয়েছি। এখন এগারোটা বায়ান্ন। ডিসআর্ম করার জন্য আট মিনিট পাবেন, স্যর।’

উপরে চাইল রানা। নেমে আসছে সুপারট্যাঙ্কার। প্রায় নীরব এক মস্ত দানব। যে গতিতে নামছে, একমিনিট পেরোবার আগেই সাগর-তলে পৌঁছবে।

‘তোমার হাতে আট মিনিট, খবির, কিন্তু আমার হাতে সময় নেই,’ শান্ত স্বরে বলল রানা। ‘এখনই ডিসআর্ম করতে হবে মিসাইল।’

দেরি করল না রানা, ওয়ারটারফ্রন্ট পাউচ থেকে বের করল টাচলক-৯ ইউনিট, ওটার সঙ্গে যুক্ত করল স্যাটালাইট আপলিঙ্ক।

চালু হয়ে গেছে ইউনিট:

স্যাট-লিঙ্ক: কানেক্ট ‘করপোরেশন-০৫’-আপলিঙ্ক

কানেকশন মেড।

অ্যাকটিভেট রিমোট সিস্টেম।

মিসাইল লঞ্চ সিকিউয়েন্স ইন প্রগ্রেস।

প্রেস ‘এন্টার’ টু ইনিশিয়েট ডিসআর্ম সিকিউয়েন্স।

ফার্স্ট প্রটোকল (প্রক্সিমিটি) স্যাটিসফায়েড।

ইনিশিয়েট সেকেন্ড প্রটোকল।

নিউ ইয়র্কের জাহাজের মিসাইল কন্ট্রোল কন্সোলের লাফ ও সাদা
বৃত্ত দেখা দিল রানার স্ক্রিনে।

চট করে একবার উপরে চাইল রানা।

নীল সাগর চিরে নামছে প্রকাণ্ড এমভি লোটার জাহাজ।

দ্বিতীয়বার ওদিকে চাইল না রানা, চালু করল ডিসআর্ম
সিকিউয়েন্স।

নেমে আসবার গতি বেড়েছে সুপারট্যাঙ্কারের...

আগের চেয়ে দ্রুত আঙুল চলছে রানার।

আশি ফুট উপরে সুপারট্যাঙ্কার।

দপ করে জ্বলে উঠল একটা লাল বৃত্ত, ওটা স্পর্শ করল
রানা।

এখন সত্তর ফুট উপরে এমভি লোটার...

ষাট...

চারপাশের সাগরে সুপারট্যাঙ্কার থেকে ছড়িয়ে পড়ছে
জোরালো র্র্র্র্রম্মম্মম্মম্ম! আওয়াজ।

পঞ্চাশ ফুট...

চল্লিশ...

শেষ লাল বৃত্ত স্পর্শ করল রানা। টিপটিপ করে জ্বলে উঠল
ডিসপ্লে:

সেকেণ্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):

স্যাটিসফায়েড।

থার্ড প্রটোকল (কোড এন্ট্রি):

অ্যাকটিভ।

প্লিয এন্টার অথোরাইজড ডিসআর্ম কোড।

ত্রিশফুট, তারপর চেপে বসবে এমভি লোটাস!

ছোট্ট সারমেরিনের চারপাশের পানি কালচে হয়ে উঠেছে।
উপর থেকে ছায়া ফেলেছে মস্ত জাহাজ।

রানা ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড এন্ট্রি করল:

৪,৩১,১২,৬০৯

থার্ড প্রটোকল (কোড এন্ট্রি):

স্যাটিসফায়েড।

অথোরাইজড ডিসআর্ম কোড এন্টার্ড

মিসাইল লঞ্চ অ্যাবোর্টেড।

মৃদু হাসল রানা। ভাবল, সবই শেষ হয় একসময়। সবই। দুঃখই বা কীসের? সাধ্যের বাইরে কিছুই তো আর করা যায় না।

ওর মনটা চাইল চোখ বুজে অপেক্ষা করবে। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেয়ে রইল নেমে আসা মস্ত জাহাজের দিকে।

মনে পড়ল সোহানার অপূর্ব হাসি। মিষ্টি হাসত রেবেকা সাউল, ওকে বা সুলতাকে ফেরাতে পেরেছে ও? তিশা? সুস্থ হয়ে উঠবে, কখনও ভাববে ওর কথা। আগেই বিদায় নিল নিশাত আপা। জীবনটা দিয়েই দিল ওর জন্যে। ...আচ্ছা, যখন শুনবে রানা আর নেই, চোখ ভিজে যাবে কউর বুড়োর? সোহেল বোধহয় চাকরি ছেড়ে দেবে। গিল্টি মিয়া যখন জানবে ও নেই, বুক চাপড়ে হাউমাউ করে কাঁদবে। আর রাঙার মা... এবার আর পীরের দরবারে যাবে না কিছুতেই। আর কখনও না। ...রানা এজেন্সির দায়িত্ব বুঝে নেবে কেউ। কিছুই থেমে থাকে না কারও জন্যে।

আরও মিসাইল থাকলে অন্য কেউ ঠেকাবে ওগুলোকে।

মায়াভরা এই পৃথিবীটা সত্যি সুন্দর ছিল, ভাবল রানা। এবং খুব হঠাৎ করেই বিদায় নিতে হচ্ছে ওকে।

বড়জোর বিশ সেকেণ্ড?

সত্যিই বড় দ্রুত নেমে এল সুপারট্যাঙ্কার।

থরথর করে কাঁপতে লাগল সাগরতল।

চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল বিকট বুম! আওয়াজ।

নানাদিকে ছিটকে গেল বালির মেঘ।

কিন্তু তখন সাবমেরিনের ভিতর নেই রানা।

এমভি লোটাস বিশফুট উপরে পৌঁছতেই চারপাশে আরও কালো ছায়া ফেলল জাহাজটা। নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল রানা। তখনই শুনল এএসডিএসের গায়ে ভোঁতা ধাতব আওয়াজ।

ঝট করে ওদিকে চাইল রানা। অবাক হলো খুব, ওর ছোট সাবমেরিনের ধাতব দেহে আটকে গেছে একটা ম্যাগন্থক। ওটার দড়ি জাহাজের খোলের ওপাশে।

কানের ভিতর ধমকে উঠল কুয়াশা: ‘রানা! জলদি! বেরোও!’

ঝড়ের গতিতে কাজে নামল রানা। মাত্র একবার দম নিল, পরক্ষণে টিপে দিল হ্যাচ বাটন।

হ্যাচ খুলতেই হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল পানি। মাত্র দু’ সেকেণ্ড লাগল সাবমেরিন পুরে যেতে। মুহূর্তে বেরিয়ে এল রানা, খপ করে ম্যাগন্থকের দড়ি ধরে দুটো টান দিল।

ওই একইসময়ে দড়ির অপরপ্রান্তে হকের ডিম্যাগনেটাইয সুইচ টিপে দিয়েছে কুয়াশা। লঞ্চার বিদ্যুৎদ্বিগে টানতে লাগল দড়ি। সাগরের তলে রওনা হলো রানা। ওর মাথার একটু উপরে নামছে সুপারট্যাঙ্কার। মাত্র তিনফুট নীচে ঝড়ের গতিতে সরসর করে পিছিয়ে চলেছে বালির এবড়োখেবড়ো প্রান্তর।

পাঁচ সেকেণ্ড পর জাহাজের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল রানা। ওর দু’পায়ের আধ ফুট পিছনে ইংলিশ চ্যানেল কাঁপিয়ে নেমে এল সুপারট্যাঙ্কার। প্রচণ্ড আওয়াজে কানের তালু ঝনঝন করে উঠল ওর। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল বিপুল বালি, সেই মেঘের ভিতর

দিয়ে এগিয়ে চলল রানা।

মেঘের ওদিকে ওর জন্য অপেক্ষা করছে কুয়াশা, বসে আছে দ্বিতীয় এএসডিএস-এর হ্যাচে। একহাতে নতুন পনি বটল। অন্যহাতে তিশার ম্যাগলুক।

রানা পৌছতেই ওর হাতে পনি বটল ধরিয়ে দিল কুয়াশা।

বড় করে দু'বার দম নিল রানা।

দশ সেকেণ্ড পেরোবার আগেই মিনি-সাবে ঢুকল ওরা। নতুন করে সাব রিপ্রেসারাইন্স করল কুয়াশা। বের করে দিল বাড়তি পানি।

কিছুক্ষণ পর বিক্ষুব্ধ, বৃষ্টিস্নাত ইংলিশ চ্যানেলে ভেসে উঠল দুই দুঃসাহসী বাঙালি যুবকের হলদে সাবমেরিন। মস্ত সব ঢেউ ডুবিয়ে দিতে চাইল ওদেরকে। তখনই সাবের উপর পড়ল অত্যুজ্জ্বল হ্যালোজেন স্পটলাইট। মাত্র দশফুট উপরে কালো শকুন নিয়ে নেমে এসেছে রঘুপতি।

বারো

স্থানীয় সময়: সন্ধ্যা ছয়টা পাঁচ মিনিট।

এখন আমেরিকার ই.এস.টি. বারোটা পাঁচ মিনিট।

ইংলিশ চ্যানেলের আকাশে দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে বিদ্যুৎধেগে ছুটছে কুয়াশার কালো শকুন।

চুপচুপে ভেজা পোশাকে গানারের সিটে বসে পড়েছে কুয়াশা। রানা অবশ্য পায়চারি করছে বিমানের বম বে-তে। বের করেছে

মডিফায়েড পাম পাইলট। বাকি রয়ে গেছে এখনও কিছু কাজ।

আবারও মিসাইল উৎক্ষেপের তালিকা বের করেছে। তিন তালিকা তুলনা করে দেখবে।

আগের দুই তালিকার প্রথম তিন জাহাজ ঠিকই আছে। কিন্তু পাল্টে গেছে শেষের জাহাজগুলোর মিসাইল।

সোর্স শিপ

ডেলিভারি সিস্টেম

ডাব্লিউএইচ

অরিজিন টার্গেট

টাইম

হোপ

স্কাই হর্স-৩ ডাব্লিউ চচ

১১১০০-০১ ১১৬২২১.৬০

২৩২৭-০১ ৪০০১-০০

১২.১৫

(টাইওয়ান স্ট্রাইটস) (বেইজিং)

সেইম

১১১০০-০১ ১১৪৪৫-৭০

২৩২৮-০০ ২২৪৩-২৮

১২.৩০

(টাইওয়ান স্ট্রাইটস) (হংকং)

ডলফিন

ঘোঁরি-২

০৭৭২৫-০৫ ২৩২৭-০১

বাউন্টি হান্টার্স-২

১৮৫

২৩২৭.০১ ২৯৫৮.০৬

১২.৪৫

(অ্যারাবিয়ান সি) (নিউ দিল্লি)

অগ্নি-২

০৭০৪০.৪৪ ০৭৩৩২-৬১

২৩২৭-০০ ৩২৩০-৫১

১২.৪৫

(অ্যারাবিয়ান সি) (ইসলামাবাদ)

জ্যাকিউলিন

জেরিকো-২বি ডাব্লিউ-৮৮

০৪৪০২.২৪ ০৪১৪৫.০৯

১৬৫০.৪৯ ২১৩০.০১

১৪.০০

.....
শেষের জাহাজটা আগে ছিলই না।

প্রথম দু'জাহাজের জিপিএস লোকেশন কী আগেই জানিয়েছে
খবির।

সোর্স শিপ ডেলিভারি সিস্টেম ডাব্লিউএইচ অরিজিন টার্গেট টাইম

হোপ

স্কাই হর্স-৩ ডাব্লিউ ৮৮

১১১০০-০১ ১১৬২২১.৬০

২৩২৭-০১ ৪০০১-০০

১২.১৫

১৮৬

রানা-৪৩৪

(টাইওয়ান স্ট্রাইটস) (বেইজিং)

সেইম

১১১০০-০১ ১১৪৪৫-৭০

২৩২৮-০০ ২২৪৩-২৮

১২.৩০

(টাইওয়ান স্ট্রাইটস) (হংকং)

ডলফিন

ঘোরি-২

০৭৭২৫-০৫ ২৩২৭-০১

২৩২৭.০১ ২৯৫৮.০৬

১২.৪৫

(অ্যারাবিয়ান সি) (নিউ দিল্লি)

অগ্নি-২

০৭০৪০.৪৪ ০৭৩৩২-৬১

২৩২৭-০০ ৩২৩০-৫১

১২.৪৫

(অ্যারাবিয়ান সি) (ইসলামাবাদ)

.....

রানা টের পেল, হঠাৎ করেই গোটা পরিস্থিতির নতুন ডিমেনশন এনে দিয়েছে এ তালিকা।

এমভি হোপ জাহাজ থেকে বেইজিং ও হংকঙের উপর যে মিসাইল ফেলা হবে, ওগুলো তাইওয়ানের স্কাই হর্স আইসিবিএম-এর ক্লোন। বোমা হিসাবে থাকছে আমেরিকান ওয়ারহেড।

বাউন্টি হান্টার্স-২

১৮৭

এদিকে এমভি ডলফিন থেকে নিউ দিল্লির উপর যে মিসাইল ফেলবে, ওটা পাকিস্তানি ঘৌরি-২ নিউক্লিয়ার মিসাইলের ক্লোন। আবার একই জাহাজ ইসলামাবাদে ফেলবে ভারতীয় অগ্নি-২-এর ক্লোন নিউক্লিয়ার মিসাইল।

‘সর্বনাশ...’ বিড়বিড় করল রানা।

তাইওয়ানিরা নিউক্লিয়ার স্ট্রাইক করলে পাল্টা কী ব্যবস্থা নেবে চিন?

স্রেফ উড়িয়ে দেবে ওই ছোট দ্বীপ।

ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পরের রাজধানীর উপর আণবিক বোমা ফেললে?

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশও।

রানা বুঝল না কেন খবিরের দেয়া তালিকার সঙ্গে এই তালিকা মিলছে না।

গভীরভাবে ভাবতে চাইল রানা।

কোথা থেকে এই তালিকা পেয়েছে খবির?

মোসাদ এজেন্ট ডেনিস ই. ম্যাকিনের কাছ থেকে। সে লোক বেশ কয়েক মাস চেষ্টা করে পেয়েছিল ম্যাজেস্টিক-১২-র কাছ থেকে।

আর নতুন এই তালিকা আমি পেয়েছি কোথা থেকে?

অতীত নিয়ে ভাবতে চাইল রানা।

‘ও... হ্যাঁ...’ কয়েক মুহূর্ত পর বলল।

মনে পড়েছে।

তখন তিশার পাশে ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়নের পাথুরে অ্যান্টি-রুমে বসে ছিল। আর কুয়াশা ছিল মোসিউ ড্যাবলারের অফিসে। হ্যাক করছিল লোকটার কমপিউটার।

হোল্ডের দরজা থেকে রানা জানতে চাইল, ‘কুয়াশা, আপনি

যখন ড্যাভলারের সঙ্গে দুর্গে ছিলেন, সে কি একবারও বলেছে ওই অফিস কার?’

কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। ‘হ্যাঁ। বলেছিল ওই অফিস তার নয়। ওটা দুর্গের মালিকের।’

‘ডেমিয়েন ডগলাস?’

‘হ্যাঁ, কেন?’

সবই বুঝতে পেরেছে রানা।

‘ওই অফিসে আরও একটা কমপিউটার চালু ছিল। কোনও ড্রয়ারে, বা সাইড টেবিলে। আপনি নিজেই বলেছিলেন, আপনার পাম পাইলট যে-কোনও কমপিউটারের হার্ড ডিস্ক থেকে ডকুমেন্ট হ্যাক করে। ওই কমপিউটার ছিল ডেমিয়েন ডগলাসের।’

‘তাতে সমস্যা কী?’

পাম পাইলটের স্ক্রিন উঁচু করে নতুন তালিকা দেখাল রানা। ‘এটা ম্যাজেস্টিক-১২-র প্ল্যান নয়। তারা গোটা দুনিয়া জুড়ে কোন্ড ওঅর তৈরি করতে চেয়েছিল। টেরোরিস্ট মিসাইল আঘাত হানবে। সেগুলো হবে শাহাব বা টেপ’ও-ডং-২। এজন্যেই গ্লোবাল জিহাদের টেরোরিস্টদের লাশ রেখেছিল ড্রাগন প্ল্যাণ্টে। একই কাজ করে সুপারট্যাঙ্কারে, যাতে সবাই বোঝে, টেরোরিস্টরা চুরি করেছে নোয়া’য শিপ।

‘কিন্তু এই তালিকা অন্যকিছু। ডগলাসের কোম্পানি একেবারে আলাদা লিয়ার্ড মিসাইল বসিয়েছে নোয়া’য শিপে— ওগুলোর কথা জানে না ম্যাজেস্টিক-১২। টেরোরিয়মের উপর গ্লোবাল ওঅর নয়, তার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় ডেমিয়েন। দুনিয়ার প্রতিটি শক্তিশালী দেশে পড়বে মিসাইল। আর দোষ পড়বে শত্রু দেশের।

‘পশ্চিমাদের উপর পড়বে টেরোরিস্টদের মিসাইল। ভারত আর পাকিস্তান একে অপরের উপর আণবিক বোমা ফেলবে।

চিনের শহরে পড়বে তাইওয়ানিদের মিসাইল।’

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

‘বাড়তি পদক্ষেপ নিয়েছে ডেমিয়েন ডগলাস। এটা এম-১২-র প্ল্যান নয়। ডগলাসের প্ল্যান এটা। এর ফলে কোনও কোন্ড ওঅর শুরু হবে না। অন্য কিছু হবে। গোটা দুনিয়া জুড়ে মহাযুদ্ধ বাধবে। শৃঙ্খলা বলতে দুনিয়ায় কিছুই থাকবে না।’

‘তার মানে তুমি বলছ, বড়লোক সংঘের সবাইকে বোকা বানিয়ে নিজেই যা করার করবে ডেমিয়েন ডগলাস?’ জানতে চাইল কুয়াশা।

‘ঠিক তা-ই বলছি,’ বলল রানা। ওর মনে পড়ল ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়নে ডেমিয়েনের বলা কথাটা: “কেউ কেউ আজও জানে না পৃথিবীর ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে ওই আফ্রিকায়।”

‘ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে আফ্রিকায়,’ বলল রানা, ‘প্রতিটি জাহাজে ছিল আফ্রিকান কমাণ্ডো। ইরিত্রিয়ান বা নাইজেরিয়ান।’ চট করে পাম পাইলটের স্কিনে নতুন ডকুমেন্ট আনল রানা। ‘আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার!’

স্কিনে লেখা:

একযেকিউটিভ ইটিনেরারি

দ্য প্রোপোযড অর্ডার অফ ট্র্যাভেল ইয অ্যায় ফলোয: আসমারা (২৪/০৬), লৌগা (২৪/০৬), আবুজা (২৭/০৬), নাযামেনা (২৭/০৬) এবং তব্রুক (২৯/০৬).

০১/০৭ – আসমারা (এম্বেসি)

০৩/০৭ – লৌগা (থাকছি ওলিফ্যান্টের ভাতিজার ওখানে)

গতবছর আফ্রিকায় যাওয়ার সময় এই যাত্রা তালিকা করেছিল

ডেমিয়েন ডগলাস ।

আসমারা: ইরিত্রিয়ার রাজধানী ।

লৌগা: অ্যাঙ্গোলার রাজধানী ।

আবুজা: নাইজেরিয়া ।

নাযামেনা: চাদ ।

অব্রুক লিবিরার সবচেয়ে বড় এয়ারফোর্স বেস ।

ডেমিয়েন ডগলাস গিয়ে ফ্যাক্টরি উদ্বোধন করছিল না । আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি দেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে ।

কীসের সেটা?

‘যদি দুনিয়ার শক্তিশালী দেশগুলো নিজেদের ভিতর যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে ওঠে,’ বলল রানা, ‘একবার ভেবেছেন দুনিয়ার অন্যান্য এলাকায় কী ঘটবে?’

‘পুরনো গায়ের ঝাল মেটাবে অনেক দেশ,’ বলল কুয়াশা । ‘নতুন করে শুরু হবে এথনিক ক্লিনসিং । সার্বরা খুন করবে ক্রোয়েটদের । রাশানরা শেষ করবে চেচেনদেরকে । কুর্দদের জবাই করবে ইরাক ও তুরস্ক । সুযোগসন্ধানীরা সুবিধা আদায় করবে । যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চেষ্টা করেছিল জাপান । অন্যদেশের উপর হামলা করবে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতামূলক দেশ । প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এলাকা দখল করবে । আমাদের বাংলাদেশের মত গরীব দেশকে পায়ের নীচে পিষে ফেলবে শক্তিশালী দেশ ।’ আস্তে আস্তে করে মাথা নাড়ল বৈজ্ঞানিক । ‘চারপাশে শুরু হবে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা ।’

আবারও জাহাজের তালিকা ক্রিনে আনল রানা ।

শেষ এন্ট্রির উপর চোখ পড়তেই নতুন করে মনোযোগ দিল ।

জেরিকো-২৮ ক্রোন মিসাইল, ভাবল রানা। ওটা লং-রেঞ্জ
ব্যালিস্টিক মিসাইল। ইজরায়েলের। ওই মিসাইলে থাকবে
আমেরিকার ডাব্লিউ-৮৮ ওয়ারহেড।

ওটার টার্গেট কী?

খবিরের আইপি-র ম্যাপ ব্যবহার করল রানা, প্লট করল
জিপিএস কোঅর্ডিনেটস।

ম্যাপ অনুযায়ী টার্গেট খুঁজতে শুরু করেছে রানার আঙুল।

পেয়েও গেল।

‘সর্বনাশ...’ বিড়বিড় করে বলল।

শেষ ক্রোন মিসাইল ইজরায়েলিদের, নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড
আমেরিকার তৈরি— টার্গেট সৌদি আরব।

মিসাইল আঘাত হানবে মক্কার কাবাঘরের ওপর।

ম্যাপ দেখছে কুয়াশা।

হঠাৎ করেই নীরবতা নেমেছে বিমানের ককপিটে।

আমেরিকার বোমা মাথায় নিয়ে মুসলিমদের সবচেয়ে পবিত্র
শহরে হামলা করবে ইজরায়েলিদের মিসাইল।

আজই হজ।

লাখে লাখে মুসলিম জড় হয়েছে মক্কায়।

ইচ্ছা করেই নির্দিষ্ট এই তারিখে আণবিক বোমা ফেলছে
ডেমিয়েন ডগলাস।

মক্কা উড়ে যাওয়ার পর পরই আগুন জ্বলে উঠবে গোটা দুনিয়া

জুড়ে। কোনও দেশে নিরাপদ থাকবে না কোনও মানুষ।

আণবিক হামলার পর স্বাভাবিকভাবেই চরম প্রতিশোধ নিতে চাইবে গোটা বিশ্বের মুসলমান।

এরপর যে মহাযুদ্ধ, তা আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিটি মুসলিম দেশের।

ওটাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

কিছুদিনের ভিতর ধ্বংস হবে গোটা মানব-সভ্যতা।

‘আজই হজ, কুয়াশা,’ বলল রানা। ‘হিসাব কষেই এই দিনটাকে বেছে নিয়েছে ডেমিয়েন ডগলাস।’

‘কোথা থেকে মিসাইল ফেলবে?’ জানতে চাইল কুয়াশা।

জিপিএস কো-অর্ডিনেটস অনুযায়ী শেষ লিয়ার্ড মিসাইলের লঞ্চ লোকেশন প্লট করল রানা। কুঁচকে উঠল ভুরু।

‘ওটা কোনও জাহাজ থেকে নয়,’ বলল। ‘স্থলভূমি থেকে। ইয়েমেনের ভেতর জায়গাটা।’

‘ইয়েমেন?’ রানার দিকে চাইল কুয়াশা। ‘সৌদি আরবের দক্ষিণের দেশ। মক্কা থেকে সামান্য দূরেই।’

‘ইয়েমেন...’ ভাবতে শুরু করেছে রানা। ‘ইয়েমেন...’

আমেরিকান সেনাবাহিনী ওকে সাইবেরিয়ায় পাঠানোর আগে ব্রিফ করেছিল। তখন শুনেছিল ইয়েমেনের কথা।

‘ইয়েমেনে আছে ক্রাস্ক-৮ ক্লোন মিসাইল,’ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল রানা, ‘কোল্ড ওঅরের সময় পাবলো-৯-এর ফ্যাসিলিটির মতই বেশকিছু দেশে ল্যাণ্ড বেইন্ড আইসিবিএম ফ্যাসিলিটি করেছিল সোভিয়েতরা। ক্রায়েন্ট দেশ ছিল সিরিয়া, সুদান ও ইয়েমেন।’

ঝড়ের মত ভাবছে রানা।

পাবলো-৯ শহরটা কিনে নিয়েছে স্করপিয়ন শিপিং কোম্পানি লিমিটেড। ওটা ডেমিয়েন ডগলাসের। ড্রাগন করপোরেশনের

সাবসিডিয়ারি ।

রানা চেয়ে আছে কুয়াশার দিকে । ‘আমাদের বোধহয় দক্ষিণ-পূব লক্ষ্য করে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত ।’

আস্তে করে মাথা দোলাল কুয়াশা । ‘এবং ব্যবহার করা উচিত আফটারবার্নার । ...রঘুপতি?’

প্রথমবারের মত দ্বিধা দেখা দিল রোবোটের চেহারায় । ‘বস্, একটা কথা... আমরা পূর্ণগতি তুললেও দু’ঘণ্টার ভেতর ইয়েমেনে পৌঁছুতে পারব না । ছয় হাজার কিলোমিটার পেরোতে হবে । কাজেই দরকার পড়বে কমপক্ষে চার ঘণ্টা সময় । তা ছাড়া, আফটারবার্নার ব্যবহার করলে যে অকটেন লাগবে, তাতে আমরা বড়জোর ফ্রেঞ্চ আল্পস পর্যন্ত যেতে পারব ।’

‘ফিউয়েল নিয়ে ভাবতে হবে না,’ বলল রানা, ‘আকাশেই রিফিউয়েলিঙের ব্যবস্থা করতে পারব । তা ছাড়া, আমরা সুখোই ফাইটার জেট নিয়ে ইয়েমেনে যাচ্ছি না ।’

‘আপনারা যা বলেন,’ বলল রঘুপতি । কাত করে নিল বিমান, রওনা হলো দক্ষিণ-পূব লক্ষ্য করে । চালু করেছে আফটারবার্নার ।

স্যাটালাইট মাইকে যোগাযোগ করতে চাইল রানা: ‘মিস্টার ডেলাক্রুস, আপনি কি এখনও লাইনে আছেন?’

‘জী,’ সংক্ষিপ্ত জবাব এল লণ্ডন থেকে ।

‘একটা কোম্পানির কী কী অ্যাসেট আছে জানতে চাই । ওটার নাম স্করপিয়ন শিপিং কোম্পানি । ইয়েমেনে ওদের স্থাবর কী আছে, জানা দরকার । বিশেষ করে ওটা যদি হয় পুরনো সোভিয়েত মিসাইল সাইট ।’

‘আরও দুটো ব্যাপারে সাহায্য চাই । প্রথম কথা, ইউরোপের এক্সপ্রেস প্যাসেজ লাগবে আমার । এ ছাড়া কয়েকবার মিড এয়ার রিফিউয়েলিং দরকার পড়বে । আপনাকে আমাদের ট্রান্সপণ্ডার সিগনাল পাঠিয়ে দেব ।’

‘জী। আর দ্বিতীয় কাজটি?’

‘আমার জন্যে বিশেষ দুটো আমেরিকান বিমানে ফিউয়েল ভরে রাখবেন। ওই দুই বিমান এখন আছে ইটালির মিলানের অ্যারোস্টাডিয়া ইটালিয়া এয়ারশোতে।’

পরের তিরিশ মিনিট ঝড়ের গতিতে কেটে গেল।

দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দেশের সরকারের নির্দেশে দেরি না করেই কাজে নামল নানাধরনের সশস্ত্রবাহিনী।

তেরো

আরব সাগর।

ভারত উপকূল থেকে সামান্য দূরে।

অক্টোবর ১৫।

স্থানীয় সময় রাত নয়টা পাঁচ মিনিট।

ইউএসএ, ই.এস.টি. দুপুর বারোটা পাঁচ মিনিট।

প্রায় শান্ত ভারত মহাসাগরে ভাসছে সুপারট্যাঙ্কার এমভি ডলফিন। যেন চেয়ে আছে ভারত ও পাকিস্তানের উপকূলের দিকে। উৎক্ষেপ করতে তৈরি পেটে রাখা মিসাইল নিয়ে।

জাহাজের কেউ জানল না, দুই মাইল পিছনে তেড়ে আসছে একটা লস অ্যাঞ্জেলেস-ক্লাস অ্যাটাক সাবমেরিন।

স্বাভাবিক কারণেই জাহাজের কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সাবমেরিনকে দেখতে পেল না আফ্রিকান কমাণ্ডেরা। এবং যখন পিছনে পৌঁছে গেল সাবমেরিন, জাহাজের রেডার সঙ্কেত দিল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

একইসময়ে এমভি ডলফিনে লাগল দুটো মার্ক-৭৮ টর্পেডো।
ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে তলি খসে গেল জাহাজের, একমিনিটও লাগল
না ডুবে যেতে।

তাইওয়ান স্ট্রেইটস।

চিন ও তাইওয়ানের মাঝের আন্তর্জাতিক জলসীমা।

স্থানীয় সময় রাত একটা দশ মিনিট।

অক্টোবর ১৫।

আমেরিকার ই.এস.টি. বারোটা দশ মিনিট।

অক্টোবর ১৪।

ভারতীয় মহাসাগরে এমভি ডলফিনের কপালে যা ঘটেছে,
ঠিক তাই হলো এমভি হোপ-এর।

তাইওয়ান স্ট্রেইটের সি লেনে নিশ্চিন্তে খাপ পেতে বসে ছিল
জাহাজটা। দূরে দুটো সুপারট্যাঙ্কার এবং একটি ফ্রেইটার। এমন
সময় এমভি হোপের তলি খসিয়ে দিল ওয়ায়ার-গাইডেড দুটো
আমেরিকান মার্ক-৪৮ টর্পেডো।

অন্য জাহাজের কয়েকজন রাতের প্রহরী কর্তৃপক্ষকে জানাল,
দিগন্তে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আগুন দেখেছে তারা। সেই সঙ্গে
বিকট আওয়াজ।

রেডিয়ো করা হলো এমভি হোপকে। কিন্তু জবাব দিল না
কেউ। জাহাজটা যেখানে ছিল, সেখানে কোনও জাহাজ খুঁজে
পাওয়া গেল না।

এমভি হোপ অদৃশ্য হয়েছে।

যে সাবমেরিন ওটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, তাকে কেউ দেখেনি।
পরবর্তীতে মার্কিন সরকার জোর গলায় বলবে, ওই এলাকায়
তাদের কোনও সাবমেরিনই ছিল না।

ওয়েস্ট কোস্ট, ইউএসএ।

সান ফ্রান্সিসকোর সামান্য দূরের সাগর।

অক্টোবর ১৫।

স্থানীয় সময় সকাল নয়টা বারো মিনিট।

নিউ ইয়র্কে দুপুর বারোটা বারো মিনিট।

নোয়া'য শিপ এমভি রুবল নামের সুপারট্যাঙ্কারের হোল্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারোজন ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন, একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে একডজন আফ্রিকান কমাণ্ডোর লাশ। এইমাত্র জাহাজের মিসাইল কন্ট্রোল কন্সলের সঙ্গে স্যাটালাইট আপলিঙ্ক যুক্ত করেছে কেভিন কনলন।

পুরো এক সেকেন্ডও লাগল না ওই সিগনাল রানার কাছে কালো শকুনে পৌঁছতে। ও রয়েছে ফ্রান্সের আকাশে, চলেছে ইতালি লক্ষ্য করে।

রানা টাচলক সিস্টেম ব্যবহার করে দূর থেকে মিসাইল ডিসআর্ম করছে, এই সময়টা কন্সলের সামনেই থাকল কেভিন। নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করল আপলিঙ্ক। দুই ইরিত্রিয়ান কমাণ্ডো ধরা পড়েনি, এখনও আড়াল থেকে গুলি করছে। একটু পর পরই গ্রেনেড আসছে তাদের তরফ থেকে।

ভয়ে থরথর করে কাঁপছে কেভিন।

আশপাশ দিয়ে ছুটছে বুলেট।

একটু দূরে গ্রেনেড ফাটল।

কন্সল আড়াল করেই রাখল কেভিন।

অবশ্য, দুই মিনিট পেরোবার আগেই মেরিনদের হাতে মারা পড়ল দুই ইরিত্রিয়ান কমাণ্ডো।

তার ষোলো সেকেন্ড পর কালো শকুনে বসে এমভি রুবলের লঞ্চ সিস্টেম অ্যাবোর্ট করে দিল রানা। কাজটা শেষ হতেই মস্ত শ্বাস নিয়েই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল কেভিন কনলন।

অ্যারোস্টাডিয়া এয়ারফিল্ড ।

মিলান, ইটালি ।

অক্টোবর ১৫ ।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটা ।

নিউ ইয়র্কে দুপুর একটা ।

অ্যারোস্টাডিয়া এয়ারফিল্ডের রানওয়েতে সরাসরি তুমুল
হাওয়া ফেলছে শক্তিশালী সব রেট্রোস, ভাসতে ভাসতে টারমাকে
নেমে এল কুয়াশার কালো শকুন ।

এরই ভিতর আঁধার নামতে শুরু করেছে উত্তর ইটালি জুড়ে,
অবশ্য এয়ার শো-তে গত পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে ওভারটাইম
করছে ইউএস এয়ার ফোর্সের কণ্টিনজেন্ট । স্টেট ডিপার্টমেন্ট
থেকে কঠোর নির্দেশ দেয়া এসেছে, ফিউলিং করতে হবে বিশেষ
দুই এয়ারোপ্লেনের ।

দেখবার মত মস্ত বি-৫২ বোমারু বিমানের এক শ' গজ দূরে
রানওয়েতে নেমেছে রাশান সুখোই ফাইটার বিমান ।

প্রকাণ্ড বোমারু বিমানের দুই ডানা থেকে ঝুলছে বুলেট
আকৃতির দুই কালো বিমান, যেন বড় আকারের দুই মিসাইল ।

ওগুলো আসলে মিসাইল নয়: এক্স-১৬ বিমান ।

অনেকেই ভাবেন, মাক থ্রির বেশি গতি তোলা অসম্ভব ।
দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগামী বিমান এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড ।

কথাটা প্রায় ঠিকই ।

কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর গতি সহজেই অতিক্রম করেছে একটি
বিমান । সত্যি বলতে, ওটার গতি কয়েক গুণ বেশি । ঘণ্টায় সাত
হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করতে সক্ষম ওটা । মাক সিক্সের
চাইতেও বেশি । অবশ্য, অপারেশনাল স্ট্যাটাস দেয়া হয়নি ওই
বিমানকে ।

বিমানটি নাসার তৈরি। নাম: এক্স-১৬।

বেশিরভাগ বিমান ব্যবহার করে জেট ইঞ্জিন, কিন্তু সীমাবদ্ধতা রয়েছে জেটের। ওই জেট কাজে লাগিয়েই মাক থ্রি গতি পেয়েছে এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড।

কিন্তু এক্স-১৬ অন্য জিনিস। ওটাকে চালায় রকেট। মুভিং পার্টস্ বলতে গেলে কিছুই নেই। সলিড হাইড্রোজেন ফিউয়েল জ্বলে বিদ্যুৎদেগে ছোটে। জেট বিমানের মত নয়, বরং মিসাইলের মত কাজ করে ওই বিমান। যারা চোখে দেখেছে, তারা বলেছে, ওটা আসলে একটা মিসাইলই, ওটার ভিতর স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয় পাইলটকে।

আজ পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে মোট পাঁচটি এক্স-১৬। এখন তাদের দুটোকে অ্যারোস্টাডিয়া ইটালিয়া এয়ারশোতে দেখছে রানা। কয়েক দিন পর ওই দুই বিমানের প্রদর্শনী হবে।

কালো শকুন থেকে নেমে টারমাক পেরোতে শুরু করল রানা। পাশেই রইল কুয়াশা ও রঘুপতি।

বি-৫২ বোমারু বিমানের ডানা থেকে ঝুলছে দুই এক্স-১৬। কাছ থেকে দেখল রানা।

বড় বিমান নয় এক্স-১৬। দেখতে কুৎসিতই বলা চলে। সুন্দর করবার চেষ্টাই করা হয়নি, ডিযাইন করা হয়েছে বাতাস চিরে অকল্পনীয় গতিতে ছুটে যাওয়ার জন্য।

টেইলফিনে বাঁকা অক্ষরে লেখা: নাসা।

দুই কালো বিমানের নীচে লেখা: ইউএস এয়ার ফোর্স।

ওদের সামনে এসে পরিচিত হলেন দুই কর্নেল।

একজন আমেরিকান, অন্যজন ইটালিয়ান।

‘মেজর রানা,’ বললেন আমেরিকান কর্নেল, ‘আপনার জন্য এক্স-১৬ তৈরি। পুরো ফিউয়েল ভরা হয়েছে। যে-কোনও সময়ে রওনা হতে পারেন। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। গতকাল আমাদের এক পাইলট ট্রেনিংয়ের সময় দুর্ঘটনায় পড়ে পাঁজরের

হাড় ভেঙেছে। ওর যা অবস্থা, ধারণা করছি, এই বিমানে উঠে জি ফোর্স সহ্য করা অসম্ভব।’

‘এটা বড় সমস্যা নয়,’ বলল রানা। ‘এমনিতেও নিজের পাইলট সঙ্গে নিতাম।’ রঘুপতির দিকে চাইল ও। ‘তুমি মাক সিক্স সহ্য করতে পারবে?’

সামান্য মাথা দোলাল রঘুপতি, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

‘আমরা ন্যাশনাল রেকনেসেন্স অফিস থেকে কিছু স্যাটালাইট রেইডার স্ক্যান পেয়েছি,’ বললেন আমেরিকান কর্নেল। ‘আপনারা যাওয়ার পথে বিপদে পড়তে পারেন।’

ক্লিপবোর্ডের মত ছোট পোর্টেবল ভিউফ্রিন রানার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

দক্ষিণ-পূর্ব মেডিটারেনিয়ান এলাকার ইনফ্রা-রেড ছবি। চেনা গেল সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগর।

একটা ছবি অনেক উপর থেকে তোলা।

অন্যটা ঘুম করা হয়েছে।

প্রথম ইমেজে রানা দেখল, সুয়েজ খাল এলাকায় লাল অসংখ্য বিন্দু ভাসছে মেঘের মত।

দ্বিতীয় স্যাটালাইট ছবিতে পরিষ্কার দেখা গেল চারপাশ।

লাল মেঘ আসলে দেড় শ’ বিন্দু।

‘বিন্দুগুলো কীসের?’ জানতে চাইল কুয়াশা।

জবাব দিতে হলো না কর্নেলকে।

বুঝে গেছে রানা। বলল, ‘ওগুলো বিমান। ফাইটার জেট। কমপক্ষে পাঁচটি আফ্রিকান দেশের। ফ্রেঞ্চরা আগেই জেনেছিল ওগুলো আকাশে উঠেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি কেন উঠল। কারণটা এখন জানি। আফ্রিকার পাঁচটা শক্তিশালী দেশের প্রধানরা আশা করছে, এবার বদলে যাবে পৃথিবীর ক্ষমতার বলয়। এরা চায় না আমরা মর্রার দিকে যাওয়া মিসাইলটা ঠেকিয়ে দিই। ওই মিসাইল ডেমিয়েন ডগলাসের রক্ষা-কবজ। আকাশে ওঠা

বিমানগুলো পাহারা দেবে শেষ মিসাইলটাকে। ওটার দিকে কাউকে যেতে দেবে না।’

মাত্র তিন মিনিট পর রানওয়ে ধরে ভয়ঙ্কর গর্জন শুধু হাড়তে রওনা হলো বি-৫২। ডানার দু’দিকের বাইরের অংশে ঝুলছে দুই এক্স-১৬।

ডানদিকের এক্স-১৬-র ককপিটে রঘুপতির পিছনে বসেছে মাসুদ রানা। ছোট জায়গায় প্রায় কুঁকড়ে আছে রোবট। অন্য বিমানে নাসার পাইলটের পিছনের সিটে কুয়াশা।

ইউটিলিটি ভেস্টে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে নিয়েছে রানা টাচলক-৯ ডিসআর্ম ইউনিট। কোমরে ঝুলছে নানান অস্ত্রের পাউচ।

ওরা যে পরিকল্পনা করেছে, তা প্রায় অসম্ভব।

যেহেতু রানা ছাড়া কেউ লিয়ার্ড মিসাইল ডিসআর্ম করতে পারবে না, তাই স্ক্রাক-৮ ক্লোন মিসাইলের খুব কাছে যেতে হবে ওকে। পাশে তখন থাকবে কুয়াশা।

বাধা আসবে নানাদিক থেকে। হামলা করতে পারে আফ্রিকান কমাণ্ডো দল। এটা মাথায় রেখে এডেন থেকে একদল মেরিনকে পাঠাতে বলেছে রানা। অবশ্য, তারা সঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারবে কি না, তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

লগুন থেকে যোগাযোগ করল চার্লস ডেলাক্রুস।

‘মিস্টার রানা, যা চেয়েছিলেন, বোধহয় পেয়েছি,’ বলল। ‘ইয়েমেনের মরুভূমির চার হাজার একর জমি কিনে নিয়েছে স্করপিয়ন শিপিং কোম্পানি। জায়গাটা এডেন থেকে দুই শ’ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, লোহিত সাগরের মুখে। পুরনো সোভিয়েত সাবমেরিন রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি ছিল। আমাদের স্যাটার্লাইটের ছবি আশি দশকের। কিন্তু মনে হচ্ছে, ওখানে কয়েকটা প্রকাণ্ড ওয়ারহাউস আছে। এ ছাড়া...’

‘ওটাই,’ বলল রানা। ‘কোঅর্ডিনেটস পাঠান।’

তাই করল চার্লস ডেলাক্রুস।

বিমানের ট্রিপ কমপিউটারে সংখ্যাগুলো তুলে দিল রানা।
দক্ষিণ ইয়েমেন পর্যন্ত যেতে হলে পেরোতে হবে পাঁচ হাজার
ছয় শ' বিশ কিলোমিটার।

সাত হাজার কিলোমিটার গতিবেগে এক্স-১৬-র লাগবে
আটচল্লিশ মিনিটের মত।

একঘণ্টা পর মক্কার উদ্দেশে রওনা হবে আইসিবিএম।

হাতে বাড়তি সময় নেই।

‘তুমি তৈরি, রঘুপতি?’ বলল রানা।

‘আপনি যখন বলবেন,’ জবাব দিল ভদ্র রোবট।

কিছুক্ষণ পর এক্স-১৬ বিমানকে ছেড়ে দেয়ার উচ্চতায় পৌঁছে
বি-৫২ বোমারু বিমানের পাইলট বলল: ‘দুই এক্স-১৬-কে
জানাচ্ছি, এইমাত্র মেডিটারেনিয়ানে ইউএসএস আব্রাহাম থেকে
যোগাযোগ করা হয়েছে। আপনাদের অ্যাটাক রুটে শুধু ওই
জাহাজই আছে। প্রতিটি বিমান আকাশে তুলছে তারা। এফ-১৪
এবং এফ/এ-১৮। আপনি বোধহয় এই মুহূর্তে সত্যিই খুব
গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, মিস্টার রানা। ফ্লাইট সিস্টেম চেক করছি।
একমিনিট পর আপনাদেরকে রিলিয দেব।’

পাইলটের সিগনাল কেটে গেল।

রানা এবং রঘুপতির কানে এল কুয়াশার কথা, নিচু স্বরে বলল
ও, ‘রঘুপতি, তুমিই পৃথিবীর সেরা পাইলট। মাথায় রাখবে,
আমাকে যেন অপমানিত হতে না হয়। নীচ দিয়ে ছুটে যাবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য তোমার চিপসে আছে।’

‘জী, বস, আছে,’ বলল রঘুপতি। ‘প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।’

‘আর, রানা...’ ডাকল কুয়াশা।

‘বলুন?’

‘আমার বন্ধু রঘুপতিকে নিয়ে ফিরে এসো, তাই চাই।’

‘চেপ্টার ত্রুটি করব না।’

আবারও বলে উঠল বি-৫২ বোমারু বিমানের পাইলট, ‘ফ্লাইট

সিস্টেম চেক কমপ্লিট। এবার লঞ্চ করব। রিলিযের জন্য তৈরি থাকুন। আমার গণনা শেষ হলেই... পাঁচ... চার...'

সরাসরি সামনে চাইল রানা, বড় করে দম নিল।

‘থ্রি...’

শক্তহাতে কন্ট্রোল স্টিক ধরল রঘুপতি।

‘টু...’

বিমানের আরেক ডানার প্রান্তে ঝুলছে রানাদের বিমান, ওদিকে চাইল কুয়াশা।

‘ওয়ান... মার্ক!’

ধাতব ক্লান্স-ক্লান্স! আওয়াজ উঠল।

বি-৫২ বোমারু বিমানের ডানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে দুই এক্স-১৬।

আকাশের বুকে বি-৫২ বিমান থেকে নেমে গেল দুই এক্স-১৬, তখনই বলে উঠল রঘুপতি, ‘এনগেজ করছি রকেট থ্রাস্টার... এখন!’

থ্রাস্টার কন্ট্রোল বাটন টিপল রঘুপতি।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল এক্স-১৬ বিমানের টেইল কোন্। পুরো এক শ’ফুট পিছনে গেল আফটারবার্নারের জ্বলজ্বলে সাদা আগুন।

আগে কখনও এমন ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খায়নি রানা।

পেরেকের মত গেঁথে গেল পুরো গদির সিটে।

আকাশ চিরে রওনা হয়েছে এক্স-১৬। বিকট কড়কড় আওয়াজ তুলছে সনিক বুম। যেন চামড়া ছিলে নেবে আকাশের। একটানা গর্জন ছাড়ছে বিমানের রকেট। মেডিটারেনিয়ানের চারপাশের সব জায়গা থেকে শোনা গেল ওই গম্ভীর আওয়াজ।

দক্ষিণ-পূর্ব লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে দুই এক্স-১৬। সামনে পড়বে সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগর। আরও কিছু দূর গেলেই পরিত্যক্ত ইয়েমেনের সাবমেরিন ফ্যাসিলিটি। ওখান থেকে রওনা হবে লিয়ার্ড মিসাইল, উড়িয়ে দেবে পবিত্র শহর মক্কা।

• অবশ্য, তার আগেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মিশ্র এরিয়াল আর্মাডা।

পুরো বিশমিনিট পর দূরে দেখা গেল উড়ন্ত বিমান বহর।

‘ওরা আমাদের জন্যে তৈরি,’ নিচু স্বরে বলল রঘুপতি।

কমলা আকাশে অসংখ্য পোকার মত উড়ছে ওগুলো।

একের পর এক স্কোয়াড্রন। আফ্রিকার পাঁচটি দেশের।

ফাইটার বিমান।

মিশরের উপকূলে যেন ভাসমান প্রাচীর।

পাহারা দিচ্ছে সুয়েজ খাল।

এরিয়াল আর্মাডায় নানান ধরনের ফাইটার বিমান রয়েছে।

পুরনো বিমান, নতুন বিমান, নীল বিমান, লাল বিমান— মিসাইল বহন করতে পারে এমন সব উড়োজাহাজই উঠেছে আকাশে। এসব বিমান কেনা হয়েছে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। প্রচুর ব্যবহারের পর তাদের আয়ু যখন প্রায় শেষ, তখন বিক্রি করে দিয়েছে এদের কাছে কম দামে।

সুখোই এসইউ-১৭— তৈরি করা হয়েছিল উনিশ শ’ ছিষটি সালে। অনেক আগেই রাশান সেনাবাহিনী বাতিল করেছে।

মিগ-২৫ ফক্সব্যাট— আশির দশকে আধুনিক বিমান তৈরি হওয়ার পর ওটা পরিত্যাগ করে রাশান এয়ার ফোর্স।

মিরাজ ভি/৫০— ওই জিনিস শত শত বিক্রি করেছে ফরাসিরা। কিনেছিল লিবিয়া, যায়ার ও ইরাক।

ভাসমান আর্মাডার ভিতর রয়েছে আক্রমণাত্মক চেক বিমান এল-৫৯ অ্যালবেটস। আফ্রিকার দেশগুলোর এয়ার ফোর্সে খুব জনপ্রিয়।

এফ-২২ র‍্যাপ্টার বা এফ-১৫ই ফাইটারের মত আধুনিক নয় ওগুলো, কিন্তু আধুনিক সব বিমানের মতই ওগুলোরও রয়েছে এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল। সেগুলো আধুনিক। সাইডওয়াইগার, ফিনিক্স, রাশান আর-৬০টি ইত্যাদি। সবই বিক্রি হয় রোমানিয়া ও

ইউক্রেনের চোরাই অস্ত্র বাজারে। বিপুল টাকার কারণে নতুন ফাইটার কেনা কঠিন, কিন্তু দেশগুলো সহজেই ডজন ডজন ভাল মিসাইল কিনতে পারে।

সামনে চেয়ে ভাবছে রানা, আর যাই হোক, এরা অসংখ্য।

সবচেয়ে ইকুইপড দশটা এফ-২২ ফাইটার বিমানও এই ভাসমান আর্মাডার কাছে কিছুই নয়। টেকনোলজি কোনও কাজেই আসবে না।

‘তোমার কি মনে হয়, রঘুপতি?’

‘আমাদের এই বিমান লড়াই করার জন্যে তৈরি করা হয়নি, মিস্টার রানা,’ নিরপেক্ষ কণ্ঠে বলল রোবট। ‘গতির জন্যে তৈরি। এই জিনিস যদি টিকিয়ে রাখতে হয়, আমাদেরকে অনেক নীচ দিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে যেতে হবে। আজ পর্যন্ত কোনও পাইলট এই কাজ করেনি। ওদের ছোঁড়া মিসাইলকে পিছনে ফেলতে হবে।’

‘মিসাইল পিছু নেবে, বাহ, নতুন অভিজ্ঞতা হবে!’ মনে মনে বলল রানা।

‘আমাদের কাছে অস্ত্র বলতে সামান্য সিঙ্গল ব্যারেলের একটা বন্দুক,’ আবারও বলল রঘুপতি। ‘নাকের কাছে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বোধহয় ডেকোরেশনের জন্যেই।’

তখনই নতুন কণ্ঠ শুনল রানা।

‘দুই এক্স-১৬, আমি ইউএসএস আব্রাহাম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের ক্যাপ্টেন জন গ্রাহাম। আপনারা আমাদের স্কোপে এসে পড়েছেন। এন রুটে পাবেন দ্য স্কেলিটন স্কোয়াড। তারা বাধা দেবে শত্রুদেরকে। এদিকে পাঁচটা প্রাউলার বিমান আকাশে তুলেছি আমরা। এক শ’ মাইল জুড়ে ইলেকট্রনিক জ্যামিং করবে আপনাদের জন্যে। সমস্যা মাত্র শুরু হয়েছে, জেন্টলমেন। কিন্তু আশাকরি আমরা আকাশে একটা সুইয়ের ফুটো তৈরি করতে পারব। ওটার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবেন আপনারা।’ চুপ হয়ে

গেলেন ভদ্রলোক, কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, ‘ও, আরেকটা কথা, মিস্টার রানা, পরিস্থিতি সম্পর্কে সবই রিপোর্ট করেছি প্রেসিডেন্টকে। ওড লাক। আমরা আপনাদের পিছনে আছি, স্যর।’

‘ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন,’ বলল রানা। রোবটের দিকে চাইল।
‘রঘুপতি, এবার সর্বোচ্চ গতি তোলো।’

কোনও মন্তব্য করল না রঘুপতি।

পরক্ষণে ঝাঁকি খেল রানা।

এক লাফে গতি উঠল ঘণ্টায় সাত হাজার কিলোমিটার।
অর্থাৎ, প্রতি সেকেন্ডে গতি দু’হাজার মিটার। সুপারসনিক গতির সাতগুণ বেশি।

শত্রু বিমানের প্রাচীরের দিকে ছুটতে গিয়ে আকাশ চিরে দিল দুই এক্স-১৬।

আফ্রিকার বিমানগুলোর বিশ মাইলের ভিতর পৌঁছে যেতেই আর্মাডা থেকে নানান ধরনের মিসাইল ছোঁড়া হলো। সংখ্যায় চল্লিশটারও বেশি। লেজে ধোঁয়া নিয়ে ছুটে এল রানাদের দিকে।

কিন্তু প্রথম মিসাইল ছাড়া রাশান মিগ-২৫ ফল্গব্যুট হঠাৎ করেই বিস্ফোরিত হলো কমলা আগুনের ভিতর।

প্রায় একইসময়ে বিস্ফোরিত হলো ছয়টি আফ্রিকান ফাইটার।
এআইএম-১২০ অ্যাম্রাম এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল উড়িয়ে দিল অগ্রসরমান বিশটি মিসাইল। আকাশে তৈরি হলো আগুনের গোলক। লেজে কেরাটি ও হাতের হাড়ের চিহ্ন আঁকা আমেরিকার এফ-১৪ ফাইটার নেমে পড়েছে আফ্রিকার আর্মাডার বিরুদ্ধে।

ইউএসএস আব্রাহাম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের ‘স্কেলিটন স্কোয়াড’ মানেই এক ডজন এফ-১৪ টমক্যাট, পিছনে ক্ষিপ্রগতি এফ/এ-১৮ হর্নেট।

হঠাৎ করেই শুরু হলো সভ্যতার সবচেয়ে আধুনিক এরিয়াল ডগফাইট।

বাক নিয়ে আফ্রিকান বিমান বহরের তলা দিয়ে ছুটে চলল দুই

এক্স-১৬ বিমান। সামনের আকাশে আগুনের বিস্ফোরণ দেখলেই আরও নীচে নামছে ওদুটো, এড়িয়ে চলেছে শত্রুদেরকে। ডাইভ দিতে শুরু করেছে বোমারু ফাইটার। বিদ্যুৎগতি মিসাইল ও ট্রেসার বুলেট ছাড়াচ্ছে।

সাক্ষ্যকালীন কমলা আকাশে খেপে উঠেছে যেন অসংখ্য ফাইটার বিমান, লড়াইয়ে প্রাণপণে। মিগ, মিরাজ, টমক্যাট, হর্নেট— একপাশ থেকে আরেক পাশে গড়িয়ে চলেছে আকাশে, শত্রুবিমান লক্ষ্য করে হামলা করছে। বিস্ফোরিত হচ্ছে বিমান।

এক পর্যায়ে আকাশের দিকে পেট তুলে উল্টে গেল রানার এক্স-১৬। বিদ্যুৎবেগে পেরিয়ে গেল একটি আফ্রিকান ফাইটার বিমানকে। কিন্তু সামনেই পড়ল আরেকটি যায়ারিয়ান ফাইটার— নাকে নাকে বাড়ি লাগবে, এমনসময় বিস্ফোরিত হলো আফ্রিকান বিমান। নীচ থেকে এসেছে অ্যাম্রাম মিসাইল। বিস্ফোরণের আগুনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল রানার এক্স-১৬। ডানা ও ককপিটের উপর অংশে লাগল জ্বলন্ত ধাতু। রঘুপতির দিকের ককপিটে ছ লাং করে লাগল শত্রুবিমানের মৃত পাইলটের তাজা রক্ত।

রকেট বিমান লক্ষ্য করে একের পর এক মিসাইল এল, কিন্তু গতি কমল না রানাদের বিমানের।

এক্স-১৬ বিমানের কাছে এসেই উন্মাদ হয়ে উঠেছে মিসাইল, ছিটকে যাচ্ছে নানাদিকে। মনে হলো অদৃশ্য কোনও বুদুদ ঘিরে রেখেছে দুই বিমানকে।

কথাটা মিথ্যা নয়।

ইউএস নেভির ইএ-৬বি প্রাউলার ওই কাজই করছে। এক্স-১৬ থেকে দশমাইল দূরে ব্যবহার করছে ডিরেকশনাল এএন/এএলকিউ-৯৯এফ ইলেকট্রনিক জ্যামিং পড।

শক্তপোক্ত প্রাউলার বিমানের পাইলটরা ভাল করেই জানে, সুপারফাস্ট এক্স-১৬ বিমানের সঙ্গে গতি তুলে এগুতে পারবে না।

কাজেই একের পর এক বিমান সামনে রেখেছে তারা, জ্যাম করছে সিগনাল। মিসাইল, কামানের গোলা ও ট্রেসার বুলেট থেকে পাহারা দিচ্ছে রকেট বিমানকে। সামনের প্রাউলার বিমানগুলো যেন র্যালি রানারের মত দৌড়ের উপর আছে।

‘এক্স-১৬, আমি প্রাউলার লিডার,’ নতুন কণ্ঠ শুনল রানা হেডসেটে। ‘আমরা’ আপনাদেরকে ক্যানেল পর্যন্ত পাহারা দিতে পারব। কিন্তু আমাদের গতি কম বলে পরে আর কোনও সাহায্য করতে পারব না। তখন থেকে যা করার আপনাদেরকেই করতে হবে।’

‘ধন্যবাদ, আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন,’ বলল রানা।

‘সামনে দেখুন, মিস্টার রানা,’ নির্লিপ্ত স্বরে বলল রঘুপতি।

প্রাউলার বিমানের লং রেঞ্জ ইলেকট্রনিক প্রোটেকশনের কথা মাথায় রেখে নতুন স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে আফ্রিকান ফাইটার বহর।

ক্যামিকাজি ডাইভ শুরু হলো এক্স-১৬ লক্ষ্য করে।

মিসাইলের হোমিং সিস্টেম গুলেট করে দিতে বা হালকা ট্রেসার বুলেট সরিয়ে দিতে পারে ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেয়ার, কিন্তু আত্মঘাতী বিমানকে বাধা দেবার সাধ্য তার নেই।

দুই এক্স-১৬ লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ছয়টি ফাইটার জেট। আকাশ চিরে দিল বিকট তীক্ষ্ণ আওয়াজ। ছুটবার সময় ট্রেসার বুলেট ছুঁড়েছে বিমানগুলো।

পরস্পর থেকে সরে গেল দুই এক্স-১৬।

ডানদিকে বাঁক নিয়েই ডাইভ দিল রঘুপতি, ওদিকে অন্য এক্স-১৬ কাত হলো ডানদিকে— একফুট সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ডাইভ বমার। কিন্তু তার আগেই একটা ক্যামিকাজি বিমানের ট্রেসার বুলেট লাগল ক্যানোপিতে। অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। যাওয়ার পথে ফুটো করে দিয়ে গেল কুয়াশার পাইলটের মগজ।

বিমানের ককপিটের চারপাশে ছিটকে লেগেছে মগজ।

আকাশে গড়াতে শুরু করল কুয়াশার তীব্র নিয়ন্ত্রণ।
চলেছে পূর্ব লক্ষ্য করে।

সিট থেকে সামনে চলে এল কুয়াশা, দ্রুতগতিতে সামনে চলে
পিছনে সরিয়ে দিল পাইলটের লাশ। নিভে এসেছে কুয়াশার
সামনে। ভূমধ্যসাগরে আছড়ে পড়বার আগেই সিট থেকে নামল
বিমান।

ঝড়ের গতিতে উঠে আসছে সাগর।

গতি আরও বাড়ল।

তারপর...

বিকট আওয়াজ উঠল: বুম!

অদ্ভুত বিমান নিয়ে সাগরের কাছে নেমে এসেছে রানা ও রঘুপতি,
মাত্র বিশফুট নীচে অসংখ্য ডেউ। লাফিয়ে উঠছে সাদা পানি
গিয়ারের মত।

একইসময়ে পিছনের সাগরে নামল বেশ কয়েকটা মিসাইল।

‘সামনে সুয়েজ খাল,’ জানাল রঘুপতি।

বিশ মাইল দূরে সুয়েজ খালের মুখ। আধুনিক সি লেনের
শুরুতেই দু’পাশে রয়েছে দুটো মস্ত পিলার, ওদিকে লোহিত
সাগর।

পুরো এলাকা জুড়ে আকাশে উড়ছে অসংখ্য জেট বিমান।

‘বামে যাও, রঘুপতি,’ দূরে চেয়ে আছে রানা।

নির্দেশ পালন করতে দেরি করেনি রোবট।

পাশ কাটিয়ে পিছনে পড়ল দুই চেক এল-৫৯এস। সোজা
সাগরে গিয়ে মুখ খুবড়ে পড়ল।

রানার দু’পাশে এখন শুধু সুয়েজ খাল।

সামনে প্রাউলার থেকে আর কোনও ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা
পাওয়া যাবে না।

বিদ্যুৎঘেগে সুয়েজ খাল পেরোতে শুরু করেছে রানার এক্স-

১৬। পানির তিরিশ ফুট উপর দিয়ে ছুটছে। এড়িয়ে চলেছে নোঙর করা জাহাজগুলোকে। অনেক উপরে এরিয়াল আর্মাডা।

ব্লকেড পর্যন্ত পৌঁছে গেছে রানা।

কিন্তু আফ্রিকার একটা ফাইটার বিমানের পাইলট কীভাবে যেন জোগাড় করেছে আমেরিকার তৈরি দুই ফিনিক্স মিসাইল, ওগুলোকে লক্ষ্য করল সে।

খালের মত অগভীর সাগর চ্যানেলে ছুটে চলেছে এক্স-১৬।

ওটার চেয়েও গতি বেশি দুই মিসাইলের।

একইসময়ে আত্মহত্যার জন্য দুই ফাইটার ঝাঁপ দিল রানার এক্স-১৬ লক্ষ্য করে। কাঁচির ফলার মত দু'দিক থেকে নামছে। লুডোর গুটির মত বিমান গড়িয়ে দিল রোবট রঘুপতি।

মাত্র পাঁচ ইঞ্চি দূর দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল দুই বিমান। সোজা গিয়ে পড়ল খালের বালিময় পারে। ছিটকে উঠল বালি ও আগুন।

রানাদের এক্স-১৬ বিমানের লেজের কাছে পৌঁছে গেল দুই ফিনিক্স মিসাইল। অবাক চোখে রানা দেখল, মিসাইলের গায়ে স্ট্যানসিল করা: এক্সএআইএম-৫৫এ-রবার্টস্ মিসাইল সিস্টেম।

‘রঘুপতি...’ গলা ফাটাল রানা।

‘দেখেছি, মিস্টার রানা,’ পাল্টা বলল রঘুপতি।

‘কী করবে?’

‘এলো বলে!’ স্বাভাবিক স্বরে বলল রঘুপতি। ‘আমিও তৈরি।’

হঠাৎ করেই ডানদিকে বাঁক নিতে লাগল রঘুপতি, চলেছে খালের পার ধরে, তৈরি করেছে মস্ত একটা বৃত্ত।

আবারও রওনা হয়ে গেল ভূমধ্যসাগর লক্ষ্য করে।

পিছু নিল দুই মিসাইল। একইসময়ে প্রায়-বৃত্ত তৈরি করল ওগুলো। জি ফোর্স পাত্তা দিচ্ছে না।

উপকূল পাহারা দিচ্ছে আফ্রিকান আর্মাডা। এদিকে রয়েছে সবমিলে ছয়টি ফাইটার। সেগুলোর পাইলটরা দেখল, মস্ত একটা

বৃত্ত তৈরি করে আবারও ওদের দিনেই।

আকাশ পাহারা দিতে চাইল পাঠশালা।
দিনটা আসলে তাদের।

ভুল ধারণা।

একদল মৌমাছির মত ভাসছে তারা, আর তাদের মাথা দিয়ে
বুলেটের মত গেল এক্স-১৬। ওটার দুই পাশে মাএ দশ গুলি দিল
রইল দুই আফ্রিকান মিং।

আর তখনই পৌঁছে গেল দুই ফিনিশ মিসাইল।

বুম! বুম!

হাজার টুকরো হলো দুই মিং। মস্ত এক বৃত্ত তৈরি করে
আবারও সুয়েজের সরু খালে ফিরল এক্স-১৬। আকাশ চিরে
চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব লক্ষ্য করে।

কিন্তু বৃত্ত তৈরি করতে গিয়ে দু' শ' কিলোমিটার ঘুরতে
হয়েছে এক্স-১৬-কে। সেসময় তার সেরা মিসাইল লঞ্চ করেছে
এক আফ্রিকান বিমান। আমেরিকার চোরাই এআইএম-১২০
অ্যাম্মাম মিসাইল ওটা, দুনিয়া সেরা।

রানার এক্স-১৬ বিমানের পিছু নিয়েছে অ্যাম্মাম। ক্ষুধার্ত
হাঙরের মত মাঝের দূরত্ব পার করেছে ওটা।

‘ওটাকে পিছনে ফেলতে পারছি না,’ বলল রঘুপতি। ‘কতক্ষণ
পিছনে তাড়া করবে? নিশ্চয়ই এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দেবে?
ফিউয়েল শেষ হলে...’

‘না, হাল ছাড়বে না,’ তিক্ত স্বরে বলল রানা। ‘ওটা অ্যাম্মাম!
দিন-রাত ধাওয়া করবে! আর টার্গেটকে নাগালে পেলেই...’

‘এ ধরনের বিমানের পিছু তো নেয়নি। পুরো থ্রটল খুলে
দিচ্ছি।’

ইয়ারপিসে ওরা শুনতে পেল অন্য একটা কণ্ঠ।

চার্লস ডেলাক্রুস। মনে হলো মরমে মরছে লোকটা।

‘ইয়ে, মিস্টার রানা, খারাপ খবর আছে।’

‘বলুন?’

‘আমাদের স্যাটালাইট এইমাত্র আইসিবিএম-এর লঞ্চ সিগনেচার ধরেছে। ওটা রওনা হয়েছে। দক্ষিণ ইয়েমেন থেকে। ক্যারেকটেরিস্টিক থেকে ধারণা করা হচ্ছে জেরিকো-২বি ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল। সোজা চলেছে মক্কার উত্তর অংশ লক্ষ্য করে। মিস্টার রানা, ডেমিয়েন ডগলাস জানে আমরা পিছু নিয়েছি। কাজেই আগেই লঞ্চ করেছে মিসাইল।’

হতবাক হয়ে আকাশের দিকে চাইল রানা। পরক্ষণে বলল, ‘এত কাছে এসে পিছাব না আমরা।’

জবাবে চুপ করে রইল চার্লস ডেলাক্লুস।

বুকের স্ট্র্যাপে আটকে রাখা অস্ত্রগুলো দেখল রানা। ওগুলো ব্যবহার করতে চেয়েছিল। উড়িয়ে দিত মিসাইল। কিন্তু কিছুই এখন কাজে আসবে না। আস্তে করে হাতে নিল টাচলক-৯ ডিসআর্ম ইউনিট। আস্তে করে মাথা দোলাল।

পরক্ষণে চমকে গেল।

দ্বিতীয়বার দেখল টাচলক-৯ ইউনিট।

‘মিস্টার ডেলাক্লুস, আপনি কি মিসাইলের সিগনালের টেলিমেট্রি জানেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘তথ্যটা পাঠিয়ে দিন।’

‘বেশ।’

কয়েক মুহূর্ত পর বিপ্ আওয়াজ তুলল রানার ট্রিপ কমপিউটার। স্ক্রিনে দেখা দিয়েছে মানচিত্র। একটা জ্বলন্ত তীর দেখিয়ে চলেছে লিয়ার্ড মিসাইলকে, ছুটে চলেছে মক্কা শহরের উত্তরাংশ লক্ষ্য করে।

কমপিউটারকে নিজের ট্রান্সপণ্ডার সিগনাল দিল রানা। স্ক্রিনে দেখা দিল দ্বিতীয় আইকন। ওটা চলেছে দক্ষিণ লক্ষ্য করে।

স্ক্রিনে ফুটে উঠল ফ্লাইট ডেটা: সিগনাল আইডি, এয়ারস্পিড,

অল্টিচ্যুড ইত্যাদি ।

ওকে প্রায় অন্ধ কষতেই হগো না ।

ছবিটা পরিষ্কার ।

চোদ্দ

মক্কা শহর লক্ষ্য করে দু'দিক থেকে চলেছে দুই এয়ারক্রাফট
এক্স-১৬ ও লিয়ার্ড মিসাইল । আমেরিকান স্যাটলাইটের
অটোমেটেড রিকগনিশন সিস্টেম নিশ্চিত করেছে, দুই রকেটের
একটা জেরিকো-২বি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ।

প্রায় একই গতি নিয়ে ছুটে চলেছে দুই এয়ারক্রাফট । মক্কা
শহরের দু'দিক থেকে আসছে ওগুলো ।

‘রঘুপতি,’ নিচু স্বরে ডাকল রানা ।

‘জী?’

‘আমরা আর ইয়েমেনে যাব না ।’

‘আমিও তাই ধারণা করছি, স্যর,’ বলল রঘুপতি । ‘এবার কী
করবেন?’

কমপিউটারের বাটন টিপতে শুরু করেছে রানা । দ্রুত অন্ধ
কষছে । ও যেকাজ করতে চাইছে, তা প্রায় অসম্ভব ।

এখনও মক্কা শহর থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরে ওরা ।

ওদের টার্গেট সময়:

আটটা তিরিশ মিনিট ।

লিয়ার্ড মিসাইলের বিষয়ে ক্যালকুলেশন শেষ করল রানা ।

ওই মিসাইল সামান্য দূরে থাকবে ।

টার্গেট টাইম:

৯:০১...

৯:০০...

৮:৫৯...

ভাল, মনে মনে বলল রানা। ওরা বাড়তি তিরিশ সেকেন্ড পাবে। ওই সময়ে মক্কার আকাশে ঘুরে আবারও মিসাইলের পিছু নিতে পারবে।

ঝুঁকিটা টের পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। বুকে আটকে নেয়া টাচলক-৯ ইউনিট চট করে দেখল। ফিসফিস করে বলল, 'মাত্র ষাট ফুট।' রঘুপতির দিকে চাইল। 'রঘুপতি, কখনও কোনও মিসাইলের পিছু নিয়েছ?'

টার্গেট টাইম:

৬:০০...

৫:৫৯...

৫:৫৮...

ক্রমেই নেমে আসছে আঁধার। বুলেটের গতি নিয়ে ছুটে চলেছে রানার এক্স-১৬, পিছনে আসছে অ্যাম্রাম মিসাইল।

'স্যর, আপনি কি চান আমি মিসাইলের পাশে পৌঁছে যাই?' জানতে চাইল রঘুপতি।

'হ্যাঁ, তাই চাই। সেক্ষেত্রে আশাকরি আইসিবিএম ডিসআর্ম করতে পারব। সেজন্য ষাট ফুটের ভেতর পৌঁছাতে হবে।'

'কিন্তু মাক সিক্স গতি নিয়ে মিসাইলের পাশে বিমান চালাতে পারে না কেউ।'

'তুমি হয়তো পারবে।'

যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে রোবটের মুখে হাসি দেখল না রানা।

'আপনি আসলে কী চান, স্যর?'

'আইসিবিএম অনেক উপরে ওঠে, তারপর নেমে আসে টার্গেট লক্ষ্য করে,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে লিয়ার্ড মিসাইল

আছে সাতাশ হাজার ফুট উচ্চতায়। মক্কার উপর পৌঁছে যাওয়ার পরেও ওই উচ্চতায় থাকবে, তারপর দেবে ডাইভ। মানক সিংগল গতির কারণে টার্গেটে পৌঁছতে ওটার লাগবে বড়োটা পাঁচ সেকেন্ড। কিন্তু ওটাকে ডিসআর্ম করতে হলে কমপক্ষে পাঁচ সেকেন্ড লাগবে আমার। কাজেই ওই মিসাইলের পাশে থাকতে হবে সাতাশ হাজার ফুট উচ্চতায়। ওটা একবার নাক নিচু করলে সব শেষ। তার আগেই মিসাইলের পাশে পৌঁছাতে হবে তোমাকে— পারবে?’

‘আশা করি পারব,’ স্বাভাবিক স্বরে বলল রঘুপতি। ‘জানেন, স্যর, আপনি প্রায় আমার বসের মতই। উনিও ভাবেন আমি সব কিছু পারি। আর আমার ব্রেন চিপস্ বলছে, এই কাজ আমি ঠিকই পারব।’

টার্গেট টাইম:

২:০১...

২:০০...

১:৫৯...

আকাশ চিরে ছুটে চলেছে এক্স-১৬ বিমান। পিছনে আসছে অ্যাম্রাম মিসাইল।

লোহিত সাগর পেরোতে শুরু করে উচ্চতা বাড়াতে লাগল রঘুপতি। কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছে গেল সাতাশ হাজার ফুট উপরে।

‘এইমাত্র পিছনে পড়ল মক্কা,’ জানাল রঘুপতি। ‘এবার ঘুরে ফিরতি পথ ধরব। চোখ রাখুন সামনে। কিছুক্ষণ পর দেখবেন আসছে লিয়ার্ড মিসাইল।’

বামে বাঁক নিচ্ছে রঘুপতি, বিদ্যুৎবেগে আকাশ পিছনে ফেলছে রকেট বিমান। মস্ত অর্ধবৃত্ত তৈরি করছে। সেটা শেষ হলে পৌঁছে যাওয়ার কথা নিউক্লিয়ার মিসাইলের পাশে। একইসঙ্গে ছুটবে মক্কা শহর লক্ষ্য করে।

কিন্তু এক্স-১৬ হঠাৎ করেই কোর্স পাল্টে নেয়ায় অনেক কাছে পৌঁছে গেল অ্যাম্রাম মিসাইল। এক্স-১৬ লক্ষ্য করে ক্ষিপ্ত বাঘের মত আসছে ওটা। এখন আছে মাত্র এক শ' মিটার পিছনে, ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

টার্গেট টাইম:

১:২০...

১:১৯...

১:১৮...

‘ওই যে আপনার নিউক্লিয়ার মিসাইল, ঠিক সামনে,’ হঠাৎ করেই বলল রঘুপতি।

জি ফোর্সের বাক্সির ভিতর রঘুপতির কাঁধের উপর দিয়ে চোখ সরু করে দূরে চাইল রানা।

আরবের আকাশে নেমে এসেছে সন্ধ্যা।

পশ্চিম ও মধ্য গগনে সামান্য কমলা রং।

কয়েক সেকেন্ড পর পরিষ্কারভাবে মিসাইলটা দেখল রানা।

প্রকাণ্ড ওটা।

তুমুল গতি নিয়ে চলেছে আকাশ চিরে।

সায়েন্স ফিকশন সিনেমার স্পেসশিপের মতই দেখতে ইজরায়েলি আইসিবিএম জেরিকো-২বি। তেলতেলে দেহ নিয়ে ছুটছে মক্কা শহর লক্ষ্য করে।

মস্ত টিউবের মত। সত্তর ফুট দৈর্ঘ্যের চকচকে চুরুট। বর্ষার মত ফুটো করছে আকাশ। লেজে জ্বলজ্বল করছে ম্যাগনেসিয়ামের ভয়ঙ্কর আগুন। পিছনে দীর্ঘ ধোঁয়ার রেখা। ওই ধোঁয়া অজগরের মত পাক খেয়ে দূর-দিগন্তে হারিয়ে গেছে ইয়েমেনের আকাশে।

বিকট গর্জন ছাড়ছে মিসাইল।

একটানা বুউউউউউউম! আওয়াজ তুলছে।

নিজেও বিকট আওয়াজ ছাড়ছে এক্স-১৬, শেষ করে এনেছে অর্ধবৃত্ত।

টার্গেট টাইম:

১:০০...

০:৫৯...

০:৫৮...

আর বড়জোর কয়েক সেকেন্ড, তারপর...

অর্ধবৃত্ত তৈরি করেই তীরের মত জেরিকো-২বি মিসাইলের
কাছে পৌঁছে গেল রানার এক্স-১৬।

আকাশ চিরে ছুটছে লিয়ার্ড মিসাইল ও রকেট বিমান।

কিন্তু এখনও পাশাপাশি হয়নি দুই এয়ারক্রাফট।

আইসিবিএম-এর সামান্য বামে পিছনে ছুটছে রানার বিমান।

দূর দিগন্তে ঘন কালো ধোঁয়া ছুঁড়ছে আইসিবিএম।

টার্গেট টাইম:

০:৫০...

০:৪৯...

০:৪৮...

মিসাইলের চেয়ে সামান্য বেশি গতি রকেট বিমানের।

পৌঁছে গেল পাশে।

চারপাশে রইল শুধু ভয়ঙ্কর গর্জন।

ওই আওয়াজ সুপারসনিক গতির কারণে।

একটানা চলছে: বুউউউউউম্!

টার্গেট টাইম:

০:৪০...

০:৩৯...

০:৩৮...

‘আরও কাছে নিয়ে যাও, রঘুপতি,’ গলা ছাড়ল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল রোবট।

এক্স-১৬ পৌঁছে গেল মিসাইলের লেজের কাছে। রিকট

আওয়াজ ছাড়ছে আইসিবিএম-এর টেইল কোন্ ।
কোনও সাড়া দিল না টাচলক-৯ ইউনিট ।
এখনও মিসাইলের সিপিইউ-এর কাছে পৌঁছতে পারেনি ।
তিলতিল করে সামনে বাড়ল এক্স-১৬ । ধীরে ধীরে পিছনে
পড়ছে মিসাইলের পিছন দিক ।
'আরও কাছে যাও!' নির্দেশ দিল রানা ।
টার্গেট টাইম:
০:৩৪...
০:৩৩...
০:৩২...
ককপিট ক্যানোপি থেকে নীচে মক্কা শহরের হরেক রঙের
বাতি দেখল রানা ।
নীচে শুরু হয়েছে ঘন বসতি ।
টার্গেট টাইম:
০:২৮...
০:২৭...
০:২৬...
মিসাইলের পেটের কাছে পৌঁছে গেল এক্স-১৬ । আর তখনই
বিপ্ আওয়াজ তুলল ডিমআর্ম ইউনিট । স্ক্রিনে দেখা দিল:

ফার্স্ট প্রটোকল (প্রক্সিমিটি): স্যাটিসফাইড.
ইনিশিয়েট সেকেণ্ড প্রটোকল ।

'এবার...' বিড়বিড় করল রানা । চট্ করে একবার দেখে নিল
আইসিবিএম ।
রিফ্লেক্স প্যাটার্নের সিকিউয়েন্স শুরু করেছে ডিসআর্ম ইউনিট ।
টাচস্ক্রিনে আঙুল স্পর্শ করতে লাগল রানা ।
আকাশে সুপারসনিক আওয়াজ তুলে ছুটছে দুই এয়ারক্রাফট ।

গতি ঘণ্টায় প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার ।
আর তখনই শুরু হলো সর্বনাশের!
এক্স-১৬ বিমানের খুব কাছে পৌঁছে গেল অ্যাম্রাম মিসাইল ।
স্কোপে চেয়ে আছে রঘুপতি । শান্ত স্বরে বলল, ‘স্যর... আর
মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর...’

‘আগের কাজ আগে শেষ করি,’ চাপা স্বরে বলল রানা । পুরো
মনোযোগ দিয়েছে রিফ্লেক্স রেসপন্স টেস্টে ।

টার্গেট টাইম:

০:১৯...

০:১৮...

০:১৭...

এক্স-১৬ বিমানের লেজের আগুনের কাছে পৌঁছে গেছে
অ্যাম্রাম মিসাইল ।

‘লিথাল রেঞ্জ প্রায় পৌঁছে গেছে,’ শান্ত স্বরে বলল রঘুপতি ।

অ্যাম্রামের জন্য লিথাল রেঞ্জ বিশ গজ ।

এরপর আঘাত হানতে হয় না মিসাইলকে । কাছে বিস্ফোরিত
হওয়াই যথেষ্ট ।

‘আপনি পাঁচ সেকেন্ড পাবেন, স্যর,’ উদাস সুরে বলল
রঘুপতি ।

‘আমার এত সময় নেই,’ কাজের ফাঁকে বলল রানা । চোখ
সরল না স্ক্রিন থেকে । ঝড়ের বেগে চলছে আঙুল ।

টার্গেট টাইম:

০:১৬...

০:১৫...

০:১৪...

‘আমি কিন্তু, স্যর, চাইলেও সরে যেতে পারি না,’ করুণ
শোণাল রঘুপতির কর্ণ । ‘নইলে ষাট ফুটের চেয়ে দূরে যেতে
হবে । সেক্ষেত্রে সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে । ...দুই সেকেন্ড!’

টাচস্ক্রিন স্পর্শ করছে রানা।

টার্গেট টাইম:

০:১৩...

০:১২...

‘আর এক সেকেণ্ড, স্যার।’

লিথাল রেঞ্জ পৌঁছে গেল অ্যাম্রাম মিসাইল।

এক্স-১৬ বিমানের টেইলপাইপের বিশ গজ দূরে ওটা।

‘অনেক দেরি হয়ে গেল, স্যার,’ করুণ সুরে বলল রঘুপতি।

‘মনে হয় না,’ নতুন একটা কণ্ঠ বলল ওদের ইয়ারপিসে।

সুপারসনিক ঝোড়ো গতির ভিতর রানার এক্স-১৬ বিমানের পাশে হাজির হয়েছে কালো কী যেন। ঝট করে সরে গেল ওটা, পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে অ্যাম্রাম মিসাইল।

পরক্ষণে ওটার লেজে লাগল অ্যাম্রাম।

আকাশে ওই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই সিটে ঘুরে বসল রঘুপতি। তার চোখ পড়ল অর্ধেক হয়ে যাওয়া একটা এক্স-১৬ বিমানের উপর। ছিটকে নীচে রওনা হয়েছে ধ্বংসাবশেষ। পিছন দিক বাষ্পায়িত হয়েছে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে।

‘আমার আর থেকে কী লাভ...’ রানা গুনল রোবটের করুণ হাহাকার। ‘স্যার বুঝি আর নেই!’

ওই বিমান ছিল কুয়াশার এক্স-১৬।

পাইলট মারা যাওয়ার পরও রানার বিমানের পিছু নিয়ে এসেছে এতদূর, রানাদের বিমান দু’বার বাঁক নেয়ার সুযোগ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল খুব কাছে। কিন্তু এইমাত্র রানার বিমানকে অ্যাম্রাম থেকে বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে কুয়াশা।

আকাশ থেকে খসে পড়ছে দু’টুকরো হয়ে যাওয়া বিমান।

কিন্তু হঠাৎ ধ্বংসাবশেষ থেকে ছিটকে বেরোল একটা প্যারাসুট।

টার্গেট টাইম:

০:১১...

০:১০...

বলতে গেলে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেইনি রানা। শব্দে
মনোযোগ দিয়েছে টাচক্রিনের রিফ্লেক্স প্যাটার্নে।

সাদা... লাল... সাদা... সাদা... লাল...

টার্গেট টাইম:

০:০৯...

‘ওটা খাড়া ভাবে নামতে শুরু করেছে, স্যর,’ দুঃখিত স্মরণে
বলল রঘুপতি।

হঠাৎ করেই কোর্স পাল্টে নিল মিসাইল।

খাড়াভাবে নামছে মক্কা শহর লক্ষ্য করে।

এক্স-১৬ বিমানের কন্ট্রোল স্টিক নাড়ল রঘুপতি। অনুসরণ
করছে মিসাইলের। খাড়াভাবে পিছু নিল মিসাইলের, পাশেই
থাকছে।

টাচক্রিন থেকে চোখ সরাল না রানা। ঝড়ের মত চলছে
আঙুল।

টার্গেট টাইম:

০:০৮...

দুটো বুলেটের মত পৃথিবী লক্ষ্য করে নামছে মিসাইল ও
এক্স-১৬।

০:০৭...

মক্কার বাতি ছুটে আসছে ওদের দিকে।

টার্গেট টাইম:

০:০৬...

নেচে চলেছে রানার আঙুল।

বিপ আওয়াজ তুলল টাচলক-৯ ইউনিট:

সেকেণ্ড প্রটোকল (রেসপন্স প্যাটার্ন):

স্যাটিসফায়েড ।
থার্ড প্রটোকল (কোড এন্ট্রি):
অ্যাকটিভ ।
প্লিয এন্টার অথোরাইজ্ ডিসআর্ম কোড ।

টার্গেট টাইম:

০:০৫...

বিদ্যুৎদ্বায়ে ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড এন্ট্রি করল রানা
সঙ্গে সঙ্গে জ্বিনে ফুটে উঠল:

থার্ড প্রটোকল (কোড এন্ট্রি): স্যাটিসফাইড ।
অথোরাইজ্ ডিসআর্ম কোড
এন্টার্ড ।
মিসাইল লঞ্চ অ্যাবোর্টেড ।

পরক্ষণে যা ঘটল সেজন্য রানা তৈরি ছিল না ।

মক্কা শহরের সুউচ্চ মিনারগুলোর অনেক উপরের আকাশে
সুপারসনিক গতি নিয়ে ছুটতে গিয়ে সেলফ ডেসট্রাক্ট মেকানিয়ম
কাজ করল লিয়ার্ড মিসাইলের সিপিইউ-এর ভিতর । বিস্ফোরিত
হলো মিসাইল । মস্ত পটকা যেন, চারপাশে ছিটকে গেল আগুনের
লাল ফুলকি ।

সবই এত দ্রুত ঘটল, হাওয়ায় ভর করে টুকরোগুলো পৌঁছল
শত মাইল দূরে । পরবর্তীতে জেরিকো-২বি মিসাইলের নানান
টুকরো মিলবে বহু দূরের মরুভূমিতে ।

কিন্তু ভিন্ন পরিণতি হলো রানা-রঘুপতির এক্স-১৬ বিমানের ।

লিয়ার্ড মিসাইলের বিস্ফোরণের ফলে পুরো নিয়ন্ত্রণ হারাল
রঘুপতি । রকেটের মত নামতে লাগল বিমান ।

কন্ট্রোল স্টিক হাতে সত্যিকারের নীরব মনোহর
রঘুপতি, কিন্তু বিমানের কাছ থেকে কোনও স্মৃতিমা আদায়
পারল না। অবশ্য একটা কাজ রঘুপতি করতে পারল।

ঘন বসতিপূর্ণ মস্কো শহরের বুকে বিদগ্ধ হলো না মন

কয়েক সেকেন্ড পর আকাশ থেকে উদ্ধার মত ডাকিলে
বিমান মরুভূমির ভিতর। খাড়াভাবে নেমেছে, অগতির
কাঁপিয়ে দিল জমিন। পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেও সে কম্পন
পেল সবাই।

আঁধার মরুভূমির আকাশ সাদা হয়ে উঠল বিস্ফোরণের
ফলে।

অনেক চেষ্টা করেও মাক থ্রি-র চেয়ে গতি কমাতে পারল
রঘুপতি।

বালিতে নেমেই বিস্ফোরিত হয়েছে এক্স-১৬।

মস্ত আগুনের গোলা জন্ম নিল।

কারও বাঁচবার সাধ্য নেই ওই বিস্ফোরণের পর।

ওই সংঘর্ষের মাত্র দুই সেকেন্ড আগে অবশ্য বিমান থেকে
ছিটকে আকাশে উঠেছে দুই ইজেকশন সিট স্বর্গের দিকে। ওই
দুই সিটে রয়েছে মাসুদ রানা ও রঘুপতি।

প্যারাশুটে ভর করে ধীরে ধীরে মরুভূমির মেঝেতে নামল
দুই ইজেকশন সিট।

একমাইল দূরে মস্ত গর্ত তৈরি করেছে এক্স-১৬।

ইজেকশন সিট নামবার পরেও রানা নড়ল না। নিজের সিট
বেল্ট খুলে নেমে পড়ল রঘুপতি, কাছে গিয়ে অসহায়ভাবে রানার
দিকে চেয়ে রইল সে।

প্রচণ্ড গতি সুপারসনিক ইজেকশনের কারণে জ্ঞান হারিয়েছে
রানা।

কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর জেগে উঠল রানা। টের
পেল, মুখে বিন্দু বিন্দু রক্ত। বেদম ব্যথা শুরু হয়েছে মাথা

জুড়ে। ছিঁড়ে পড়তে চাইছে দুই চোখ। প্রচণ্ড গতি ইজেকশনের কারণে এই ব্যথা স্বাভাবিক।

ফ্লাইট সিটে বসে চারপাশে ছায়ামূর্তি দেখল রানা। কারা যেন আনবাকল করছে ওর সিটবেল্ট।

কণ্ঠস্বর শুনল: ‘শুয়োরের বাচ্চা ওই গতি সহ্য করে নামল কী করে?’

‘বাদ দাও, শালাকে শেষ করে দাও। যে-কোনও সময়ে মেরিনরা আসবে।’

আবছা চেতনার ভিতর ইংরেজি শুনছে রানা।

উচ্চারণ আমেরিকানদের মতই।

সন্দেহ জন্ম নিল রানার মনে।

অবশ্য লাগছে, তখনই নড়তে পারল না।

একটা ছোরা কেটে দিল ওর সিটবেল্ট।

রানা আবছা দেখল, ঝুঁকে এসেছে এক পশ্চিমা লোক। পরনে মিলিটারি পোশাক। এক মুহূর্ত পর টের পেল, ওটা ইউএস স্পেশাল ফোর্স ডেল্টা ডিটাচমেন্টের পোশাক।

‘মেজর রানা,’ নিচু স্বরে বলল সে।

অস্পষ্ট শুনল রানা। মাথা খাটাতে ইচ্ছে করছে না ওর।

‘সবই ঠিক আছে, মেজর রানা। আপনি এখন নিরাপদ। আমরা ডেল্টা ফোর্স। আপনার পাশেই আছি। আমরা আপনার বন্ধুকেও তুলে এনেছি। কয়েক মিনিট পর পৌঁছে যাবেন তিনি।’

‘আপনারা...’ থেমে গেল রানা, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ‘আপনারা কারা? কোথা থেকে এসেছেন?’

ডেল্টা ফোর্সের লোকটা হাসল। কিন্তু সেই হাসি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। ‘আমার নাম জন উইলসন। ডেল্টা ফোর্সে আছি। এসেছি এডেন থেকে। কিন্তু ভাববেন না, মেজর। আমরা আপনার পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।’

ডানবাহুর মাংসে কী যেন বিঁধেছে, টের পেল রানা। পরক্ষণে

ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখছে রানা।

ফ্লাইট সিট থেকে ওকে তুলে নেয়া হয়েছে। ওকে ওন দুঃ হাতে আটকে দিল ফ্লেক্স-কাফ। ওকে তুলে দেয়া হলো একটা প্রাইভেট লিয়ার জেট বিমানে। রওনা হয়ে গেল আকাশগান, রানওয়ে থেকে লাফিয়ে উঠে গেল আকাশে।

আবছাভাবে গুনল কার যেন কণ্ঠ।

জন উইলসন বলেছে: ‘...তখনই ফোন দিল আইএসএস-এর পরিচিত ওই লোক। সবার খবর তার জানা, আগে আইসিসিতে ছিল। দেখতে ভয়ঙ্কর কুৎসিত। যেন আস্ত ইঁদুর। নাম কোভাক। ব্র্যাড কোভাক। ইঁদুর বলেই ডাকে সবাই।

ইঁদুর সবই জানে। ও জানত, আমি এডেনে আছি। আমাকে জানিয়েছে, মাসুদ রানার মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার। বলেছিল ইয়েমেনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে রানা। আরও বলেছে, আমি যদি আগ্রহী হই, আমার জন্য বিশ্বাসী কয়েকজনকে জোগাড় করে দেবে সে।

‘জানিয়েছে, মাসুদ রানার সঙ্গে থাকবে বিজ্ঞানী কুয়াশা। তার মাথার ওপরেও পুরস্কার ঘোষণা করেছে আমেরিকান সরকার। পাঁচ মিলিয়ন ডলার। ...আরে ভাই, আমি তো বিনা পয়সায় কুয়াশাকে তুলে দিচ্ছিলাম আপনাদের হাতে। আপনারা যখন বলছেন পাঁচ মিলিয়ন ডলার বাড়তি দেবেন, তো খুবই ভাল কথা। অপেক্ষা করুন। আমরা পৌঁছে যাব।’

বিমান উড়ে চলেছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল রানা।

কখন যেন ভাঙল ঘুম। খুব অস্বস্তি লাগল। এখনও ওর পরনে ইউটিলিটি ভেস্ট। কিন্তু পকেট থেকে সব অস্ত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শুধু রয়ে গেছে মুড়িয়ে রাখা একটা সোভিয়েত

কেমিকেল বডি ব্যাগ। ওটা কোনও অস্ত্রই না। কোনও কাজে আসবে না।

নড়ে উঠে চোখ মেলল রানা। কুয়াশা আর রঘুপতিকে দেখতে পেল। তাদের কজিতে ফ্লেক্স-কাফ। পিছনের সারির সিটে ওরা। পাহারা দিচ্ছে ডেল্টা ফোর্সের সেন্ট্রিরা। চোখ বুজে বসে আছে রঘুপতি। কিন্তু কুয়াশার চোখ খোলা। রানাকে নড়ে উঠতে দেখেছে। আবারও চোখ বুজল রানা। বড্ড ঘুম, বড্ড ঘুম।

আবারও ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

আবার কখন যেন জেগে গেল।

জানালা দিয়ে দেখল, রাতের কালো আকাশ নেই এখন, ফ্যাকাসে নীল রং ধরেছে।

ভোর হচ্ছে।

আবারও পুরুষ কণ্ঠ শুনল রানা।

‘আমরা ওদেরকে কোথায় নেব?’

‘একটা দুর্গে,’ বলল জন উইলসন। ‘ওটা ফ্রান্সে।’

পনেরো

ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়ন।

ব্রিটানির উপকূল, ফ্রান্স।

ষোলো অক্টোবর।

সকাল সাতটা।

সাগর এবং পাহাড়ি এলাকায় ঝামঝাম করে নেমেছে বৃষ্টি তারই মাঝে ডেমিয়েন ডগলাসের ব্যক্তিগত এয়ারস্ট্রিপে নেমে

এল রানাকে নিয়ে জেট বিমান।

বন্দি রানা, কুয়াশা ও রঘুপতিকেকে কুয়াশা পাহারায় ড্রাক
কাভার্ড ট্রাকে। ওদের পাহারায় থাকল জন
সৈনিক নিয়ে জন উইলসন। পাহাড় পথে দু'দিন
দু'দিন আগে এই রাস্তা ধরেই গিয়েছিল রানা, কুয়াশা ও রঘুপতি।

পথের শেষে প্রকাণ্ড কালো দুর্গ, ফোর্ট্রেস দো শ্যাটো।
কিছুক্ষণ পর মূল স্থলভাগ পেরিয়ে গেল ট্রাক, এতদূর
মস্ত ড্র-ব্রিজে। এই পথেই পৌঁছুতে হবে দুর্গে।

তুমুল বৃষ্টি চলছে, সেই সঙ্গে বজ্রপাত। ঝড়ঝড় ঝড়
আলোয় চমকে উঠছে ধূসর আকাশ।

ট্রাকে আসবার পথে সংক্ষেপে জন উইলসনের বিষয়
জানিয়েছে কুয়াশা রানাকে। তার ভাই হত্যা করতে চেয়েছিল
কুয়াশাকে, পাল্টা খুন হয়ে যায়। তখন থেকে ওকে খুঁজছে জন
উইলসন।

‘উইলসন বাউন্টি হান্টার নয়,’ বলেছে কুয়াশা। ‘বাউন্টি
হান্টিঙের প্রথম নিয়মই ভেঙেছে সে।’

‘কী নিয়ম সেটা?’ জানতে চেয়েছে রানা।

‘যদি জীবিত বা মৃত কাউকে নিয়ে যেতে বলা হয়, তা হলে
বাউন্টি হান্টাররা লোকটাকে জীবিত রাখে না,’ বলেছে কুয়াশা।
‘লাশ কখনও কোনও ক্ষতি করতে পারে না।’

এইমাত্র নুড়িপাথর ভরা উঠানে ঢুকল কাভার্ড ট্রাক। কড়া
ব্রেক কষে থেমে গেল দুর্গের পাশে।

ধাক্কা দিয়ে ট্রাক থেকে নামানো হলো রানা, কুয়াশা ও
রঘুপতিকেকে। অস্ত্র হাতে ওদেরকে কাভার করল উইলসন এবং
তার লোক।

সবার জন্য অপেক্ষা করছিল ব্যাঙ্কার মোসিউ ড্যাবলার।

দাঁড়িয়ে আছে ক্লাসিক গাড়ির গ্যারাজের গেটে। বরাবরের
মতই পরনে নিখুঁত সুট।

তার পাশেই কাট কে. এবেলহার্ড। তার সঙ্গে রয়েছে এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-এর দশজন বাউন্টি হান্টার। এরা ডেমিয়েন ডগলাসের প্রাইভেট সিকিউরিটি ফোর্স হিসাবে কাজ করছে।

‘মেজর উইলসন,’ খুশির সুরে বলল ড্যাবলার। ‘ওয়েলকাম টু ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়ন। আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।’

গ্যারাজের পথ দেখাল সে। শেষমাথায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল অ্যান্টি-রুমে। আগেও এখানে এসেছে, মনে পড়ল রানার। অবশ্য, এবার আগের সুড়ঙ্গ ব্যবহার না করে পাথরের একটা দরজার সামনে দাঁড়াল ড্যাবলার। চারপাশ পরিত্যক্ত মনে হলো রানার কাছে। দরজা খুলে যেতেই সরু একটা পেঁচানো মেডিইভেল স্টেয়ারকেস শুরু হলো।

পাশের দেয়ালে একটু দূরে দূরে জ্বলছে মশাল। ঘুরে ঘুরে অনেক নীচে নেমেছে সিঁড়ি। রেলিং নেই। কিছুক্ষণ নেমে যাওয়ার পর ওরা বুঝল, ঢুকে গেছে দুর্গের অনেক গভীরে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নামবার পর সামনে পড়ল পাথরের গায়ে পুরু এক লোহার দরজা।

গোপন সুইচ টিপল ড্যাবলার। গুড়গুড় আওয়াজ তুলে সিলিঙের দিকে উঠল দরজা। একপাশে সরে দাঁড়াল ড্যাবলার, হাতের ইশারা করল। প্রথমে বন্দিদেরকে নিয়ে ঢুকতে হবে উইলসন এবং তার লোকদেরকে।

দলের সবাইকে নিয়ে দরজা পেয়িয়ে গেল উইলসন। সামনে রেখেছে রানা, কুয়াশা ও রঘুপতিকে।

এপাশে মস্ত একটা গোল জলাশয় দেখল রানা। কূপের মত, কিন্তু বিশাল আকারের।

কূপের দেয়ালের উপর অংশে ছলকে লাগছে সাগরের ঢেউ।
কূপের নানা জায়গায় শাথুরে মঞ্চ।

নীচের সাগরে ঘুরছে দুটো টাষ্টপার শার্ক।
রানা বুঝে গেল, এটাই সেই ডানডান। রানাকেই বন্ধি
হয়েছিল কুয়াশা ওঁতিশা।

একপাশে একটা বারো ফুটি গিলোটিন দেখল রানা।
এটাই কুয়াশার কাছ থেকে শোনা সেই শার্ক।
ওদের পিছনে সিলিং থেকে নেমে পাড়বে মোগল ঝাঁপ
আটকে গেছে স্টিলের দরজা।

বুদ্ধিমানের মতই বাইরে রয়ে গেছে ড্যাবলার।
শার্ক পিটে রানাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরেকজন।
লোকটার চুল গাজরের রঙের। মুখটা ইঁদুরের মত চোখা।
'হাই, কোভাক,' বলল উইলসন। সামনে বেড়ে হ্যাণ্ডশেক
করল।

হাত মিলিয়ে সরে দাঁড়াল কোভাক, রানার দিকে চাইল।
নির্বিকার চেহারা।

'তা হলে তুমিই বিসিআই-এর মাসুদ রানা,' বলল। 'নানা
সমস্যা করেছে। তোমার সাইবেরিয়ার মিশন গুছিয়ে দিতে অনেক
সময় দিয়েছি। পরিবেশ তৈরি করেছি। এগযেকিউশন সলিউশন
ফর ইউ-এর মার্সেনারিদের পাঠিয়েছি। অ্যাটলক আর রবিন
কার্লটনকে ওখানে পাঠিয়েছি তোমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে।
তারপর তোমার কমিউনিকেশন বন্ধ করেছি। হার্লি, অ্যাটলক
আর রবিন কার্লটন ভাল যোদ্ধা ছিল না, কিন্তু তুমি অন্যকিছু।
বেঁচেই থাকলে।

'কিন্তু এবার বেশিক্ষণ বাঁচবে না। পালাতেও পারবে না।
মরতেই হবে।' রানাকে পাকড়ে ধরা ডেল্টা সৈনিকের দিকে
চাইল কোভাক। 'ওকে তোলো গিলোটিনে।'

জন উইলসনের দুই সৈনিক ধাক্কা দিয়ে রানাকে নিয়ে গেল
গিলোটিনের সামনে। ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়া হলো বন্দিকে।
ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিল নতুন কাঠের আড়া। হামাগুড়ির

ভঙ্গিতে বসতে হয়েছে রানাকে। পিঠে ফ্লেস্ক-কাফে আটকানো দুই হাত।

‘না!’ ডানজনের আরেকপ্রান্ত থেকে ধমকে উঠল একটা কণ্ঠ।
ওদিকে ঘুরে চাইল সবাই।

পিটের অনেকটা উপরে ব্যালকনি, ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে ডেমিয়েন ডগলাস।

পাশে এবেলহার্ড এবং তার দশ বাউন্টি হান্টার।

আবারও উদয় হয়েছে মোসিউ ড্যাবলার।

‘ওর চোখ যেন থাকে গিলোটিনের ব্লেডের ওপর,’ বলল ডেমিয়েন। ‘দেখুক কীভাবে নামে ক্ষুর।’

নির্দেশ পালন করল ডেল্টা ফোর্সের দুই সৈনিক।

ক্ষুরধার ব্লেডের দিকে চোখ রানার। বারো ফুট উপরে কাঠের ফ্রেমে গিলোটিন, আয়নার মত চকচক করছে।

‘বাংলাদেশি মেজর,’ বলল ডেমিয়েন, ‘নিজ বুদ্ধি এবং যোগ্যতায় বর্তমানের সভ্যতা রক্ষা করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে গেল, যাদেরকে তুমি চেনোও না। তারাও শোনেনি তোমার নাম। সত্যিই তুমি মস্ত হিরো। কিন্তু তোমার বিজয় কয়েক দিনের জন্যে। কারণ আমি বেঁচে থাকছি। শাসন করব এই গোটা দুনিয়াকে। তোমার সময় ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আমার সময় মাত্র শুরু। এবার বুঝবে হিরো হতে গেলে কী ধরনের ক্ষতি মেনে নিতে হয়। মিস্টার কোভাক, ব্লেড নামিয়ে দাও ওর গলার উপর। তারপর গুলি করে ঝাঁঝরা করবে হিরো মাসুদ রানাকে। এরপর...’

‘ডেমিয়েন!’ ডানজনের ভিতর গমগম করে উঠল রানার কণ্ঠ।

সবাই থমকে গেল।

শান্ত, শীতল কণ্ঠে রানা বলল, ‘আমি তোমাকে শেষ করব।’

শীতল হাসল ডেমিয়েন ডগলাস। ‘এই জীবনে নয়, মেজর।’

কোভাক, ব্লেড!

গিলোটিনের পাশে পৌঁছে গেছে ষ্ট্যান মুখো কোভাক।
রানার দিকে চাইল, তারপর খপ করে মরণ শোহান লিভার।

ওই একইসময়ে কুয়াশার মাথা লগা করে কোন্ট্রোল
রিভলভার তুলল জন উইলসন।

‘নরকে দেখা হবে, মাসুদ রানা,’ বলল কোভাক।

পরক্ষণে টান দিল লিভারে, খুলে দিয়েছে ব্লেড।

সরসর করে নেমে এল ইস্পাতের চকচকে পাত।

কিছুই করবার নেই রানার, চুপ করে চেয়ে রইল।

ওর গলা লক্ষ্য করে নামছে ব্লেড।

শেষ পর্যায়ে আস্তে করে চোখ বুজল রানা।

পরক্ষণে আওয়াজ উঠল: ঠং!

রানার মৃত্যু এভাবে এল না।

কোনও ব্যথাই টের পেল না ও।

আবারও চোখ মেলল।

ওর গলা থেকে মাত্র একফুট উপরে থেমে গেছে গিলোটিনের
ব্লেড। ওটাকে আটকে দিয়েছে একটা পাঁচ ব্লেডের গুরিকেন।
গভীরভাবে গঁথে গেছে কাঠের ফ্রেমে। আর নামতে দিচ্ছে না
ইস্পাতের পাত।

এইমাত্র ছোঁড়া হয়েছে গুরিকেন, কাঠে গঁথে এখনও থরথর
করে কাঁপছে পাত।

একইভাবে রক্ষা করা হয়েছে কুয়াশাকে। গুরিকেন ছিটকে
যাওয়ার পর মুহূর্তে একটা বুলেট বিঁধেছে জন উইলসনের ডান
কজিতে। ছিটকে পড়েছে রিভলভার পানিতে। লোকটার কজির
ক্ষত থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত।

ঘুরে চাইল রানা। অবাক হয়ে দেখল, শার্ক পিটের পানি
থেকে উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর এক মূর্তি।

পরনে ধূসর ইউনিফর্ম, মুখে স্কুবা গিয়ার— একহাতে

শুরিকেন ছুঁড়ছে, অন্য হাতে গর্জন ছাড়ছে অস্ত্র ।

ওই কালিমূর্তি যেন স্বয়ং মৃত্যুদূত ।

নিশাত সুলতানা ।

নিশাত আপা ।

পানি-সমতল ভেঙে ছিটকে উঠেছে সে, এ মুহূর্তে দুই হাতে এম-৭ মেশিন পিস্তল । গুলি করছে বাড়ের গতিতে । দুই গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল দুই ডেল্টা সৈনিক, মৃত ।

চারপাশে নড়তে শুরু করেছে সবাই ।

নিশাতের হঠাৎ আগমনে কুয়াশা ও রঘুপতি টের পেয়েছে, এখন ওদের উপর কারও চোখ নেই । সবাই দেখছে রানাকে ।

লাফিয়ে উঠে দু'পা-র তলা দিয়ে দু'হাত ঘুরিয়ে আনল কুয়াশা ও রঘুপতি । সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে হাতের প্লাস্টিকের ফ্লেক্স-কাফ ।

নির্দেশনা লাগল না নিশাত সুলতানার ।

দুই গুলিতে উড়িয়ে দিল কুয়াশা ও রঘুপতির হ্যাণ্ড-কাফ ।

মুহূর্তে মুক্ত হয়ে গেল কুয়াশা ও রঘুপতি ।

উপরের ব্যালকনিতে নিজ লোকদের কাজে নামতে ইশারা করল কার্ট কে. এবেলহার্ড । চারজনকে পাঠাল ব্যালকনি থেকে নীচের পিট লক্ষ্য করে । অন্য ছয়জনকে নিয়ে ব্যালকনির পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে । করিডোরে থেমেই বের করল এম-১৬ । পাহারা দিয়ে ডানজন থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে ডেমিয়েন ডগলাসকে ।

এদিকে ডেল্টা ফোর্সের মৃত এক লোকের পাশে পড়ে থাকা কোল্ট কমাণ্ডো রাইফেল তুলে নিল কুয়াশা । এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-এর চার লোক ব্যালকনি থেকে নামছে, তাদের উদ্দেশ্যে গুলি পাঠাল ও ।

কুয়াশার পাশে রঘুপতি এখনও নিরস্ত্র, কয়েক লাফে সামনে বেড়েই থাবা মারল এক ডেল্টা সৈনিকের নাকে । লোকটার

মগজে গেঁথে গেল নাকের হাড়। দুপ করে পাড়ল নানা।

‘রঘুপতি!’ নির্দেশ দিল কুয়াশা। ‘রানাকে গারামে নানা।’

ঝড়ের গতিতে গিলোটিনের দিকে ছুটল রোনালি।

গোলাগুলি শুরু হওয়ায় গিলোটিনের পাশে লুকিয়ে পাড়ল
কোভাক, সামান্য দূরেই রানা।

মুহূর্তের জন্য গোলাগুলি থেমেছে বুঝেই গিলোটিনের দক্ষ
থেকে গুরিকেন খুলে নিতে চাইল কোভাক।

এবার ব্লেড নামবে রানার গলা লক্ষ্য করে।

খপ করে গুরিকেন ধরল লোকটা।

কিন্তু তখনই মারাত্মক উল্টো এক চড় খেয়ে ছিটকে পড়ল
সে।

পাথুরে মঞ্চের কিনারায় পড়েছে। খেয়াল করল, ওর চোখে
চোখ রেখে পানি থেকে চেয়ে আছে একটা টাইগার শার্ক। শক
খাওয়া লোকের মত ছিটকে উঠে দাঁড়াল কোভাক।

ওদিকে রানার পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রঘুপতি, ওকে কাভার
দিচ্ছে রাইফেল হাতে কুয়াশা। প্রতিটি গুলি অব্যর্থ।

হ্যাঁচকা টানে গিলোটিনের কাঠের আড়া তুলে ফেলল
রঘুপতি, মুক্ত করে দিল রানাকে।

কুয়াশার এক গুলি ছিঁড়ে দিল রানার ফ্লেক্স-কাফ। আর
তখনই হঠাৎ করেই রানাকে পিছনে সরিয়ে দিল রঘুপতি। নিজে
বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে।

পরক্ষণে এক রাশ গুলি ঝাঁঝা করে দিল রঘুপতির বুক।

ছিটকে বেরোল নীল রক্ত, ওর প্রাণশক্তি।

কূপের একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে গুলি করছে উইলসন। ডান
কজি রক্তাক্ত, অন্যহাতে কোল্ট কমাণ্ডো রাইফেল। বারবার
টিপছে ট্রিগার।

‘না!’ হাহাকার করে উঠল কুয়াশা। ধ্বংস হতে দেখছে নিজ
সৃষ্টি।

উইলসনের দিকে অস্ত্র ঘোরাল কুয়াশা, কিন্তু ফুরিয়ে গেছে
ওর রাইফেলের ম্যাগাযিন।

নিজেই ছিটকে রওনা হলো কুয়াশা, এক সেকেণ্ড পর ডাইভ
দিয়ে পড়ল উইলসনের দুই পায়ে। ভয়ঙ্কর ট্যাকল করেছে।
হুড়মুড় পরে হাঙরের কূপে ঝুপ করে পড়ল দু'জন।

গিলোটিন থেকে মুক্ত হয়েই ঘুরে চাইল রানা, টলতে টলতে
ইম্পাতের দরজার দিকে চলেছে কোভাক। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে
যাবে শার্ক পিট থেকে।

রানা ছুট লাগাল তার পিছনে।

কিন্তু জ্যাকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল বের করেছে লোকটা।

সরসর করে উপরে উঠল দরজা।

তাড়া খাওয়া কুকুরের মত ছুটল কোভাক।

ঝড়ের গতিতে পিছু নিয়েছে রানাও, তারই ফাঁকে থ্রোট
মাইকে বলল, 'আপা!'

কাছেই এক মঞ্চের পিলারের আড়াল নিয়েছে নিশাত
সুলতানা, পিস্তল হাতে গুলি করছে দুই ডেল্টা সৈনিককে লক্ষ্য
করে। তারই ফাঁকে শুনেছে রানার ডাক।

গুলি পাঠাল কোভাকের উদ্দেশে। কিন্তু লাগল না গুলি।

অবশ্য একঘিট দিয়ে বেরোবার সাহস হারাল লোকটা,
কাভার নিল একটা পাথুরে মঞ্চের।

নিশাতের গুলির কারণে বাড়তি সুবিধা পেল না রানা।

উল্টো বাড়তি সুবিধা পেল নিশাতের দিকে গুলি পাঠানো
ডেল্টা সৈনিকরা।

এক রাশ গুলি বিঁধল নিশাতের বুকে।

ওর বুকে রয়েছে বুলেট প্রুফ ফ্লেক ভেস্ট। ঝাঁকি খেয়ে
পিছিয়ে গেল ও। একের পর এক বুলেট লাগছে বুকে।

ছিটকে পিছিয়ে গেল নিশাত, এবং সে সুযোগে নিখুঁত
লক্ষ্যভেদ করতে চাইল এক ডেল্টা সৈনিক। রাইফেল তাক

করেছে নিশাতের মাথা লক্ষ্য করে ।

কিন্তু তখনই ঝপাস্ করে পানিতে পড়ল নিশাত ।

মাথার উপর দিয়ে গেল অন্তত বিশটা গুলি ।

মুহূর্তের জন্য নীরবতা নামল ডানজনে ।

এক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল নিশাত, বুলেট ডগারে ১১১
দু'হাতের পিস্তল ।

ওর দিকেই গুলি করেছে ডেল্টা সৈনিকরা ।

কিন্তু তখনই মুখে-বুকে বুলেট খেয়ে ছিটকে পড়ল তারা ।

সম্ভ্রষ্টির হাসি হাসল নিশাত ।

আর তখনই টের পেল, অতিরিক্তি নড়ছে চারপাশের পানি ।

ঝট্ করে ঘুরে গেল নিশাত... দেখল মস্ত একটা ঢেউ তেড়ে
আসছে ওকে লক্ষ্য করে । উঁচু হয়ে উঠেছে টাইগার শার্কের
ডর্সাল ফিন ।

‘সর্বনাশ!’ ফিসফিস করল নিশাত । ‘মাছের খাবার হতে চাই
না!’ পিস্তল তুলেই গুলি শুরু করল ও হাঙর লক্ষ্য করে ।

গতি কমছে না হাঙরের ।

গুলি লাগছে, কিন্তু ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে মস্ত চোয়াল হাঁ
করে আসছে ওটা ।

টাশ্শ্! টাশ্শ্! আওয়াজ তুলছে পিস্তল ।

গতি কমল না হাঙরের ।

পানিতে ফেনা তৈরি করেছে, আরও মস্ত হাঁ করেছে— ছুটে
এল নিশাতের পা লক্ষ্য করে!

চোয়ালে খপ্ করে পুরে ফেলল একটা পা । পরক্ষণে চিবাতে
লাগল নিশাতের বাম পা ।

সামান্যতম ব্যথা লাগল না নিশাতের ।

ওই নকল পা টাইটেনিয়ামের তৈরি ।

মুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল হাঙরের দুটো দাঁত ।

‘খা-না!’ টাইগার শার্কের মগজ লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল

নিশাত ।

টাশ্শ করে উঠল পিস্তল ।

পানির ভিতর মস্ত একটা বাঁকি খেল হাঙর, ছিটকে পিছিয়ে গেল । এখনও পা চোয়ালের ভিতর । এক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল ওটার লাশ । এখনও মুখের ভিতর নিশাতের পা । শেষ মুহূর্তেও শিকার ছাড়তে চায়নি ।

বেদম এক লাথি দিয়ে হাঙরের লাশ সরিয়ে দিল নিশাত, ছাড়িয়ে নিল পা । লাফ দিয়ে উঠে এল ডানজনে, অনেক কাজ পড়ে আছে ওর ।

হাঙরের সঙ্গে যখন লড়াই করছে নিশাত, সেই একই সময়ে কোভাকের পিছু নিয়েছে রানা । এবং ধরেও ফেলেছে তাকে । চার ফুট দূর থেকে ডাইভ দিয়ে চলে গেল রানা দরজার কাছে ।

আইএসএস এজেন্ট লাথি দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল রানাকে । কিন্তু হাঁটুর পাশে ধাক্কা দিয়ে ভারসাম্য নষ্ট করে দিল রানা ওর । পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠেই ঘুষি বসাল রানা লোকটার চোয়ালে । ছিটকে পড়ল সে দেয়ালে । আর বেরোতে পারবে না ডানজন থেকে । সিধে হয়ে দাঁড়াবার আগেই তার চোয়ালে নামল রানার ভয়ঙ্কর ঘুষি । ভাঙা নাক থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত ।

রানার পর পর দুই ঘুষি ভেঙে দিল কোভাকের চোয়াল । সুযোগই পেল না লোকটা, তাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে নিল রানা, পরক্ষণে ছুঁড়ে ফেলল গিলোটিনের তক্তার উপর । ধড়মড় করে উঠে পালাতে চাইল কোভাক ।

‘গিলোটিন ব্যবহার করবি, না?’ ঝড়ের মত সামনে বেড়েছে রানা, খপ করে গুরিকেন ধরেই টান দিয়ে সরিয়ে নিল ফ্রেম থেকে ।

‘নাহ্!’ আত্ননাদ করে উঠল কোভাক । এখনও সরতে পারেনি গিলোটিনের তলা থেকে । ‘নাহ্!’

তখনই খটাৎ আওয়াজে তার গর্দানের উপর নামল

গিলোটিনের ব্লেড।

গলা থেকে ছিটকে আরেকদিকে রওনা হলো কোভাকের মুণ্ড, যেন ফুটবল। এখনও দেখছে, পিটপিট করছে দুই চোখ। কয়েক সেকেন্ড পর শিথিল হলো গালের পেশি। দৃষ্টিতে রয়ে গেছে ভয়।

গিলোটিনের দশ গজ দূরে হাঙরের পুলে ভেসে উঠেছে কুয়াশা, এখনও লড়ছে জন উইলসনের বিরুদ্ধে।

ডেল্টা ট্রেনিং কাজে লাগাতে চাইছে উইলসন, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। পরস্পরের মুখ ও বুক লক্ষ্য করে ঘুমি মারছে দু'জন। জাপানি এক মস্ত গুরুর কাছে খালি হাতের লড়াই শিখেছে কুয়াশা। অনায়াসেই উইলসনের ঘুমি বা চপ্ এড়িয়ে যাচ্ছে। দু'জনই জানে, এই লড়াই শেষে বাঁচবে মাত্র একজন।

পানির ভিতর মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ করেই ভেসে উঠল দু'জন। কিন্তু ছোট্ট একটা পিস্তল দেখা দিয়েছে উইলসনের হাতে। ওটার মাযল ঠেকিয়ে দিল কুয়াশার থুতনিত।

জিতে গেছে সে লড়াইয়ে।

‘জানতাম তুই পালাতে পারবি না, কুয়াশা!’ দাঁতে দাঁত চেপে বলল উইলসন। ‘এবার আমার ভাই স্বর্গে ভাল থাকবে!’

‘কখনও পালাতে চাইনি,’ পাল্টা বলল কুয়াশা।

‘তাই?’ দাঁতে দাঁত পিষল উইলসন।

‘হ্যাঁ!’ হঠাৎ করেই কাঁধের ভয়ঙ্কর শক্তি ব্যবহার করে উইলসনকে ঘুরিয়ে দিল কুয়াশা। ওদিক দিয়ে ছুটে আসছে দ্বিতীয় টাইগার শার্ক!

পূর্ণ গতি নিয়ে উইলসনের বুকে গুঁতো দিল দশফুটি হাঙর। এক খাবলা মাংস তুলল বুক থেকে। আরাম করে চিবাতে শুরু করেছে। পরের খাবলা মাংস নিল পাজর থেকে। কুয়াশার পাঁচ ইঞ্চি দূরে আরাম করে ভোজে ব্যস্ত হাঙর। উইলসনের হাতের রক্তের লোভনীয় গন্ধেই ছুটে এসেছে। পাত্তাই দিল না কুয়াশাকে।

বিকট চিৎকার জুড়েছে জন উইলসন। তাকে জীবন্ত খেয়ে

ফেলছে মস্ত হাওর!

লাফ দিয়ে কূপের পারে উঠে এল কুয়াশা। একবার দেখল রক্তাক্ত ফেনার ভিতর এখনও পাগলের মত হাত নাড়ছে লোকটা। এক সেকেণ্ড পর তলিয়ে গেল।

রানার দিকে রওনা হয়ে গেল কুয়াশা।

ওদের দেখা হলো গিলোটিনের পিছনে। এইমাত্র রঘুপতিকে ওখানে সরিয়ে নিয়েছে রানা। ডানজনে কূপের ওদিকে এখনও রয়ে গেছে চার ডেল্টা সৈনিক, গুলি করছে ওদেরকে লক্ষ্য করে।

কয়েকটা অস্ত্র জোগাড় করেছে রানা। দুটো কোল্ট কমাণ্ডো অ্যাসল্ট রাইফেল, একটা এমপি-৭, কুয়াশার এইচঅ্যাওএইচ ৯এমএম পিস্তল এবং বৈজ্ঞানিকের ইকুইপমেন্ট ভরা ইউটিলিটি ভেস্ট। শেষের জিনিসটা এসেছে এক মৃত ডেল্টা সৈনিকের কাছ থেকে।

ওদের পাশে পৌঁছে গেল নিশাত।

‘শেষবার আপনাকে দেখেছি এমভি লোটাস সুপারট্যাঙ্কারের মেইনটেন্যান্স শ্যাকে,’ নিশাতকে বলল কুয়াশা। ‘তখন হেট্রিকের লোক আরপিজি ছুঁড়ল। কোথায় লুকিয়েছিলেন? মেঝে তো ছিল পরিষ্কার।’

‘মেঝে দিয়ে কী হবে?’ বলল নিশাত। ‘ওই শ্যাক বুলছিল হোল্ডের ছাত থেকে। ছাতে আবার একটা হ্যাচ ছিল। সোজা উঠে গেছি ওখানে। আর তারপর তো কচুর গোটা জাহাজ...’

‘আপনি কী করে জানলেন আমরা এখানে থাকব?’ জানতে চাইল কুয়াশা।

ভেস্ট থেকে ওয়াটারপ্রুফ পাউচ বের করল নিশাত, ওটা থেকে নিল পাম পাইলট। ‘আপনার কাছে দারুণ সব মজার খেলনা আছে, মিস্টার কুয়াশা। আর...’ রানার দিকে চাইল নিশাত। ‘স্বরের হাত ভরা আছে মাইক্রোডটে।’

‘আপনাকে ফিরে পেয়ে ভাল লাগছে,’ বলল রানা।

গিলোটিনে ঠং করে লাগল এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র বাউন্টি হান্টারদের গুলি।

চট করে ঘুরে চাইল রানা। মাত্র দশগজ দূরে খোলা দরজা।

‘আমি চললাম ডেমিয়েন ডগলাসের পিছনে,’ বলল রানা। ‘আপা, আপনি রঘুপতির পাশে থাকুন। শেষ করে আসবেন শত্রুদেরকে। কুয়াশা, আপনি আমার সঙ্গে যেতে চান?’

একবার রঘুপতিকে দেখল কুয়াশা, তারপর বলল, ‘আমি তোমার সঙ্গে যাব।’

রানার পরনে এখনও কুয়াশার দেয়া ইউটিলিটি ভেস্ট। একটা রাইফেল কুয়াশাকে দিল রানা। এ ছাড়া ৯মএম পিস্তল এবং নানা কিছু ভরা ভেস্ট। ‘নি, আপনার কাজে আসবে। চলুন রওনা হয়ে যাই। আপা, আপনি আমাদেরকে কাভার দেবেন।’

অস্ত্র ঘুরিয়ে নিল নিশাত, এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র লোকগুলোকে লক্ষ্য করে কাভার ফায়ার শুরু করল।

দরজার দিকে ছুট দিল রানা। ওর পিছনে কুয়াশা। অবশ্য তার আগে নিশাতের কাছ থেকে কী যেন নিয়েছে।

‘ওটা দিয়ে কী করবেন, মিস্টার কুয়াশা?’ পিছন থেকে জানতে চাইল নিশাত।

রানার পিছনে পাথুরে ডোরওয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল কুয়াশা, ‘মন বলছে কাজে আসবে।’

দেয়ালের ব্র্যাকেটে রাখা মশালের লালচে আলোয় ঝড়ের গতিতে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল দু’জন— নিজেদের কাজে খুবই দক্ষ। একে অপরকে কাভার দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই ঝলসে উঠছে কোন্ট কমাণ্ডো অ্যাসল্ট রাইফেলের মাযল।

সুযোগই পেল না এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র ছয় মার্সেনারি।

রানা আগেই ধারণা করেছিল এবেলহার্ড এদিকে রাখবে তার

লোকদেরকে ।

স্টেয়ারওয়েলের তিনটি ধাপে দু'জন করে রেখেছে সে । গুলি করছে দেয়ালের অ্যালকোভ থেকে ।

ঝড়ের গতিতে উঠতে থাকা দুই যোদ্ধার গুলির তোড়ে উড়ে গেল দুই মার্সেনারি । লাশ হয়ে পড়ে রইল সিঁড়ির ধাপে ।

পরের ল্যান্ডিংয়ের দুই মার্সেনারি কিছুই শোনেনি । বাঁকের ওদিক থেকে এল দুটো গুরিকেন, বুমেরাঙের মত আঘাত হানল দুই সৈনিকের কপালে । কেটে ঢুকে গেল মগজে, সেখানেও কয়েক পাক ঘোরার পর থামল ।

তৃতীয় ধাপের দুই মার্সেনারি সতর্ক ।

তারা একটা ফাঁদ পেতেছে ।

স্টেয়ারওয়েলের উপরে সুড়ঙ্গে অপেক্ষা করছে পিছনে অ্যান্টি-রুম । ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় ফুটন্ত তেলের সুড়ঙ্গে । শেষমাথায় ডেমিয়েন ডগলাসের অফিসে অপেক্ষা করছে কাট কে. এবেলহার্ড । পাহারা দিচ্ছে ডগলাস ও ড্যাবলারকে ।

স্টেয়ারওয়েলের উপরে পৌঁছে থামল রানা ও কুয়াশা । উঁকি দিতেই দেখল সুড়ঙ্গে দুই মার্সেনারি । এদেরকে শেষ করতে পারলে অন্যদেরকে কোণঠাসা করতে পারবে ।

এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা ।

আগের জায়গায় রয়ে গেল কুয়াশা ।

ঝড়ের মত অ্যান্টি-রুম পেরোল রানা, গুলি করছে সুড়ঙ্গের দুই মার্সেনারিকে লক্ষ্য করে ।

পাল্টা গুলি পাঠাল তারাও ।

‘রানা, না!’ পিছন থেকে সতর্ক করতে চাইল কুয়াশা । ‘ওটা একটা ফাঁদ...’

অনেক দেরি হয়ে গেছে ওর ।

অ্যান্টি-রুমের তিনদিকে ইস্পাতের দরজা নেমে এল সড়সড় করে । চতুর্থ দরজা আটকে দিল স্টেয়ারওয়েলের দিক । এখন

আর অ্যাণ্টি-রুম থেকে সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারবে না কুয়াশা।

বিকট আওয়াজে নেমেছে ইস্পাতের দরজা।

আলাদা হয়ে গেছে রানা ও কুয়াশা।

সুড়ঙ্গে আটকা পড়েছে রানা। সামনের মেঝেতে পড়ে আছে দুই মার্সেনারি। একজন মারা গেছে, অন্যজন গুঁড়িয়ে চলেছে মৃত্যু যন্ত্রণায়, বাঁচবে না।

অ্যাণ্টি-রুমে রয়ে গেল কুয়াশা।

বন্ধ সুড়ঙ্গে থমকে দাঁড়াল রানা।

স্পিকারে ডেমিয়েনের কণ্ঠ শুনল: ‘মেজর রানা, খুশি হয়েছে তোমাকে চিনতে পেরে। কুয়াশার দক্ষতাও দেখলাম। তবে এবার বিদায় নিতে হবে তোমাদের দুজনকেই।’

অ্যাণ্টি-রুমে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। সিলিঙের দিকে চোখ যেতেই দেখল, ওখানে পাথুরে দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছে ছয়টি মাইক্রোওয়েভ এমিটার।

‘সর্বনাশ!’ ফিসফিস করল কুয়াশা।

‘কিন্তু এখন খেলা শেষ,’ স্পিকারে গমগম করছে ডেমিয়েনের কণ্ঠ, ‘এবার ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে বিদায় নেবে তোমরা।’

নিজের অফিসে প্লাস্টিকের ছোট জানালা দিয়ে ওদিকে চাইল ডেমিয়েন। সামনে ফুটন্ত তেলের সুড়ঙ্গ। ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, বন্দি।

‘গুডবাই, জেন্টলমেন।’

টেবিল থেকে রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিয়ে দুটো বাটন টিপল ডগলাস। দুই বুবি ট্র্যাপ চেম্বারে চালু হয়েছে দুই মরণ ফাঁদ।

কুয়াশার অ্যাণ্টি-রুমে গুনগুন করে উঠল মাইক্রোওয়েভ এমিটার। ওদিকে রানার সুড়ঙ্গের নালা দিয়ে নামতে শুরু করেছে ফুটন্ত তেল।

প্রথমে অ্যাণ্টি-রুমে ভ্রমর গুঞ্জন শুনল ডেমিয়েন ডগলাস।

তখনই গুলির আওয়াজ শুরু হলো।

আগেও কেউ কেউ এমন চেষ্টা করেছে।

বেরিয়ে যেতে চেয়েছে অ্যান্টি-রুম থেকে। কিন্তু ইস্পাতের দরজার কারণে কিছুই করবার থাকে না। গুলি করে উড়িয়ে দেয়া যায় না মাইক্রোওয়েভ এমিটার, গেঁথে দেয়া হয়েছে রিইনফোর্সড পাথুরে দেয়ালে।

ডেমিয়েন ডগলাসের জানালার ওপাশে বিস্ফোরণের আওয়াজ চলছে। সুড়ঙ্গে নামছে ফুটন্ত হলদে তেল। ওদিকে আর রানাকে দেখতে পেল না ডগলাস।

দেখবার দরকারও পড়ে না।

তার জানা আছে এখন কী ঘটছে।

গোটা সুড়ঙ্গে নামছে স্প্রে করা আগুন গরম তেল। মাসুদ রানার বিকট আর্তনাদ শুনল ডেমিয়েন।

অবশ্য, দুই মিনিট পরেই মিলিয়ে গেল কুয়াশা ও রানার আর্তনাদ। আর গোলাগুলির আওয়াজ নেই। নিশ্চিত হয়ে স্টিলের দরজা খুলে দিল ডেমিয়েন ডগলাস।

আর তখনই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল।

টানেলের মেঝেতে পড়ে আছে এগযেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-এ দুই মার্সেনারি, পুড়ে গেছে। তাদের একজনের দুই হাত আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে আকাশে উঠেছে। ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে মরেছে লোকটা। আড়াল চেয়েছিল ফুটন্ত তেল থেকে।

কিন্তু সুড়ঙ্গের কোথাও মাসুদ রানাকে দেখা গেল না।

অবশ্য টানেলের শেষে অ্যান্টি-রুমের দরজার কাছে কালো মানব দেহ আকৃতির কী যেন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জিনিসটা একটা কালো পলিমার-প্লাস্টিক বডি ব্যাগ। মার্কোভ টাইপ-৩। সোভিয়েতরা বহু যত্ন নিয়ে তৈরি করেছিল। রানার ভেস্ট থেকে সবই কেড়ে নিয়েছিল জন উইলসন, রয়ে

গিয়েছিল মাত্র একটা জিনিস— ওই বাগ। সে গোলন্দ
কেমিকেল কন্টামিনেশন ঠেকাতে পারে। আরও একটা কাগজ
পারবে, অনায়াসেই ঠেকিয়ে দেয় ফুটন্ত তেল!

বডি ব্যাগের যিপার টেনে খুলল রানা, ভোওনাগির নাম
বেরিয়ে এল এম-৭ মেশিন পিস্তল হাতে।

ওর প্রথম গুলিতে ডেমিয়েন ডগলাসের হাত থেকে উড়াল
দিল রিমোট কন্ট্রোল। খোলাই থাকল টানেলের দরজা।

দ্বিতীয় গুলিতে উড়ে গেল ডেমিয়েন ডগলাসের বাম কান।
রানার হাতে অস্ত্র দেখেই ডোরফ্রেমের আড়াল নিয়েছে লোকটা।
এক সেকেণ্ড দেরি হলে উড়ে যেতে কপাল।

সরু টানেলে ঝড়ের গতিতে সামনে বাড়ল রানা, হাতে
উদ্যত এমপি-৭।

অফিসের ডোরওয়ে থেকে পাল্টা গুলি পাঠাল কার্ট কে.
এবেলহার্ড।

দু'জনের তুমুল গোলাগুলিতে টানেলের কলামে লেগে
পাথরের কুচি নানাদিকে ছুটল।

এবেলহার্ডের পিছনের সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত
প্যানোরামিক উইণ্ডো ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল।

দু'জনই আড়াল নিয়েছে।

এখন মূল কথা: আগে শেষ হবে কার গুলি?

রানার, না এবেলহার্ডের?

আগেই ফুরিয়ে গেল রানার অস্ত্রের গুলি।

অফিসের ডোরওয়ে এখনও দশ ফুট দূরে।

পাথুরে সরু এক কলামের আড়ালে সরে গেল রানা।
ভালভাবে লুকাতে পারেনি।

হাসল কার্ট কে. এবেলহার্ড। এবার রানাকে বাগে পেয়েছে
সে।

কিন্তু তখনই আবারও এবেলহার্ডের দিকে এল একরাশ

গুলি। বুলেট আসছে রানার পিছনে টানেলের শেষে অ্যাণ্টি-রুম থেকে।

অবাক হয়েছে রানা, ঘুরে চাইল ওদিকে।

সুড়ঙ্গে ঢুকেছে কুয়াশা, ঝড়ের মত আসছে। আগুন ঝরছে কোল্ট কমাণ্ডো অ্যাসল্ট রাইফেলের মাযল থেকে।

অ্যাণ্টি-রুমের দিকে চোখ গেল রানার।

মেঝেতে পড়ে আছে ডজনখানেক ৯এমএম গুলির খোসা।
মাইক্রোওয়েভ এমিটার ঠেকাতে গুলি করেছে কুয়াশা।

কিন্তু ওই খোসাগুলো সাধারণ বুলেটের নয়।

খোসার উপর অংশে কমলা রঙের ব্যাণ্ড।

সাধারণ বুলেটে কিছুই হতো না অ্যাণ্টি-রুমের
মাইক্রোওয়েভ এমিটারের, কিন্তু কুয়াশার গ্যাস-এক্সপ্যান্ডিং বুল-
স্টপার অন্য জিনিস।

কুয়াশা গুলি করেছে বুঝতেই আর দেরি করল না রানা, রওনা
হয়ে গেল অফিস লক্ষ্য করে।

গুলির মুখে পিছাতে হচ্ছে এবেলহার্ডকে। কয়েক সেকেন্ড
পর ফুরিয়ে গেল তার গুলির ম্যাগাজিন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ফুরিয়ে গেছে কুয়াশার গুলিও।

তীরের মত গিয়ে অফিসে ঢুকল রানা। ওর ডানহাতি পর
পর দুটো ঘুষি নামল এবেলহার্ডের ভাঙা নাকে।

ব্যথায় আহত বাঘের মত গর্জন ছাড়ল লোকটা।

রানার সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাট।

একপক্ষে বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন মেজর, অন্যদিকে দক্ষিণ
আফ্রিকার দুর্ধর্ষ রেকণ্ডো।

পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু এ সুযোগে
সামনে বাড়ল ব্যাঙ্কার ড্যাভলার, হাতের আস্তিন থেকে বের
करेছে চকচকে ছোরা। লাফিয়ে গিয়ে রানার পিঠে ফলা বিঁধিয়ে
দিতে চাইল সে।

রানার মেরুদণ্ডের এক ইঞ্চি দূরে পৌঁছে গেল কুয়াশার ঘাট।
কিন্তু তখনই লোকটার কজির উপর ভয়ঙ্কর চাপ এল। কুয়াশা
অবাক চোখে কুয়াশার চোখে চাইল ড্যাবলার।

‘তুমি দেখছি কোনও আইনই মানো না,’ বলল কুয়াশা। কুয়াশা
বাড়ছে হাতের। কিন্তু অন্য আস্তিন থেকে আরেকটা ছোঁয়া
করেই কুয়াশার উরুতে গঁথে দিল ড্যাবলার। আবারও ছোঁয়া
তুলল সে, বিদ্যুৎবেগে চালাল শত্রুর বুক লক্ষ্য করে।

সামান্য ছুঁয়েছে ছুরির ফলা, তাতেই ফিনকি দিয়ে কুয়াশা
বেরিয়ে এল কুয়াশার প্রশস্ত বুক থেকে। এ লোককে অবজ্ঞা করা
যায় না। পিছিয়ে গেল কুয়াশা। আগের চেয়ে অনেক সতর্ক।
এত ধারাল ছোঁরা আগে দেখেনি।

ব্যাকারের প্রতিটি পদক্ষেপ এখন মাপা।

‘সুইস গার্ডসে ছিলে, না ড্যাবলার?’ পরবর্তী হামলা ঠেকাতে
প্রস্তুতি নিল কুয়াশা। ‘জানতাম না। ভাল।’

‘আমার যে ব্যবসা, সতর্ক থাকতে হয়,’ বাঁকা হাসল
ড্যাবলার।

দরজার কাছে একে অপরকে কারু করতে চাইছে রানা ও
এবেলহার্ড।

রানার চেয়ে আকারে বড় এবেলহার্ড, শক্তিও বেশি। তার
চেয়ে বড় কথা, তার ট্রেনিংও একই মাপের।

বিদ্যুৎবেগে সরছে রানা। এড়িয়ে যাচ্ছে মারাত্মক সব
ঘুষি।

কিন্তু গত কয়েক দিনের পরিশ্রম, এক্স-১৬ বিমান ক্র্যাশের
ধকল, তারপর ফ্রান্সে ওকে ধরে আনা— সব মিলে ও অত্যন্ত
ক্লান্ত।

ওর একটা ঘুষি অনায়াসে এড়িয়ে গেল এবেলহার্ড, পরক্ষণে
এক ঘুষিতে রানার নাকের হাড় গঁথে দিতে চাইল মগজে। ওই
এক আঘাতেই মারা পড়বে শত্রু।

শেষসময়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল রানা। বুঝে গেছে ভারসাম্য রাখতে পারবে না, কিন্তু পড়ে যাওয়ার আগে গায়ের জোরে ঘুষি বসিয়ে দিল এবেলহার্ডের অ্যাডাম্‌স্‌ অ্যাপলের উপর।

পরক্ষণে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল দু'জন।

দরজার চৌকাঠে পড়েছে এবেলহার্ড, হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। তারই পাশে ডোরফ্রেমে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রানা।

গোড়ানোর মাঝে বুটের খাপ থেকে ওয়ারলক হ্যান্ডিং নাইফ বের করল এবেলহার্ড।

‘দেরি করে হয়ে গেছে তোমার,’ চাপা স্বরে বলল রানা।

বিস্ময়ের ব্যাপার: ওর হাতে কোনও অস্ত্র নেই।

তার চেয়েও ভাল কিছু পেয়েছে।

ওর হাতে এখন ডেমিয়েন ডগলাসের রিমোট।

‘রবিন আর অ্যাটলকের হয়ে এটা দিলাম তোমাকে,’ রিমোটের বাটন টিপে দিল রানা।

ছাত থেকে সড়াৎ করে নামল ইস্পাতের ভারী দরজা। খটাৎ আওয়াজে নামল এবেলহার্ডের মাথার উপর। লোকটা ঝাঁকি খেয়ে পাথুরে মেঝেতে সটান হলো। দরজা চেপে বসেছে মাথার উপর। ফটাক! আওয়াজ তুলে ফেটে গেল লোকটার করোটি, নানাদিকে ছিটকে গেল ধূসর মগজ ও টকটকে লাল রক্ত।

কাঁট কে. এবেলহার্ড মারা যাওয়ায় ঘুরে চাইল রানা। ঝট করে তুলে নিল লোকটার ছোরা।

যার জন্য এসেছে, তাকে দেখল ডেস্কের পিছনে।

বাইরে ভয়ঙ্কর বাজ পড়ল। আকাশ চিরে দিল নীল বিদ্যুৎ। পিছনের জানালা দিয়ে ঝরঝর করে ভিতরে পড়ছে বৃষ্টি।

চুপ করে রানাকে দেখছে ডেমিয়েন ডগলাস, ডেস্কের আড়াল থেকে তুলল ডানহাত। ভয়ঙ্কর-দর্শন মাউয়ার পিস্তলটা দেখাল। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের দুই চোখের মণি হাসছে। একটা পচা ডিমের মত, অন্যটা নীল।

ওই একইসময়ে ড্যাবলারকে বাগে পেলে কুয়াশা। পাশ দিয়ে সরে গেল বামদিকে। ওর দেহের পাশ দিয়ে পিছনের দিক দিয়ে প্যান্ডেল বিঁধল ড্যাবলারের ছোরা। পরক্ষণে দুই লোকটাকে মাথার উপর তুলে নিল কুয়াশা। ড্যাবলারের মাথা ফেলল। মেঝেতে পড়ে ঠাস্ আওয়াজ তুলল ড্যাবলারের মাথা। দু'টুকরো হয়ে গেছে কেরাটি। মাত্র একবার বাঁক দিয়েই হলো। প্রায় একইসময়ে ভেস্ট থেকে ব্লো টর্চ বের করে কুয়াশা, নীল আগুন জ্বলে নিয়েই ওটা ছুঁড়ে দিল ডেমিয়েন ডগলাসের উদ্দেশে।

চট করে ব্লো টর্চের গতিপথ থেকে সরে গেল বিলিয়োনেয়ার।
'তোদের মাফ নেই,' চাপা স্বরে বলল। পিস্তলের মাযল তাক করল রানার নাকে। ট্রিগারে চেপে বসছে তর্জনী।

গত কয়েকদিনের বেদম পরিশ্রমে ফুরিয়ে গেছে রানার শক্তি। ভেঙে আসছে শরীর। কিন্তু হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবেলহার্ডের ছোরাটা ছুঁড়ল ডেমিয়েনের বুক লক্ষ্য করে।

ছোরার পিছনে ঝড়ের গতিতে ছুটতে শুরু করেছে রানা।
যে-কোনও সময়ে বুক বা মাথায় বিঁধবে বুলেট।

ছুটবার ফাঁকে হঠাৎই থেমে গেল রানা।

এইমাত্র ফুটো হয়ে গেছে লোকটার বুক ও গলা!

পিস্তলের ট্রিগার টেপার সময়ও পায়নি বিলিয়োনেয়ার।

ডেমিয়েনের বুক বিঁধেছে রানার ছোরা এবং কুয়াশার গুরিকেন দু'টুকরো করে দিয়েছে তার পিস্তল ধরা হাত। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল ডেমিয়েন, বুঝল না এত ব্যথা কীসের। আরও এক পা পিছাল অজান্তে, তারপর উধাও হলো ভাঙা প্যানোরামিক উইণ্ডোর ওপাশে।

বিকট আতর্জিতকার ভেসে এল নীচ থেকে।

দ্রুত পায়ে জানালার সামনে পৌঁছে গেল রানা।

দুর্গ থেকে চার শ' ফুট নীচে খলখল করছে আটলান্টিক

মহাসাগর। ইতোমধ্যেই অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে ডেমিয়েন।
সরু একটা তাকে নামল প্রথমে। ওখান থেকে মাথাটা ফাটিয়ে
নিয়ে ছিটকে পড়ল নীচের সাগরে। মুহূর্তে ঢেউয়ের তলে টুপ
করে ডুবে গেল ভাঙাচোরা মূর্তিটা।

জানালায় রানার পাশে এসে দাঁড়াল কুয়াশা।

একটা কথাও বলল না ওরা।

চেয়ে রইল নীচের সাগরের দিকে।

এত উপর থেকে পড়লে কেউ বাঁচে না।

ডেমিয়েন ডগলাসও নেই।

দশ মিনিট পর দিগন্তে মেঘের আড়াল থেকে মুখ তুলল সোনালি
সূর্য। সেই আলোয় ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়নে আসা-যাওয়ার পথে
দেখা দিল একটা অ্যাস্টন মার্টিন গাড়ি। তুমুল গতি। স্টিয়ারিং
ভইলের পিছনে কুয়াশা। পাশেই রানা। পিছন সিটে নিশাত
সুলতানা ও রঘুপতি। দুর্গের এয়ারফিল্ড লক্ষ্য করে চলেছে গাড়ি।

একপেশে সংক্ষিপ্ত লড়াই হলো এয়ারফিল্ডে। দুই পাইলটের
কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলো ড্রাগন কর্পোরেশনের একটা
হেলিকপ্টার। আরোহীদেরকে নিয়ে সূর্যের দিকে রওনা হয়ে গেল
ওটা।

ষোলো

পরের এক সপ্তাহে দুনিয়া জুড়ে বেশকিছু অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা
ঘটল।

ইটালির মিলানে অ্যারোস্টাডিয়া ইটালি এয়ারশোতে চুরি হলো। এক হ্যাণ্ডার থেকে চুরি গেল একটা ফাইটার বিমান।

নামকরা ইউএস এক্স-১৬ রকেট বিমান ওই শো-তে দেখানো সম্ভব হয়নি। তার উপর এখন এ ধরনের চুরি! ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখল না জনসাধারণ।

সাম্রা্য দিল কেউ কেউ, কালো ওই বিমান সরাসরি আকাশে উঠেছিল। দেখতে ছিল রাশান সুখোই এস-৩৭ অ্যাটাক ফাইটার বিমানের মতই। অবশ্য, কর্তৃপক্ষ জোর গলায় বলল, তাদের শো-তে এ ধরনের কোনও বিমানই ছিল না।

অক্টোবরের ষোলো তারিখে আমেরিকার কয়েকজন জেনারেল ও অ্যাডমিরালকে গ্রেফতার করা হলো। উধাও হয়ে গেল কয়েকজন কর্নেল ও মেজর।

পরবর্তী তিন দিনে খুন হলো বেশ কয়েকটি বাউন্টি হান্টিং সংগঠনের বাছা বাছা কিছু লোক। লড়তে গিয়ে করুণভাবে মারা গেল ডেভিড এন. হেব্রিক ও তার ইউনিটের সবাই। গা ঢাকা দিল বাউন্টি হান্টার পোলিশ ও জাপানি ললনা মাসু হোকামা।

এদিকে দুনিয়ার সেরা বড়লোক পরিবারগুলোয় নেমে এল খুবই দুঃখজনক সব মৃত্যু।

দুর্ঘটনার কারণে নানাভাবে মরল বিত্তবান লোকগুলো।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সাফারিতে গিয়ে উধাও হলো ফ্রান্সিস ওলিফ্যান্ট। তার গোটা প্রাইভেট হান্টিং পার্টির কেউ ফিরল না।

তারই চারদিন পর হার্ট অ্যাটাকে ঘুমের ভিতর মারা গেল গ্রিক শিপিং ম্যাগনেট ওয়েগেল রোচ।

অ্যাসপেন লজে উপপত্নীর বাড়িতে মৃত পাওয়া গেল র্যানডলফ কিলিয়ানকে।

কাউন্টি ম্যানশনে খুন হলো ডিন ম্যাকেনকোট।

নিউ ইয়র্কের হেডকোয়ার্টারের সামনে ফার্মাসিউটিক্যাল টাইকুনকে পিষে দিল এক ট্রাক। পরে আর ট্রাক বা ড্রাইভারের

কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

উত্তরাধিকারীরা তাদের সাম্রাজ্য বুঝে নিল।

বরাবরের মতই চলতে থাকল পৃথিবী।

কিন্তু ওসব দুর্ঘটনার কারণে গোপন একটা মেমো পাঠানো হলো ইউএসএ-র প্রেসিডেন্টের কাছে।

কাগজে শুধু লেখা ছিল:

‘স্যর, সব কাজ শেষ। ম্যাজেস্টিক-১২ এখন আর নেই।’

চিরহরিৎ মায়াময় বাংলাদেশ।

রাজধানী ঢাকা থেকে সামান্য দূরে, আশুলিয়া।

অক্টোবরের তেইশ তারিখ।

সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা।

জঙ্গলমত জায়গায় সুন্দর একটি ছোট বাড়ি ওটা।

নিশাতের বাবার।

সামনের ফুলের বাগানে হরেক ফুল ফুটেছে, চারপাশ মৌ-মৌ করছে মিষ্টি সুবাসে।

কাঠের চেয়ার নিয়ে বাগানে এসে বসেছে কয়েকজন।

চলছে নানান গল্প।

বাগানের ডানদিকে কয়লার আগুনে চড়িয়ে দেয়া হয়েছে আস্ত খাসি, কাবাব তৈরি হচ্ছে। আরেক চুল্লিতে ঝলসাচ্ছে নানরুটি।

নিশাত সুলতানার বাবা আজকের বাবুর্চি, খুশিমনে নিজের কাজে ব্যস্ত।

অতিথিদের সঙ্গে রয়েছে এক সাদা চামড়ার যুবক।

তাকে খুলে বলা হয়েছে কীভাবে রানা, নিশাত, তিশা ও খবির জড়িয়ে গিয়েছিল বাউন্টি হাণ্ডে। আর কীভাবেই বা ওদেরকে বারবার রক্ষা করেছে বৈজ্ঞানিক কুয়াশা।

সব শোনার পর নিজ কাহিনি সংক্ষেপে বলল শ্বেতাজ যুবক।

তার নাম কেভিন কনলন।

একপর্যায়ে বলল, ‘আমেরিকান সরকার মৃত্যু-হুলিয়া তুলে নিয়েছে কুয়াশার মাথার ওপর থেকে। এখন ইচ্ছে করলেই ও দেশে যেতে পারবেন তিনি।’

‘উনি তা চান, তাই ভাবছেন?’ হাসল নিশাত। ‘নামের মতই কুয়াশায় ঢেকে রাখতে চান নিজেকে।’

সবাই গল্প করছে, কিন্তু হঠাৎ করেই চেয়ার ছাড়ল রানা। ‘তিশা, আমি একটু ঘুরে আসি।’

আস্তে করে মাথা দোলাল তিশা। আগেই বলেছে, জীবনেও বাঁধতে চাইবে না রানাকে সংসারের জালে। এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয় তিশা। বাংলাদেশ আর্মি থেকে ওকে ছুটি দেয়া হয়েছে।

নিশাত ও খবিরও ছুটি পেয়েছিল। কিন্তু আগামীকাল যোগ দিতে হবে অফিসে।

‘কোথায় যাবেন, স্যর?’ পিছন থেকে জানতে চাইল খবির। আগেও ন্যাওটা ছিল রানার, এখন আরও বেশি হয়েছে। ‘আমি সঙ্গে আসব?’

‘না, লাগবে না। একটু হেঁটে আসি।’ বাগান পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল রানা। অস্পষ্ট, করুণ এক সুর শুনেই রওনা হয়েছে।

বিশগজ যাওয়ার পর ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। আস্তে আস্তে হাঁটছে।

বুঝে গেছে, এই সাঁঝে কে বাজাচ্ছে সরোদে রহস্যময় মধুর রাগ শিবরঞ্জনী।

মস্ত শিল্পী ওই মানুষ।

অদ্ভুত কষ্ট বুকে। যেন হারিয়ে বসেছে প্রেয়সীকে।

আর কখনও দেখা হবে না।

পনেরো গজ যাওয়ার পর জঙ্গলের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল রানা। সামনে হাওড়ের মত জলভূমি।

মাঝারি একটা লঞ্চ ভাসছে বিশ ফুট দূরে।

কোনও আলো নেই ডেকে ।
আকাশ জুড়ে আঁধার নামছে । চারপাশ কেমন কুয়াশাময় ।
বড় মায়া নিয়ে বাজছে সরোদ ।
চুপ করে বেদনাময় সুর শুনছে রানা, কিছুক্ষণ পর বাতি
জ্বলে উঠল লঞ্চের ডেকে ।
সরসর আওয়াজ শুনল রানা ।
স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মত কিছু ঘিরে ফেলছে ওই লঞ্চকে ।
'কুয়াশা?' গলা চড়িয়ে ডাকল রানা । 'কেমন আছেন
আপনি?'
'ভাল, তুমিও ভাল থেকো,' জবাবে গমগম করে উঠল পুরুষ
কণ্ঠ । 'হয়তো আবারও দেখা হবে আমার বা তোমার কোনও
বিপদে ।'
ডুবে যেতে লাগল লঞ্চ ।
বিজ্ঞানীর অদ্ভুত জলযানের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল
রানা ।
মাত্র কয়েক সেকেন্ডে তলিয়ে গেল লঞ্চ ।
ওখানে রইল শুধু কয়েকটা ঢেউ ।
পানিতে তৈরি হলো স্রোত ।
একটু পর অবাক করা লঞ্চের কোনও চিহ্নই রইল না ।
'তুমি সত্যি রহস্যময়, কুয়াশা,' বিড়বিড় করল রানা । ঘুরে
হাঁটতে লাগল নিশাতদের বাগানবাড়ি লক্ষ্য করে ।



রহস্যপত্রিকা

সম্পাদক : কাজী আনোয়ার হোসেন

সহকারী সম্পাদক :

কাজী শাহনূর হোসেন

কাজী মায়মুর হোসেন

শিল্প সম্পাদক : প্রব এম

যোগাযোগ :

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ ॥

ফোন : ৮৩১৪১৮৪

মোবা: ০১১৯৯ ৮৯৪০৫৩

১৯৭০ সালের নভেম্বরে রহস্যপত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। সেই হিসাবে ২০১৪ সালের আগস্টে এর বয়স হওয়ার কথা প্রায় ৪৪ বছর। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কারণে কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই ছেদ পড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকাশনা কাল, অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের নভেম্বরকেই ধরছি আমরা এর জন্মদিন। সেই হিসাবেও আজ এর বয়স কিন্তু নেহায়েত কম নয়। একটানা এতগুলো বছর ধরে প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পারার সমস্ত কৃতিত্ব পাঠক, আপনার। একমাত্র পাঠকের ভালবাসা ও আনুকূল্যই ৯ ফর্মার এই বিজ্ঞাপনহীন পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রেখেছে আজও। এটি একটি মাসিক পত্রিকা। মূল্য: ৩৮/- টাকা।

প্রতি ইংরেজি মাসের ১ তারিখে বেরোয়।

মাসিক রহস্যপত্রিকা

৩৮/-

ষান্মাসিক চাঁদা

২১০/-

বাৎসরিক চাঁদা

৪২০/-

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরচিহ্নিত কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মির্জা সাজ্জাদ হোসেন

৪৪, উত্তর গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, মোবা: ০১৭১২৯৯৫২৪১

পার্সিয়ান ট্রেজার প্রথম খণ্ডে ২৭৩ পাতায়, দেলফিনা'র প্রাসাদে সামনের দৃশ্য দেখে, রানাকে সোহানা বলল, 'মাই গড, রানা, কী সুন্দর দেখেছ!' পরপরই পিছন থেকে বলে উঠলেন দেলফিনা, 'এ দৃশ্য এত দেখি, তারপরও আমার ক্লান্তি আসে না।'

এখন কথা হচ্ছে, রানা ও সোহানা দুজনেই বাঙালি, তার ওপর জানা মতে, আশপাশে কেউ নেইও। এই অবস্থায়, তারা কি বাংলায় কথা বলবে না? যদি তাই বলে থাকে, তবে দেলফিনা কী করে বুঝলেন, তারা কী নিয়ে কথা বলছে? নাকি রানা সোহানা দুজনেই ইংরেজিতে কথা বলছিল?

✱ না, বাংলাতেই বলছিল। কিন্তু ভিন্ন ভাষায় সোহানা কী বলছে সেটা দেলফিনা সহজেই বুঝে নিয়েছে। 'মাই গড, রানা,' বলে যদিকে তাকিয়ে যে সুরে সোহানা যা বলেছে বুদ্ধিমতী দেলফিনার সেটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি। কারণ, ওর আগে আরও অনেক মানুষ এই একই কথা বলেছে বিভিন্ন ভাষায়।

কিশোর

মিরপুর, ঢাকা।

গুভেচ্ছান্তে নিবেদন, মাসুদ রানা ৪০৩ নং বই 'স্বর্ণ বিপর্যয়' দ্বিতীয় খণ্ডের ২০২ পৃষ্ঠার এক জায়গায় লেখা আছে: 'মুহূর্তে বুঝে নিল, মানুষটা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না!' কিন্তু এখানে আর একটি শব্দ যোগ হবে। সেটা হবে 'রানা'। অর্থাৎ, 'মানুষটা রানা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না!'

✱ ঠিকই ধরেছেন... সম্ভবত। কী ছাপা হয়েছে আমার মনে নেই।

• বিপুল কুমার রায়, মোবা: ০১৭৩৬২৬৬৩৮১
১২৯০ ও, আর, নিজাম রোড, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধাভিনন্দন রইল, গ্রহণ করবেন আশা রইল। পৃথিবীতে কিছু মানুষ থাকে তাঁদের জন্মই হয় যেন শিল্পিত সৃষ্টিশীলতার জন্য। আপনি তাঁদের একজন। আমার ভেতরে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্মান সেই সব আলোকিত মানুষদের প্রতি ঠিক যেন শৈল্পিকভাবেই গড়ে ওঠে। আপনার চমৎকার সৃজনশীলতার ঈর্ষণীয় প্রশংসা অনেক অনেক হয়েছে! কবিগুরুর ভাষায়, 'ভাল জিনিস যত কম হয় ততই ভাল।' কিন্তু আপনি সেখানে বড় ব্যতিক্রম! ভাল-র ভেতরে ভাল, তারপর আরও ভাল। ভাল-র যেন শেষই নেই! নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এ এক অদ্ভুত শিল্পিত প্রয়াস! এমন ভয়ঙ্কর ভাল আর কী হতে পারে! ক্রমাগত ভাবে আপনার আত্মা থেকে একেকটা দেবশিশু (মাসুদ রানা) জন্মই চলেছে...! বা... বা!! চতুর্থ সেপ্তুরী, ভাবা যায়! কে বলে 'মাসুদ রানা' কাল্পনিক চরিত্র!? শুধুই অন্তর থেকে 'রানা' বলে ডেকে দেখুন, আপনার বাড়ির ছাদে বাস্তবে কতো 'মাসুদ রানা' এসে দাঁড়ায়!

✽ হ্যাঁ, তারপর ছাতটা ভেঙে পড়ুক আরকী!... চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

ফরহাদ

রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

শ্রদ্ধেয়, কাজীদা, সালাম নেবেন, বহুদিন রানার দেখা নেই তাই ভাবলাম 'ক্লাইভ কাসলার'-এর 'ক্রিসেন্ট ডাউন' বইটি নিজেই রানার কোন অভিযান হিসেবে লিখতে শুরু করি। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক পরেও পাঁচ-ছয় লাইনের বেশি এগুতে পারলাম না, যার অধিকাংশই মনের মত হয়নি। জানতাম কাজটি কঠিন, তবে এতটা কঠিন তা ভাবিনি। অথচ 'সেবা' এই কাজটি অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের জন্য নিরলসভাবে করে যাচ্ছে। সেবা'র পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে, প্রথম হতে আজ পর্যন্ত যারা জড়িত তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। 'আদিম আতঙ্ক' ছিল খুবই চমৎকার। ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, কাজীদা। সম্ভবত ছবিটা অনেকবার দেখার জন্যই 'টাইম বম' তেমন ভাল লাগল না। কাজীদা, খুব শীঘ্রি রানার ৪৩২তম কাহিনি আসছে, চমৎকার কোন কাহিনি চাই। আবার কুয়াশা, নুমা কিংবা কোন ট্রেজার হান্ট হলে কিন্তু ভালই হবে! জানাবেন কিন্তু। আর নয়, অনেক গরম, মেঘ ও বৃষ্টির অপেক্ষায়।

✽ আপনার ভাষা কিন্তু চমৎকার। আরও সময় দিলেই দেখবেন, চমৎকার সব কাহিনি বেরিয়ে আসছে কলম দিয়ে।